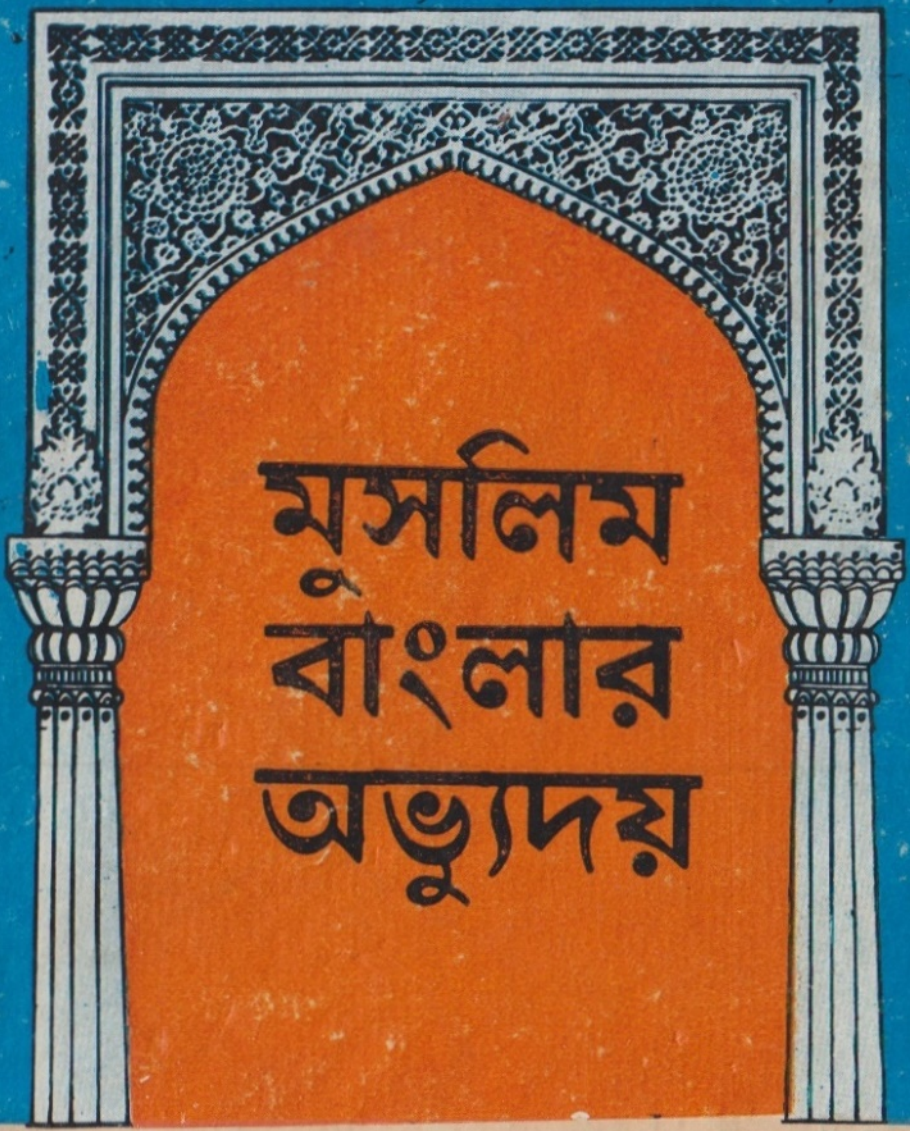

মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়

মাহবুবুর রহমান

মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়

মাহবুবুর রহমান

মিজানুর রহমান
—সম্পাদক

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ মুশতাক-উর রহমান
তৌহিদ ফাউন্ডেশন

প্রচ্ছদ ঃ কাজী আবুল কাসেম
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৮৮

মুদ্রণে ঃ খান প্রিন্টার্স
৫৯৪, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৪১ ৩৩ ৬৮

মূল্য ঃ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। প্রফেসারস বুক কর্ণার,
১৯১, মগবাজার (ওয়্যারলেস রেলগেট)
ঢাকা—১৭

২। আধুনিক প্রকাশনী,
২৫, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার.

www.pathagar.com

'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়' বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী। আর্যদের ভারতীয় উপ-মহাদেশে প্রবেশ ও রাজ্য বিস্তার থেকে শুরু করে কালের সুদীর্ঘ বিবর্তন পেরিয়ে অবশেষে একটি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন এক বাংলাদেশের জন্মের ঐতিহাসিক পটভূমি বিধৃত হয়েছে 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়ে।' লেখক বইটিতে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে আর্যদের রাজ্য বিস্তার উপমহাদেশের 'আর্যাবর্তে' সীমাবদ্ধ ছিল এবং বাংলাদেশ ছিল এ আর্যাবর্তের বাইরে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। বস্তুতঃ এখানকার অধিবাসীরা উপমহাদেশের অন্যান্য অধিবাসীদের থেকে স্বতন্ত্র একটি সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। এরা আকৃতি, প্রকৃতি, খাদ্যাভাস, বসন ব্যসন, সামাজিক রীতিনীতি সবদিক থেকেই উপ-মহাদেশের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের থেকে ভিন্নতর ছিল। লেখকের মতে গণতন্ত্রীমনা বাঙ্গালীরা কখনও আর্য আধিপত্যবাদের শিকার হয়নি।

তুর্কী-আফগানদের আগমনের ফলে এদেশে মুসলিম শাসন প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু স্থানীয় শাসকগণ বরাবরই দিল্লীর শাসনমুক্ত হয়ে বাংলার স্বাধীন সত্তাকে অক্ষুন্ন রেখেছেন। মুঘল শাসকগণ বাংলাদেশে সত্যিকার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন সম্রাট আকবরের সময়। কিন্তু নিবিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনা করতে তাদের প্রচুর সময় লেগেছিল। ইংরেজ আমলে বাঙ্গালীদের নিরস্ত্র করার ইতিহাস সর্বজন স্বীকৃত। তথাপি বাংলার কৃষককুল অকুতোভয়ে বারবার ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এবং এতদ্দেশীয় তাদেরই তল্পীবাহক সুবিধাভোগী জমিদার, মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং অকাতরে প্রাণ দিয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে মূলতঃ সুফী-দরবেশদের প্রচেষ্টায়। এরা অস্ত্রের চেয়ে চরিত্র মাধুর্য, সত্যবাদিতা, ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা ও ইসলামী সাম্যবোধের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই প্রচারকার্য্য চালিয়েছেন। ফলে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এসব নওমুসলিমের মধ্যে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ছিল, কিন্তু ধর্মীয় উন্মাদনা ছিলনা। মুসলমান পূর্ব যুগে "শক হুন দল" এদেশে এসে ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতিতে স্থানীয় অধিবাসীদের সংগে 'লীন' হয়ে গেলেও মুসলমানরা সেরকম হতে পারেনি। ফলে এখানে হিন্দু ও মুসলিম দুটি

www.pathagar.com

ভিন্ন ধারায় ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। একজন মুসলমানের পরিচয় হয় সে মুসলমান ও বাঙ্গালী, তেমনি একজন হিন্দুর পরিচয় হয়, সে একজন হিন্দু ও বাঙ্গালী। পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে এরা একে অন্যকে কিছুটা প্রভাবান্বিত করেছে বটে, তবে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় বিভাজনের মূল রেখাটি অক্ষুন্ন থেকে গেছে।

মুসলমান শাসন অবসানে বৃটিশ আগমনের শুরু হতেই হিন্দু পুণ-র্জাগরনের জোয়ার আসে। ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নব্য হিন্দুবাদের উন্মেষ হিন্দু মুসলমান বিভেদকে প্রকট করে তোলে। বোধগম্য কারণে ইংরেজ শাসন শোষণের বিরুদ্ধে মুসলমানেরা যখন চরম বিরোধিতায় মেতে উঠল, তখনই বর্ণবাদী হিন্দু সমাজ ইংরেজদের মনোতুষ্টি ও খোশামোদের মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতার অংশী দায়িত্ব লাভে সফল হল। ফলে হিন্দু মুসলিম বিভেদ আরো প্রকট হতে লাগল। এভাবে হিন্দু সমাজ উন্নাসিকতা এবং ধর্মান্ধতার পাথায় ভর করে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের কাছ থেকে যথা সম্ভব দূরে সরে গেল। বাঙ্গালী হিন্দুদের সাহিত্য কর্ম, সাংবাদিকতা, এমন কি 'স্বরাজ' আন্দোলন পর্যন্ত এত বেশী ধর্মাবেগ দ্বারা পরিচালিত ছিল যে মুসলমানদের সাথে এর কোন সম্পর্কই রইল না। "স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের সর্বপ্রকার চেষ্টা চরিত্র চলল। বঙ্গভঙ্গের দিনে (১৬ই অক্টোবর, ১৯১১) বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্রলোকেরা পরস্পর বন্ধু-বান্ধবের হাতে রাখী বন্ধনের সূতা বাঁধলো, গঙ্গার জলে স্নান করে শক্তি দেবী কালীমাতার কাছে বৃটিশ বিরোধী শক্তির জন্য আরাধনা করলো এবং 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে উচ্চকিত হলো। প্রেমেন আদ্দি এবং ইবনে আজাদ যথার্থই মন্তব্য করেছেন, এরা তাদের হিসেব থেকে যা বাদ দিল, তা হল একমাত্র বিপুল মুসলমান জনসাধারণ যারা বোধগম্য কারণেই 'শক্তির' আরাধনায় কিংবা 'বন্দে মাতরম' শ্লোগানে যোগ দিতে পারে না। বাদ দেয়ার কারণ হল, মাঝে মাঝে উচ্চ মানসিক দুঃশ্চিন্তা ছাড়া বিপুল হিন্দু ভদ্রলোক সমাজের কাছে মুসলমানদের কোন অস্তিত্ব ছিল না।"

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে বাংলার মুসলমান নেতারা যুক্ত বাংলার যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তাতে বাংলার বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবর্গের সমর্থন থাকলেও ভারতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় হিন্দু

www.pathagar.com

নেতৃত্ব এবং উগ্রপন্থী হিন্দু মহাসভা তা গ্রহণ করতে পারেনি। কাজেই হিন্দু মুসলমানের মিলিত বাংলার স্বপ্নের সমাধি তখনই রচিত হয়। যে ব্রাহ্মন্যবাদ বংগভংগ রদের জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল, তারাই পরে বংগভংগের আন্দোলনে মেতে উঠল। গরজ বড় বালাই।

মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাকিস্তান লাভের পর দেখা গেল যে কেবল ধর্মীয় অভিন্নতা দ্বারা ন্যায়বিচার, সুষ্ঠু সমাজ বিকাশ বা অর্থনৈতিক মুক্তি লাভের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়না। বস্তুতঃ পূর্ব বাংলা বিভাগ পূর্ব যুগে যেমন ছিল ইংরেজের শাসন এবং হিন্দু মহাজন জমিদারদের শোষণের ক্ষেত্র, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তা হল পশ্চিম পাকিস্তানী আমলা এবং বণিক শ্রেণীর শাসন শোষনের একটি কলোনী বিশেষ। ফলে দেখা দিল ১৯৭১ সালের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিল।

লক্ষ্যণীয় ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯৪০ সালে লাহোরে যে প্রস্তাব পাশ করেন, তাতে বাংলার অবিসম্বাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তবর্তী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একাধিক "স্বায়ত্ত-শাসিত এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। গৃহীত প্রস্তাবটি পরে পরিবর্তন করা হয়। কাজেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মের মাধ্যমে "লাহোরি প্রস্তাবই" যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে বললে দ্বিমতের কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয়না। বস্তুতঃ ধর্মভিত্তিক যে বিভাজনটি ১৯৪৭ সনে সম্পন্ন হয়েছে, তা অপনোদন করা কেবল দুঃসাধ্যই নয়, একেবারে অসম্ভব ও বটে। কারণ আমরা দেখতে পাই, "তাত্ত্বিক কারণেই যাদের সকল ধর্মসহ ইসলাম ধর্মেরও বিরুদ্ধাচারনে ব্রতী হবার কথা, বাংলাদেশের সেই কমিউনিষ্ট পার্টি ও তাদের প্রকাশ্য জনসভাতে পর্যন্ত বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র কায়েমে "আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার" কথা বলেন, বা বলতে বাধ্য হন। বাংগালীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নেতাও তার স্বাধীনতার সংগ্রাম সূচীত করেন, "বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ" এই আশাবাদ নিয়ে। আর আজীবন ধর্মের বুলি আওড়ানোর মত "প্রতিক্রিয়াশীলতার" বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অংগীকারাবদ্ধ দলটিও তাদের নির্বাচনী স্লোগানে "ধর্ম-কর্ম-সমাজতন্ত্র" এর বুলি না আওড়ে পারেননা ··· — ·· " (ডঃ আহম্মদ আনিসুর রহমান, দৈনিক ইত্তেফাক,

www.pathagar.com

মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের বাংগালী মূল্যবোধটিও ইসলামিক ভাবধারায় পুষ্ট। ইসলামিক ভাবধারা দ্বারা পুষ্ট বললে বুঝতে হবে অন্যান্য ভাবধারাও এখানে একেবারে অনুপস্থিত নয়। প্রকৃতপক্ষে ডঃ রহমানের কথায় বলতে হয় "তিন হাজার বছর ধরে অনার্য প্রকৃতি পূজক দৃষ্টিভংগী, আর্য হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ মত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে আসা বাংগালী লোক-মূল্যবোধ ব্যবস্থাটি অবশেষে ইসলামান্বিত হয়ে পরিপূর্ণভাবেই ইসলাম সম্মত রূপ লাভ করেছে।" বর্ণিত কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠের মূল্যবোধের দ্বারা অর্থাৎ ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা অন্য মূল্যবোধগুলো স্বভাবতই প্রভাবিত হয়েছে এবং আত্মীকৃত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বাংলাদেশকে একটি মুসলিম প্রধান এবং ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত দেশ হিসাবে "মুসলিম বাংলা" বলা যেতে পারে। লেখক এই বাংলাদেশের ইতিবৃত্তই সংক্ষিপ্তাকারে "মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়" বইটিতে লিপিবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তিনি একান্তই নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। এবম্বিধ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ব্যাপারে মত পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু বিপুল সংখ্যক দলিল ও ঘটনা পঞ্জীর যথাযথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তিনি যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রেখেছেন তা সহজেই সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষনে সক্ষম হবে আমাদের এ দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে। পুস্তকটিকে বাংলার একটি সামগ্রিক ঐতিহাসিক রূপরেখা প্রণয়নের সুদৃঢ় প্রাথমিক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

এর রচনায় যে সব গুণীজন লেখককে সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তন্মধ্যে বরিশালের মরহুম খান বাহাদুর হাশেম আলী খাঁর সুযোগ্য পুত্র জনাব নূরুল ইসলাম (সুলতান) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ সিরাজুল ইসলামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব আজিজুর রহমানও তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। বইটির মুদ্রণ ও প্রকাশনার সহিত জড়িত সকলেই ধন্যবাদার্হ। যাঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তাঁদের কাছেও লেখক শ্রদ্ধার সাথে ঋণ স্বীকার করছে।

www.pathagar.com

মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়

সূচীপত্র

	ভূমিকা	(ক)—(ঘ)
১।	বাংলা নামের গোড়ার কথা	১
২।	আর্যদের ভারতে আগমন	৬
৩।	পাল বংশ	১৩
৪।	বর্মা রাজ বংশ	২৭
৫।	শূর বংশ	২৯
৬।	সেন যুগ	৩১
৭।	মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা	৪২
৮।	মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ খিলজী	৪৯
৯।	খিলজী বিজেতাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ	৫২
১০।	গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খিলজী	৫২
১১।	মামলুক সুলতানদের অধীনে বংগদেশ	৫৪
১২।	তুঘলকদের শাসনাধীনে বংগদেশ	৫৬
১৩।	ইলিয়াস শাহী বংশ	৫৭
১৪।	হোসাইন শাহ	৫৯
১৫।	ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শক্তির পতন	৬৪
১৬।	বাংলাদেশে মুসলমান	৭০
১৭।	বাংলা ভাষায় মুসলিমদের অবদান	৭৫
১৮।	নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের উপর মুসলিম শাসনের প্রতিক্রিয়া	৭৯
১৯।	মুসলমানদের উপর পলাশী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া	৮২
২০।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুসলিম বিরোধী নীতি	৯৩

www.pathagar.com

২১। ফরায়েজী আন্দোলন ১০২
২২। ওহাবী আন্দোলন ১০৯
২৩। সিপাহী বিপ্লব ১১৩
২৪। হিন্দু পুনরুত্থান ১২৮
২৫। উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণ ১৪৫
২৬। উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বংগভংগ রদ ১৫৮
২৭। হিন্দু মুসলিম সহযোগীতা ১৬৬
২৮। হিন্দু মুসলিম ঐক্যে ফাটল ১৬৮
২৯। গোল টেবিল বৈঠক ১৭৮
৩০। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৮১
৩১। দ্বিজাতি তত্ত্ব ও লাহোর প্রস্তাব ১৮৯
৩২। পাকিস্তান আন্দোলন ও পাকিস্তানের প্রতিজ্ঞা ১৯৮
৩৩। মুসলিম বাংলার অভ্যুদয় ২২১
৩৪। ভ্রম সংশোধন ২২৫

www.pathagar.com

বাংলা নামের গোড়ার কথা

পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশ নিয়ে যে উপ—মহাদেশ, প্রাক মুসলিম যুগে এর কোন ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হয়নি। মুসলমানেরাই প্রথম এতদাঞ্চলের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার ধারা প্রবর্তন করে। প্রাক মুসলিম যুগের ইতিহাসের ইমারতের মালমশলা সংগ্রহের জন্যে প্রয়োজন হয় নানা স্থানে প্রাপ্ত বিভিন্ন রাজা কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রা, বিজয় স্তম্ভ এবং শিলা লিপিতে খোদিত বিজয়ী রাজাদের কীর্তি গাঁথা, বিদেশী পাঠকদের ভ্রমন কাহিনী ইত্যাদি। বাংলাদেশের বাইরের ইতিহাস নিয়ে আমরা ততটুকুই আলোচনা করব যা প্রসঙ্গক্রমে এসে যায় এবং যা বাদ দেয়া চলে না। বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বংগ একত্রে বংগদেশ নামে পরিচিত ছিল এবং এ বংগদেশ বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত এক একটি প্রদেশ ছিল। বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে পাকিস্তান এবং ভারত নামে দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলে পূর্ব বংগ পাকিস্তানের এবং পশ্চিম বংগ ভারতের অংশ হিসাবে গন্য হয়। পূর্ব বংগ আদিকালে বাংলা নামে পরিচিত ছিল। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুনরায় বাংলাদেশ নাম ধারন করলে পর এর লুপ্ত ইতিহাস এবং ঐতিহ্য পূনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বংগ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। হিন্দু পুরানেও এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, গরুড়পুরাণ এবং হরি বংশে বর্ণিত রয়েছে যে দৈত্যকুলের বিষ্ণুভক্ত ধার্মিক রাজা প্রহলাদের পৌত্র বলী ছিলেন একজন পরাক্রান্ত মহাবলশালী রাজা। তিনি শুধু সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরই ছিলেন না, বরং দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে তিনি স্বর্গলোকেও স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র ও বরুণ বাহুবলে পরাজিত হলেও কূটকৌশল ও ছলনার আশ্রয় নিয়ে মহাবল শালী পরম

www.pathagar.com

ধার্মিক এবং দানবীর বলীকে স্বীয় রাজ্য ত্যাগ করে পৃথিবীর বাইরে চলে যেতে বাধ্য করেন বলী পৃথিবী ছেড়ে যখন পাতাল পুরীতে স্বীয় পত্নী সুদেষ্ণাকে নিয়ে বাস করছিলেন তখন একদিন স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত দীর্ঘতমা নামক এক অতি দুশ্চরিত্র অন্ধ ঋষিকে ভেলায় করে নদী পথে ভেসে যেতে দেখলেন। বলী ছিলেন নিঃসন্তান। সুতরাং তিনি এই অন্ধ ঋষিকে নিয়ে এলেন এবং সুদেষ্ণার গর্ভে পুত্র উৎপাদনের জন্য তাঁকে নিয়োগ করলেন। সুদেষ্ণার গর্ভে এই লম্পট ঋষির ঔরসে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁদের নাম হলো অংগ, বংগ, কলিংগ, পুন্ড্র ও সুম্ম। (১)

অংগ হল বর্তমানের ভাগলপুর জেলা। বংগ হল বর্তমানের বাংলাদেশ। পুন্ড্র পরে গৌড় বা বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত হলেও বর্তমানের উত্তর বংগকে বুঝায়। সুম্ম পরবর্তী কালের রাঢ় দেশ এবং বর্তমানের পশ্চিম বংগ। কলিংগের বর্তমান নাম উড়িষ্যা।

যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত তাঁর বিক্রম পুরের ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিখেছেন "রামায়ন ও মহাভারতের বর্ণনা পাঠে যে সিদ্ধান্ত উপনীত হই তাহা দ্বারা প্রমানিত হয় যে, পৌরানিক সময় হইতে সেন বংশীয় নৃপতিগনের রাজত্বকাল পর্যন্ত বর্তমান সময়ে যাহা পূর্ব বংগ নামে অভিহিত কেবল তাহাকেই বংগ বলিত।" (২)

ভারত বিভাগের পূর্বে এমনকি পরেও পশ্চিম বংগের অর্থাৎ প্রাচীন সুম্ম বা রাঢ়ের অধিবাসীগণ পূর্ব এবং উত্তর বাংলার অধিবাসীগণকে বাঙ্গাল নামে উপহাস করত এবং কথায় কথায় 'বাঙ্গালকে হাইকোর্ট' দেখিয়ে মজা করত। তাই শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায় তাঁর ঢাকার ইতিহাস নামক বইতে মন্তব্য করেছেন "অদ্যাপি পশ্চিম বংগবাসীগণ ঢাকা তথা পূর্ব বঙ্গবাসীদিগকে বাঙ্গাল আখ্যা প্রদান করিয়া বিলুপ্ত প্রায় প্রাচীন স্মৃতিটিকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। আসামীগণ এখনও বাঙ্গাল শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। (৩)

---

(১) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

(২) যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের ইতিহাস।

(৩) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

www.pathagar.com

পুরানে বর্ণিত বঙ্গ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে অভিহিত হত। এরিয়ান, ডাইওডোরাস, টলেমী প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থকারগণের পুস্তকে গঙ্গরিডয় নামক রাজ্যের উল্লেখ আছে। এ রাজ্যের রাজধানী ছিল গাঙ্গেয় নগর। এ গাঙ্গেয় নগর গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত ছিল। এখানে সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় হতো। ঢাকা ছাড়া এ উপ-মহাদেশে আর কোথাও মসলিন বস্ত্র উৎপন্ন হতো না। তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে যে প্রাচীন গ্রীক পন্ডিতগণ যাকে গাঙ্গেয় নগর বলে উল্লেখ করেছেন তা বর্তমানের সোনার গাঁও এবং গঙ্গরিডয় রাজ্য বর্তমানের বাংলাদেশ। (৪)

এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বল্লাল চরিত্রে লিখা আছে যে মহারাজ বল্লালসেন সুবর্ণ বনিক জাতীয় বল্লভানন্দের নিকট দেড় কোটি মুদ্রা ঋণ প্রার্থনা করেন। বল্লভানন্দ ঋণ পরিশোধ বাবদ হরিকেলীয় প্রদেশ তাঁর অধিকার রেখে ঋণ দিতে সম্মত হন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত জৈনাচার্য হেমচন্দ্রসূরী বিরচিত অভিধান চিন্তামনিতে হরিকেল শব্দটিকে বঙ্গের নামান্তর বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (৫)। তাই বাংলাদেশ এক সময়ে হরিকেল নামেও পরিচিত ছিল।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহারাজ সমুদ্র-গুপ্তের এলাহাবাদ প্রস্তর স্তম্ভ লিপিতে সমতটের নাম সম্ভবতঃ প্রথম উল্লিখিত হয়েছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং সেঙ্গচি, ইৎসিঙ্গ ভ্রমন বৃত্তান্তে সমতটের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিক ফার্গুসনের মতে ইউয়ান চোয়াং, সোনার গাঁওকে সমতটের রাজধানী বলে নির্দেশ দিয়েছেন। (৬)

তাঞ্জোরে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দিতে উৎকীর্ণ একটি প্রশস্তিতে 'বঙ্গলম' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গলম হতে আরবী ভাষায় বাংলা নামের উৎপত্তি হয়েছে। আরবী হতে ফারসী ভাষায় তা গৃহীত হয়।

(৪) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

(৫) অভিধান চিন্তামনি, ৯৫৭ শ্লোক।

(৬) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

www.pathagar.com

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল লিখেছেন "নামি অস্‌লি বাংলা বংগ" অর্থাৎ বাংলার প্রকৃত নাম বঙ্গ (৭)।

নদী মাতৃক পূর্ব বঙ্গের অধিকাংশ স্থানই গংগা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ নদীর জলরাশী দ্বারা প্লাবিত হতো এবং অধিবাসীগণ উচ্চ আল বেঁধে পানির প্লাবন হতে দেশ রক্ষা করতে যত্নবান হতো। তজ্জনাই বংগ+আল হতে প্রথমে বংগাল পরে বাংগাল নামের উৎপত্তি হয়েছে। সংস্কৃত পন্ডিতগণ আবুল ফজলের এ মত স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে বংগ+আলয় হতে প্রথমে বংগালা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে এবং ক্রমে অপভ্রংশে বংগাল, বংগালা এবং বাংলাতে রূপান্তরিত হয়েছে। মহা মহোপধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "যখন বংগাল শব্দটি বাংগালা রূপধারণ করে খুব চলতি হয়ে গেল তখন বাংগালা বলতে পূর্ব বাংলা বুঝাত।"

চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে ভুসুক বা শান্তিদেব লিখেছেন "বজ্রবত্রাইব পাড়ী পউআ-খালে বাহিউ অদঅ বঙ্গাল ক্লেশ লুডিও আজিভুসু বংগালী ভইলী নিঅ ঘরিণী চন্ডালী লেলী" অর্থাৎ বজ্রানৌকা পাড়ি দিয়া পদ্ম খালে রহিলাম আর অদ্বয় যে বঙ্গলাদেশ তাহাতে আসিয়া ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম। রে ভুসু আজ তুমি সত্য সত্যই বাংগালী হইলে, যেহেতু নিজ ঘরণীকে চন্ডালী করিয়া লইলে। (৮)

মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, গরুড় পুরাণ, মৎস পুরাণ হরি বংশ এবং ঋগ্বেদে বাংলাদেশের অধিবাসীগণকে অত্যন্ত হেয় এবং ঘৃণ্য বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ঋগ্বেদের ঐতরের আরণ্যকে বলা হয়েছে "বঙ্গদেশবাসীগণ কি দুর্বলতা, কি দুরাহার ও কি বহু অপত্যতায় কাক, চটক ও পারাবতাদি সদৃশ (৯)। আর্যগণ বঙ্গ দেশে পদার্পন করলে তাদের আর্যত্ব নষ্ট হয়ে যেত। মনুর বিধান অনুযায়ী তীর্থ-যাত্রা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে গমন করলে দ্বিজাতিকে পুনরায়

---

(৭) Linguistic Survey of India, vol v, parf I

(৮) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা—১৩২১।

(৯) যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের ইতিহাস।

www.pathagar.com

সংস্কার গ্রহণ করতে হবে। বৌধায়ন সূত্রকারগনও মনুর অনুসরণ করে বঙ্গ এবং পুণ্ড্রদেশে গমন করলে পুনষ্টোম যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান দিয়েছে (১০)।

মহাভারত, পুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থে বাংলাদেশ বাসীদের কুৎসা রটনা করা হয়েছে। এ সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছিল বহিরাগত আর্যদের দ্বারা তারা তখনও বাংলাদেশে আগমন করেনি। বাংলাদেশের প্রতি তারা ছিল বৈরী ভাবাপন্ন। কিন্তু বিদেশী ঐতিহাসিক এবং পর্যটকদের ভ্রমন বৃত্তান্ত হতে জানা যায় যে বাংলাদেশবাসীগণ তখনও শৌর্যবীর্য, সভ্যতা এবং কৃষ্টিতে শীর্ষস্থানীয় ছিল।

ঐতিহাসিক ডাইডোরাস তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে গাংগেয়গণের বহু সংখ্যক মহাকায় হস্তি রয়েছে। এজন্য এদেশ কখনও কোন বিদেশী ভূপতি কর্তৃক বিজিত হয় নি। কারণ অপরাপর সমুদয় জাতিই গাঙ্গেয়গণের বিপুল বলশালী রণকুঞ্জের কথা শুনে ভয় পায়। (১১)।

চীনা পর্যটক ফাহিয়েনের ভ্রমন বৃত্তান্ত হতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে বাংলাদেশ কৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র ভূমি ছিল কৌদ্ধ ধর্ম এবং ভাস্কর্য শিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য তিনি এদেশে দু'বার আগমন করে ছিলেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে চীনা পর্যটক ইউয়ান চোয়াং এদেশে আগমন করেন। এখানে শিক্ষিত লোকের ভীড় দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি জানান এদেশের উর্বর ভূমির বাসিন্দারা কৃষ্ণকায় ক্ষুদ্রাকৃতির হলেও তীক্ষ্ম বুদ্ধিতে অতুলনীয়। তারা অত্যন্ত শ্রমসহিষ্ণু, সুদৃঢ় ও সাহসী। অথচ নিতান্ত ও সাধু অমায়িক। লেখা পড়ার ঝোঁক তাদের সর্বাধিক ও বিস্ময়কর। তাদের রাজধানীতেই ত্রিশটি বৌদ্ধ বিহার ও দু'হাজার ভিক্ষু পন্ডিত রয়েছে। জৈন পন্ডিতদের সংখ্যাও অনেক।

---

(১০) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

(১১) Grindles Ancient India as descrtbed by Megas Thenes and Arian.

www.pathagar.com

সপ্তম শতকের শেষ ইৎসিত ও সেঙচির বর্ণনায় রয়েছে বংগের বাসিন্দারা ধর্ম ও নৈতিক আদর্শের উচ্চতর শিখরে অধিষ্ঠিত রয়েছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকের গ্রীক ভৌগলিক টলেমীর ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে "গঙ্গা মোহনার সব অঞ্চল জুড়েই গঙ্গারিডীরা বাস করে। তাদের রাজধানী সংগা খ্যাতি সম্পন্ন এক আন্তর্জাতিক বন্দর। এখানকার তৈরী সূক্ষ্ম মসলিন ও প্রবাল রত্নাদি পশ্চিমদেশে রপ্তানী হয়। তাদের মত পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধশালী জাতি ভারতে আর নেই"

তাই বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে পুরান, মহাভারত, হরি বংশ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতাগনের বাংলাদেশবাসী সম্পর্কে যে অভিমত তা ঘোর অজ্ঞতা প্রসূত এবং নিতান্ত বিদ্বেষমূলক। বাংলাদেশ সম্পর্কে বৈদিক আর্যদের এ রূপ মনোভাবের কারন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন' "যখন আর্যগন মধ্য এশিয়া হইতে পাঞ্জাবে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন ও বাংলা সভ্য ছিল। আর্যগন নিজদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্যন্ত উপস্থিত হয় তখন বাংলার সভ্যতায় ঈর্ষাপরায়ন হইয়া তাহারা বাঙ্গালীকে ধর্মজ্ঞান শূন্য এবং ভাষা জ্ঞান শূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে" (১২)।

আর্যদের ভারতে আগমন

ইরানে বসবাসকারী আর্যগন বাদশাহ গোশতাছপের রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত ঘোর অজ্ঞতার তিমিরে নিমজ্জিত ছিল। অন্যান্য প্রাচীন মানব সমাজের ন্যায় তারাও ছিল ঘোর জড় পূজক। প্রকৃতির প্রত্যেক অবদান বজ্র, বিদ্যুৎ এমন কি তারা ব্যাঙ পূজাও করত। এমন সময় জরদশত নামক এক ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব হয়। তিনি যে ধর্মমত প্রচার করেন তা হলো অহুরমাজদা জমিন আছমান, চন্দ্র, সূয সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির একমাত্র সৃষ্টি কর্তা ও একমাত্র

(১২) রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়--বাংলার ইতিহাস।

www.pathagar.com

অধিপতি। মানুষ কোন দেব দেবীর উপাসনা করবেনা। সোমরস বা অন্য কোন মাদক দ্রব্যের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। পরকাল ও কর্ম ফলকে বিশ্বাস করতে হবে। মোট কথা জরদশত ধর্মীয় আন্দোলনের ভিত্তি ছিল নৈতিকতা। কিন্তু যারা নীতি গর্হিত কাজে অবিচল রইল তারা জরদশতের ধর্মীয় আন্দোলনের বিরোধীতা করতে থাকল এবং অবশেষে জরদশতের অনুসারীদের দ্বারা দেশ হতে বিতাড়িত হল। তারা অনেকদিন এদিক সেদিক ঘুরাফেরা করে অবশেষে হিমালয়ের গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করল। তখন যারা ভারতে বসবাস করত তারা শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি-সভ্যতায় আর্যদের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে তামার অস্ত্র এবং হাতী ব্যবহার করত। পক্ষান্তরে আর্যগন লোহার ব্যবহার জানত এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে লোহার অস্ত্র এবং ঘোড়ায় টানা রথ ব্যবহার করত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তামার অস্ত্রের চেয়ে লোহার অস্ত্র অধিক কার্যকরী এবং হাতীর চেয়ে ঘোড়াটানা রথ বেশী ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন বলে প্রতিপন্ন হল। তাই আর্যগন পাঞ্জাব এবং অযোধ্যার অধিবাসীগনকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে সক্ষম হল এবং তাদের নেতা দেবরাজ ইন্দ্র আদি বাসিন্দাদের প্রাচীর ঘেরা নগরী (পুর) ধ্বংস করে পুরন্দর উপাধিতে ভূষিত হলেন (১৩)।

আর্যদের অধিকৃত এলাকা আর্যাবর্ত নামে পরিচিত হল। কিন্তু আর্যগন সমগ্র উত্তর ভারত তাদের দখলে নিতে পারেনি। যোগেন্দ্রনাথ সেন তাঁর বিক্রমপুরের ইতিহাসে লিখেছেন "বৈদিক যুগে যখন আর্যগন প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তাঁহারা পশ্চিমে সুলেমান গিরি শ্রেণী এবং পূর্বে পবিত্র সলিলা গঙ্গা যমুনার পুন্য সংগম, উত্তরে তুষার শুভ্র হিমালয় হইতে দক্ষিনে সিন্ধু সংগম পর্যন্ত প্রকৃতির এই লীলা নিকেতনের মধ্যেই তাদের বাসস্থান সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। আর্যগনের অধিকৃত এই ভূমি খণ্ডই আর্যাবর্ত নামে অভিহিত হইত" (১৪)। তাই দেখা যায় যে আর্যাবর্তের পূর্ব সীমা ছিল গঙ্গা যমুনার সংগমস্থল

(১৩) সুরঞ্জিত দাস গুপ্ত--ভারতবর্ষ ও ইসলাম।

(১৪) যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত--বিক্রম পুরের ইতিহাস।

www.pathagar.com

অর্থাৎ এলাহাবাদ। দক্ষিন সীমা ছিল সিন্ধু সংগম পর্যন্ত। এর বাইরে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা আর্যাবর্ত বহির্ভূত ছিল।

পশ্চিমে সুলেমান পর্বতমালা, পূর্বে এলাহাবাদ, উত্তরে হিমালয় পর্বত এবং দক্ষিণে সিন্ধু সংগম পর্যন্ত বিস্তৃত যে এলাকাটি আর্যাবর্ত নামে পরিচিত তা একটি মাত্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রথমে এ ভূখন্ডটি অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য বা মহাজন পদে বিভক্ত ছিল যেমন ভারত, সৃঞ্জয়, যদু, পুরু ইত্যাদি। পরবর্তী কালে এ অঞ্চলে যে সমস্ত রাজ্যের নামোল্লেখ রয়েছে সেগুলো হলো— কাশী, কোশল, চেদী, কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেন, অবন্তি ইত্যাদি। এ সমস্ত রাজ্যের রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমনের পূর্বে আর্যাবর্তের ইতিহাসের উৎস হচ্ছে ঋগ্‌বেদ এবং মহাভারত। কিন্তু এগুলোতে কোন প্রামাণিক ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয় নি। আর্যাবর্ত সম্পর্কে বিবরণ প্রথম লিপিবদ্ধ করেন মেগাস্থিনিসা। আলেকজান্ডারের সেনাপতি এবং এতদাঞ্চলে তাঁর উত্তরোধিকারী সেলিউকাস মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় দুত হিসাবে তাঁকে প্রেরণ করেন। কিন্তু এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে গ্রীক বীর আলেকজান্ডার পুরু বংশীয় নৃপতিকে পরাজিত করে পাঞ্জাব পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ছিলেন মাত্র। তাঁর বিজয় রথের চাকা পাঞ্জাবে পৌঁছেই থেমে যায়। তখন উত্তর ভারত ছিল প্রবল প্রতাপান্বিত নন্দ বংশীয় সম্রাটদের অধীনে। পাঞ্জাব ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারত নন্দ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নন্দ বংশীয় সম্রাটদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র অর্থাৎ বর্তমানের পাটনা। পাটনা আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নন্দ বংশীয় সম্রাটগন ও আর্য সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন না। তাই এদেশ সম্পর্কে মেগাস্থিনিস অনুমান এবং জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে তাঁর বিবরন লিপিবদ্ধ করেছেন। মেগাস্থিনিস যে বই লিখে ছিলেন তার নাম ছিল Indiea। মূল পুস্তক বহু পূর্বেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে বিভিন্ন পুস্তকে Indiea হতে যে উদ্ধৃত দেয়া হয়েছিল ঐতিহাসিক

www.pathagar.com

Diodorus তা সংকলন করে একটি পুস্তক প্রনয়ন করেন যা বর্তমানকালের ঐতিহাসিকগন ব্যবহার করে থাকেন। নন্দ সম্রাটগনের সাম্রাজ্যের নাম ছিল মগধ। নন্দ সম্রাটদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে জানতে পেরে আলেকজাণ্ডার ভীত হয়ে পড়েন এবং পাঞ্জাবের পূর্ব দিকে অভিযান চালানো থেকে বিরত থাকেন। তাই প্রতিদ্বন্দী নন্দ সম্রাটগনের প্রতি গ্রীকগন বিদ্বেষ পোষন করত। মেগাস্থিনিস তাঁর বিবরণে নন্দ সম্রাটদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নন্দ রাজাকে "নীচকুল সম্ভূত ও নাপিতকুমার" বলে বর্ণনা করেছেন। হেম চন্দ্রের "পরিশিষ্ট পর্ব" নামক জৈন গ্রন্থ নন্দ বংশীয় রাজাগনকে নাপিত কুমার বলে উল্লেখ করা হয়েছে (১৫)

জৈনগন কর্তৃক নন্দ রাজাগন নিন্দিত হবারও কারণ রয়েছে। চন্দ্র গুপ্ত মৌর্য নন্দ বংশ উৎখাত করে মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্র গুপ্ত জৈন ধর্মাবলী ছিলেন। তাই জৈনগনের পক্ষে নন্দ রাজগন্যক হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালানো স্বাভাবিক। ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে "নন্দ রাজা বাংলা হইতে গিয়ে পাটলি-পুত্রে রাজ্য স্থাপন করিবেন ইহা অসম্ভব নহে। পরবর্তী কালে পাল রাজাগন তাহাই করিয়া ছিলেন।" (১৬)

পরবর্তীকালে চন্দ্র গুপ্ত নন্দ বংশ উৎখাত করে মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্র গুপ্ত আর্যতো ছিলেনই না বরং তিনি ছিলেন ঘোর আর্য বিরোধী। তাই আর্যগন তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে প্রচার করেন যে তিনি মুরা নামক সুদ্রানীর গর্ভজাত সন্তান বলে তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম হয় মৌর্য বংশ।

শ্রী যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত তাঁর বিক্রমপুরের ইতিহাসে লিখেছেন "চানক্যের কৌশলে নন্দ বংশ ধ্বংশের পর ৩৭২ খৃঃ পূঃ চন্দ্র গুপ্ত ভদ্রবাহু নামক জনৈক যতির শিষ্যত্ব গ্রহন করেন এবং

---

(১৫) আবদুল জব্বার—বাংলাদেশের ইতিহাস।

(১৬) The History of Bengal, Vol. 1 Compiled by Dacca University.

www.pathagar.com

চন্দ্র গুপ্ত ব্রাহ্মন বিরোধী ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মনগন তাহাকে 'বৃষল' বলিয়া লাঞ্ছিত করিয়া গিয়াছেন (১৭)। ঋগ্বেদের ভাষ্যকার মহেন্দ্র চন্দ্র রায় তত্বনিধি বলেন "দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে প্রবল পরাক্রান্ত মগধের নাগ বংশীয় মহানন্দী সুত চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের পর হইতেই আর্য রাজত্ব বিলোপ হইয়া ক্ষত্রীয় ধর্ম ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে" (১৮)।

প্রবল পরাক্রান্ত মগধ সাম্রাজ্য উত্তর পশ্চিম দিকে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তত্বনিধি মহাশয়ের মতে চন্দ্র গুপ্ত বেদ বিরোধীও ছিলেন এবং ভারতবর্ষ হতে বেদকে বিদূরিত করেছিলেন। সম্রাট অশোকের সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশী বিস্তৃতি লাভ করে; কিন্তু সম্রাট অশোক বাংলাদেশকে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন নি। শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায় বলেন "অশোকের আদেশলিপি সমূহে বাংলার কোনও অংশেরই নামোল্লেখ না থাকায় ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ ঢাকা অঞ্চল অশোকের সাম্রাজ্য বহির্ভূত বলিয়া তদীয় মানচিত্রে চিহ্নিত করিয়াছেন" (১৯)।

গৌড় রাজমালার গ্রন্থকারের মতে তখন প্রাচীন রাঢ় এবং পুন্ড্র গাংরিডয় অর্থাৎ বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তা না হলে প্রবল পরাক্রান্ত মগধ রাজের সাথে প্রতিযোগীতা করে স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভবপর হতো না। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে গাংরিডয়ের রাজধানী ছিল সোনার গাঁও। তাই পুন্ড্র এবং রাঢ় সে সময়ে সোনার গাঁও হতে শাসিত হতো। এ মতের সমর্থন মিলে সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্য থেকে।

সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থে এক অখ্যাত নামা বংগ রাজার সন্ধান পাওয়া যায়। এ বংগ রাজ্যের কন্যার নাম ছিল সুপ্রা দেবী। বয়স্কা হলেও সুপ্রা দেবীর বিবাহ হচ্ছিল না। ফলে পিতার সাথে

(১৭) শ্রী যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত—বিক্রম পুরের ইতিহাস।

(১৮) মৌঃ আক্রাম খাঁ--মোসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস।

(১৯) যতীন্দ্র নাথ রায়--ঢাকার ইতিহাস।

www.pathagar.com

তাঁর মন্তান্তর ঘটে এবং তিনি একাকিনী পিতৃভবন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। এ সময়ে এক সার্থ পতি বংগ হতে মগধ যাচ্ছিলেন। সুপ্রাদেবী তাঁর আশ্রয় গ্রহন করেন (২০)। এ সার্থ পতিকেই সার্থ সিংহ বলা যেতে পারে (২১)। সুপ্রাদেবীর গর্ভে সার্থ সিংহের যে পুত্র জন্মে তার নাম সিংহবাহু। ইউয়ান চোয়াং সার্থ সিংহকে জম্ব দ্বীপের মহা বণিক এবং এর নাম সিংহ বলেছেন। যা হোক বংগ রাজের দৌহিত্র এ সিংহবাহু শতযোজন অরন্যে সিংহপুর নামক নগর এবং গ্রাম সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহ বাহুর রাষ্ট্র "ঘাড় রড" নামে অভিহিত ছিল। জৈন শাস্ত্রে লাড়কে রাঢ় বলে। লাড় বা রাঢ় বর্তমানের রাঢ় ব্যতীত কিছুই নয়। কেউ কেউ সিংহপুর-কে হুগলী জেলার সিংগুর বলে অনুমান করে থাকেন। সিংহবাহুর পুত্রই বিজয় বাহু বা বিজয় সিংহ তাম্রপানি জয় করায় তদীয় নামানুসারে ঐ দ্বীপের নাম সিংহল বলে পরিচিত হয়েছে। নির্বানোন্মুখ ভগবান বুদ্ধ যে দিন কুশী নগরের শাল তরুদ্বয়ের মধ্যে দেহ রক্ষা করে ছিলেন, কুমার বিজয় সিংহ পোতারোহনে সেদিন তাম্রপানি দ্বীপে সদল বলে উপনীত হয়েছিলেন (২২)।

এ উপাখ্যান হতে অনুমিত হয় যে রাঢ় অঞ্চল বাংলার রাজার-দৌহিত্র কর্তৃক আবাদকৃত হয়েছিল এবং তা সংগাবিভয় রাজ্যের অধীন ছিল।

বাংলাদেশ মুসলমানদের আগমনের পূর্বে কোন দিনও অবাংগালী রাজা বা সম্রাটের পদানত হয়নি। তাই কোন বিজয়ী রাজার শিলালিপি, বিজয় স্তম্ভের গায়ে ক্ষুধিত লিপি থেকে এর ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় না। একমাত্র অশোক স্তম্ভের গায়ে সমুদ্র গুপ্তের প্রতি হরিসেনের বিরচিত প্রশস্তিতে সমতট ডবাকের উল্লেখ রয়েছে।

---

(২০) Mahavarsa chapter-VI & XI th book of the Sujuki.

(২১) সাহিত্য পরিষ্য পত্রিকা -১৩১৫।

(২২) Uphan's Sacred Books of Ceylon—1, Page 67 and Vol.—II. Page 164.

www.pathagar.com

হরিসেনের বিরচিত প্রশস্তির অর্থ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। এতদসম্বন্ধে ঐতিহাসিক ফ্লিট সাহেব বলেন "This may denote either the kings within the frotiers of Samatata and the following countries i.e. neighbouring countries. Kings of those countries or the kings or chieftains, just outside the frontiers of them. Upon the interpretation that is accepted will depend the question whether Samudra Gupta's empire included those countries or whether extended upto, ahd was boundeo by, their frontiers" ঐতিহাসিক শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায় বলেন "সমতট-ডবাক প্রভৃতি রাজ্য সমুদ্র গুপ্তের সাম্রাজ্যান্তর্গত প্রান্ত সীমায় অবস্থিত অথবা ঐ সমুদয় রাজ্য তদীয় সাম্রাজ্যের বহিঃ প্রান্ত দেশে অবস্থিত ছিল, এতদ্বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়" (২৩)।

হরিসেন ছিলেন সমুদ্র গুপ্তের প্রশস্তিকার এবং চাটুকার। তাই তাঁর এ প্রশস্তিতে সমুদ্র গুপ্তের বীরত্ব এবং রাজ্যের বিস্তৃতিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো স্বাভাবিক। এখন নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বাংলাদেশ সমুদ্র গুপ্তের রাজ্যের বাইরে ছিল। তাই এতদাঞ্চলে তাঁর কোন শিলা লিপি বা বিজয় স্তম্ভের সন্ধান মেলেনি। প্রফেসার আবদুল জব্বার তাঁর বাংলাদেশের ইতিহাসে ডঃ ডি,সি, গাংগুলীর বরাত দিয়ে বলেন, "গুপ্ত রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাংগালী ছিলেন। পরবর্তী কালে রাজ্য সীমা বৃদ্ধি পাওয়ায় চন্দ্র-গুপ্ত বা অন্য কেহ মগধে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন" (২৪)।

---

(২৩) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

(২৪) প্রফেসার আবদল জব্বার—বাংলাদেশের ইতিহাস।

www.pathagar.com

পাল বংশ

এ উপ-মহাদেশে অর্যাবর্তের আর্যগন কখনও আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমনের পর হতে এ উপ-মহাদেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী হতে যেন তেন প্রকারে ইতিহাসের কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমনের সময় মগধ সাম্রাজ্য ছিল প্রবল পরাক্রমশালী। মগধের রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র অর্থাৎ পাটনায়—আর্যাবর্তের কোন স্থানে নয়। সমগ্র আর্যাবর্ত মৌর্য সম্রাটগনের পদানত ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পর মগধে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রাধান্য লাভ করে এবং সমগ্র আর্যাবর্তে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকের গুপ্ত সম্রাটগন হিন্দু ধর্মের সমর্থক হলেও পরে যখন সম্রাট বলাদিত্য বসুবন্ধু নামক জনৈক বৌদ্ধ সন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহন করেন তখন হতে গুপ্ত সম্রাটগন বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ান। আমরা পূর্বে এ কথাও উল্লেখ করেছি যে সমস্ত আর্যাবর্ত মৌর্য এবং গুপ্ত সম্রাটগনের পদানত হলেও বাংলাদেশে তাঁরা তাঁদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। যদিও গুপ্ত রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা একজন বাঙ্গালী হওয়া খুবই সম্ভবপর।

বাংলাদেশের ইতিহাস আরম্ভ হয় পাল সম্রাটের আমল থেকে। পাল যুগের পূর্বে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে ধারণা করা হয় যে, বাংলাদেশে তখন মৎস্য ন্যায় যুগ চলছিল অর্থাৎ ঘোর অরাজকতা বিরাজমান ছিল। এ মৎস্য ন্যায় হতে অব্যাহতি পাবার উদ্দেশ্যে প্রজাবর্গ বিষ্ণুর পৌত্র রাণীতিকুল-ল বপাটের পুত্র গোপাল দেবকে গৌড় বংগের সিংহাসন প্রদান করেছিলেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে গোপাল দেব প্রজাবৃন্দ কতৃক রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধবিগ্রহ বা বল প্রয়োগ দ্বারা রাজ্য জয় করেন নি। জনগণের ভোটে বা রায়ে তিনি সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। লামা তারা নাথ জনসাধারণের এ নির্বাচনের অংশ গ্রহনের বিষয় উল্লেখ করেছেন (২৫)। এ দ্বারা প্রমানিত হয় যে

(২৫) Cunning hams—Archaeological Survey report, 148

www.pathagar.com

বাংলাদেশ বাসীগণের মধ্যে তখনও গণতান্ত্রিক চেতনা বিদ্যমান ছিল। গণতান্ত্রিক চেতনার পূর্বশর্ত হল পরমত সহিষ্ণুতা এবং অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। যেখানে এ সমস্ত গুনাবলী বিদ্যমান সেখানে অরাজকতা দেখা দিতে পারেনা।

ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখেছেন "পাল বংশীয় নরপালগণ প্রথমে বংগদেশে অধিকার লাভ করিয়া পরে মগধ জয় করিবার যে কিংবদন্তী তারানাথের গ্রন্থে উল্লেখ আছে "তদধীপ" শব্দে তাহা সমর্থিত হইতেছে। পাল রাজাগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন এই বিশেষন হইতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়" (২৬)।

তারানাথের মতে ধর্মপাল প্রথমে বংগে অধিপত্য বিস্তার করেন। পরে গৌড় প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর প্রভাব বিস্তার লাভ করে। প্রতিহার রাজভোজের সাগরতাল শিলা লিপিতে ধর্ম পালকে "বঙ্গপতি" এবং তাঁর সেনাদলকে বাঙ্গালী বলা হয়েছে। দিনাজপুরের বাদাল প্রস্তর লিপির (গরুড় স্তম্ভ লিপি) দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিত আছে "সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিতেন যে শত্রু (ইন্দ্র দেব) কেবল পূর্ব দিকের অধিপতি, দিগান্তরের অধিপতি ছিলেন না। কিন্তু বৃহস্পতির ন্যায় মন্ত্রী থাকিলেও তিনি সেই একটি মাত্র দিকেও সদ্য দৈত্যপতিগন কর্তৃক পরাজিত হইয়া ছিলেন। আর আমি সেই পূর্ব দিকের অধিপতি ধর্ম নামক নরপালকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি" (২৭)। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে ধর্ম পালকে দৈত্যপতি বলা হয়েছে। ধর্মপাল কান্যকুব্জের রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করেছিলেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে দৈত্য বংশোদ্ভূত প্রহলাদের প্রপৌত্র রাজা বলীকে ছলনা করে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে ছিলেন। বলী যেমন দৈত্যগনের রাজা ছিলেন ধর্মপালও তেমনি দৈত্য নরপতি ছিলেন। তাই নারায়ন পালদেবের ভাগলপুরের তাম্র শাসনে ধর্মপাল সম্পর্কে বলা হয়েছে "সেই বলবান রাজা ইন্দ্র রাজ প্রভৃতি শত্রু বর্গকে

(২৬) গৌড় লেখ মালা ৭৭ পৃঃ পাদটিকা।

(২৭) গৌড় লেখ মালা- ৭১, ৭২, ৭৭ পৃঃ

www.pathagar.com

জয় করিয়া মহোদয় শ্রী কান্যকুঞ্জের রাজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন এবং পুরান প্রসিদ্ধ বলি রাজা যেমন পুরাকালে ইন্দ্রাদি শত্রুগণকে জয় করিয়া মহোদয় শ্রীলাভ করিয়া ও যাচকরুপী চক্রায়ুধ বামনাবতারকে তৎসমস্ত দান করিয়া ছিলেন, এই বলবান রাজা ও সেইরূপ প্রনতিপরায়ঃ বামনরূপে চরাণাবনত চক্রায়ুধ নামক সামন্ত নরপালকে কান্যকুঞ্জের রাজশ্রী প্রদান করিয়া ছিলেন" (২৮)।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজা বলী দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে স্বর্গ জয় করেছিলেন। পরে ইন্দ্র আর বরুন বামনের বেশ ধরে তাঁর কাছে আসেন এবং ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেন। রাজা বলী প্রার্থনা পুরণের প্রতিশ্রুতি দেন এবং এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে পৃথিবী ছেড়ে পাতালপুরীতে গমন করতে হয়।

আয়ুথ অর্থ অস্ত্র। ইন্দ্রের অস্ত্র হল চক্র। তাই চক্রায়ুধ বলতে ইন্দ্রকে বুঝায়। সম্রাট ধর্মপাল কান্যকুঞ্জের অধিপতি ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করে যাচবরূপী চরনাবনত চক্রায়ুধকে (ইন্দ্রকে) প্রদান করেন। এ ঘটনা থেকে বাঙ্গালীদের সাথে প্রভুত্বকামী আগ্রাসনবাদী, শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার আর্যদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা অনুমান করা যায়। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দৈত্যরুপী বাঙ্গালী বলী, বর্দ্ধপাল ইত্যাদি নরপালগন আর্যদের উপর বিজয়ী হয়ে ছিলেন এবং তাদেরকে পদানত রেখে ছিলেন।

ঢাকার ইতিহাস প্রনেতা শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায় বলেন "গৌড় লেখ মালার শ্লোক হইতে প্রতীয়মান হয় যে ভোজমৎস্যাদির দেশের রাজন্যবর্গ কান্যকুব্জপতি চক্রায়ুধের রাজ্যাভিষেক কালে প্রনতিপরায়ন চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করিয়া কান্যকুব্জের সিংহাসনে চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্বেই ধর্মপালকে কাংগড়া, তুরস্ক, পশ্চনদ এবং রাজ পুতনা প্রভৃতি প্রদেশ জয় করিতে হইয়াছিল" (২৯)।

(২৮) গৌড় লেখ মালা—৫৭, ৬৫, পৃঃ
(২৯) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

www.pathagar.com

পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল ৭৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। এরপর ধর্মপাল, দেবপাল, প্রথম বিগ্রহপাল, নারায়নপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল, প্রথম মহীপাল ইত্যাদি রাজন্যবর্গ ১০২৬ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পাল সাম্রাজ্যের পতন বাংলাদেশে হলেও কালক্রমে বাংলা পাল সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যতীন্দ্র মোহন সেন তার ঢাকার ইতিহাসে বলেন "কোন সময়ে কিরূপ ঘটনার মধ্যে বঙ্গ পাল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই" (৩০)। তিনি আরো বলেন, "অনন্য সাধারণ অধ্যবসায়ের বলে অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেও প্রথম মহিপালের অদৃষ্টে অধিককাল পাল সাম্রাজ্য সম্ভোগ ঘটিয়া উঠে নাই। বরেন্দ্র ও মগধে মহীপাল দেবের সময় বিজয় যাত্রার সুযোগেই সম্ভবতঃ চন্দ্র দ্বীপের সামন্ত রাজা শ্রী চন্দ্র হরিকেল বা পূর্ব বঙ্গ অধিকার করিয়া পাল রাজাগণের সংশ্রব ছিন্ন করিয়া ছিলেন" (৩১)। শ্রী চন্দ্রের তাম্র শাসনে যে রাজ মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পাল রাজাগণের রাজ মুদ্রা। সুতরাং ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রথম দিকে চন্দ্র রাজগণ পাল রাজাগণের সামন্ত রাজা ছিলেন।

"ইদিল পুরে এবং রামপালে শ্রী চন্দ্রের দুই খানি তাম্র শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। রামপাল লিপি, শ্রী চন্দ্রদেবের নবাবিষ্কৃত তাম্র শাসন এবং ইদিলপুরের তাম্র শাসন হইতে মধ্য যুগে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বঙ্গ রজ শ্রী চন্দ্রদেবের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় (৩২)। তিনি আরো বলেন, "রামপাল লিপির প্রারম্ভে রাজকবি বৌদ্ধ ধর্ম ও এই ত্রিরত্নের উল্লেখ করিয়া রাজ বংশের বৌদ্ধ মতানুরিক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন" (৩২)।

---

(৩০) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।
(৩১) ঐ ঐ
(৩২) ঐ ঐ

www.pathagar.com

শ্রী চন্দ্রের পর তাঁর বংশধর অপর কেহ বঙ্গ রাজ সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায় না। শ্রী চন্দ্র পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজাগন বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাংলার বেশীর ভাগ লোকই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল এবং সমাজ ব্যবস্থাও ছিল বৌদ্ধদের নিয়ন্ত্রনে।

উন্নতমানের লৌহাস্ত্র ও দ্রুতগামী অশ্বের সাহায্যে আর্যগন এদেশের অধিবাসীদেরকে পরাজিত করে এলাহাবাদ পর্যন্ত দখল করে নিলেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের তুলনায় অনগ্রসর। এদেশের সমৃদ্ধশালী প্রাচীর বেষ্টিত নগরগুলো তারা ধ্বংস করল বটে, কিন্তু তাদের উন্নততর সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাব তারা এড়াতে পারল না।

যাযাবর আর্যদের মধ্যে একটি সুশৃংখল, সুগঠিত ও পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ অভাব ছিল। নৈতিক চরিত্র ছিল তাদের অতিশয় দুর্বল। পরদারগমন, যৌন যথেচ্ছাচার, বহুদার গ্রহন, বহুভর্তৃকত্ব ইত্যাদি আর্যসমাজে বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল। সাধারণ জনগন ছাড়াও দেবদেবীগন এবং দ্বিজ ঋষিগনও ছিলেন লাম্পট্যের চরম শিকার। ফলে দেখা যায়, ঋষি উদ্দালকই যে কেবল পুত্র শ্বেতকেতুর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে নিজ ভার্য্যাকে আগন্তুক ব্রাহ্মনের কামনা পরিতৃপ্তির জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন অথবা দেবরাজ ইন্দ্রের লাম্পট্যের ভয়ে ঋষিগন অতিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁকে অভিসাপ দিয়েছিলেন এমনই নয়, বরং মহাভারত এবং অন্যান্য পুরান পাঠেও এমন বহু ঘটনারই উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণেই এই সমস্ত মহাগ্রন্থে অবৈধ সন্তান জন্ম দানের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হয়।

যাযাবর আর্যদের যতটুকু সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, তা ছিল গ্রাম ভিত্তিক। নগর জীবনের সংগে তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। অবশ্য পরবর্তী সময়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সংস্পর্শে এসে তারা নগর জীবন সম্বন্ধেও ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। আর্যদের ধর্মীয় ব্যবস্থাও প্রথমতঃ ছিল সরল ও আদিম। প্রকৃতির উপাসনা প্রাথমিক

www.pathagar.com

যুগে প্রচলিত ছিল না। আর্যদের মূল ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদে তিনজন ভগবানের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেবদেবীর সংখ্যা বহু বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরানা অনেক দেবতার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

বেদ সম্ভবতঃ বিভিন্ন ঋষিকর্তৃক বিভিন্ন সময়ে রচিত শ্লোকের সমাহার (৩৩)। ফলে সময়ের সংগে পরিবেশ, প্রয়োজন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মানসিকতার পরিবর্তনের প্রভাব শ্লোক গুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে। এ জন্যে বেদে একটি সামগ্রীক পরিপূর্ণ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সুনির্দিষ্ট স্থায়ী ধর্মীয় বিধান অনুপস্থিত।

কিন্তু স্থানীয় অনার্যদের বহু পূর্ব থেকেই একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় বিধান ছিল। এ সম্বন্ধে সুরজিত দাস গুপ্ত বলেন "এ বিষয়ে পন্ডিতেরা নিঃসন্দেহ যে বৈদিক আর্যদের ভারতবর্ষে আসার অনেক আগে থেকেই অনার্য্যদের একটি নিজস্ব ধর্মীয় জীবন ছিল" ৩৪)। আর্য সমাজে পরবর্তী সময়ে যেভাবে অনার্য ধর্মীয় রীতিনীতি ও ভাব ধারার অনুপ্রবেশ ঘটে তাতে একথাই প্রতিপন্ন হয় যে আর্য ধর্মীয় বিধান এই দেশে পৌঁছার আগে অসম্পূর্ণ ছিল অথবা অনার্যদের ধর্মীয় বিধান ও রীতিনীতি আর্যদের অপেক্ষা উন্নততর ছিল। ফলে অনার্যদের বহু দেবদেবী আর্যদের আরাধ্য দেবদেবীতে পরিণত হয়। বিষ্ণু আর শিব দখল করে নেয় ইন্দ্র আর বরুণের স্থান। এ বিষয়ে এন সাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে Most of the great gods of Rigveda such as Indra, Agni, Barun are of secondary importance to Hinduism in latter Hinduism and have yielded pride of place to other divinities, who either play a minor part in vedic religion or are not mentioned at all. Another god who has lost a great deal of importance, is Brahma, This name seems to have evolved as an epithet applied to the creator god, of the later vedas prajapate which eclipsed the latter rame in popularity. At the time of

(৩৩) মাওলানা আক্রাম খাঁ—মোসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস।

(৩৪) এন সাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকার উপহিন্দুইজম নিবন্দ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

Budha Brahma was looked down upon as the high god in Eastern India."অর্থাৎ" পরবর্তী কালে বেদে উল্লেখ নেই বা অনুল্লেখযোগ্য দেবতাদের তুলনায় ইন্দ্র, অগ্নি, বরুনের গুরুত্ব হ্রাস পায় ব্রহ্ম নামক অপর দেবতা মর্যাদাহীন হয়ে পড়ে। ব্রহ্মা স্রষ্টা হিসাবে বিবেচিত হতেন তার পরিবর্তে প্রজাপতির জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। বৌদ্ধের সময় পূর্ব ভারতীয় এলাকায় ব্রহ্মাকে উচ্চ আসন দেয়া হতো (৩৫)।

ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন বিষ্ণুর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হল "২০/২১ বৎসরের রাজকীয় পোষাক পরিহিত কৃষ্ণবর্ণের একজন যুবক (৩৬)। আর্যগন কৃষ্ণ বর্ণের হতে পারে না। তারা গৌরবর্ণের। এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকাতে, বিষ্ণুকে হিন্দুদের দেবতাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। সুরজিত দাসগুপ্ত আরো বলেন "কালে কালে অনার্যদের শিব আর আর্যদের রুদ্র এক হয়ে যান (৩৭)।" তাই অনার্যদের দেবতা শিব আর্যদের ধর্মে দেবতা হিসাবে স্থান পান।

আর্য সমাজ যা নাকি হিন্দু সমাজ নামেও পরিচিত তাতে অনার্যদের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন "কৃষ্ণ দৈপায়নের পিতা, পরাশর ব্রাহ্মণ, মাতা, সত্যবতী মৎস্যজীবি দাস বা দস্যু অর্থাৎ অনার্য কন্যা আর মাতামহী চন্ডাল কন্যা, পক্ষান্তরে কৃষ্ণ বাসুদেব বর্ষ্ণেয়-র পিতা, বাসুদেব ক্ষত্রিয় আর মাতা দেবকী দস্যু বা অনার্য কংশের ভগ্নি। ব্যাস মানে যে রেখা বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করে দুদিকের পরিধি স্পর্শ করে এবং ব্যাস দেবতো প্রকৃত পক্ষে সেই ব্যক্তি যিনি একদিকে আর্যদের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বৈদিক তথা শ্রুতির মন্ত্রগুলোকে একত্রে সংকলন করে চতুর্বেদ লিপিবদ্ধ করেন। অন্যদিকে অনার্যদের মধ্যে প্রচলিত কথা গাঁথা সংগ্রহ করে পুরাণ রচনার ধারা প্রবর্তন করেন, তদুপরি তিনিই কৃষ্ণ বাসুদেব বার্ষ্ণেয়-র শিক্ষা ও বাণীকে ভগবদ গীতা রূপে মহাভারতের জটিল বিশাল দুর্গে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেন (৩৮)।

---

(৩৫) ভারত বর্ষ ও ইসলাম—সুরজিত গুপ্ত।

(৩৭) সুরজিত দাস গুপ্ত—ভারত বর্ষ ও ইসলাম।

(৩৮) ঐ

www.pathagar.com

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ কালো। পূর্বেই বলা হয়েছে কোন আর্য কালো রংয়ের হতে পারে না। তাই অনার্য কৃষ্ণ আজ অনার্য দেবতা বিষ্ণুর অবতার হিসাবে আর্য হিন্দুদের ঘরে পূজা পাচ্ছেন। ব্যাসদেব ও বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন অনার্য। আর্যগণের ধর্ম পূর্ণতা পেল অনার্য দেব দেবীদের দ্বারা। অনার্যগণ কর্তৃক তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাদি রচিত হলো। কিন্তু প্রভুত্বকামী আর্যগণ বর্ণবাদী প্রথার প্রবর্তন করে অনার্যদের পায়ের নীচে ফেলে দলিত করতে থাকল। বর্ণবাদী আর্যগণের ধর্মীয় দর্শন হলো, ব্রাহ্মনগণ ব্রহ্মার মুখ হতে, ক্ষত্রিয়গণ বাহু হতে, বৈশ্যগণ তাঁর উরু হতে এবং শুদ্রগণ তাঁর পদযুগল হতে উৎপন্ন। তাই শুদ্রের কাজ হল উপরের তিন জাতির সেবা করা।

ব্রাহ্মনগণের কাজ হল যজন, যাজন এবং অধ্যয়ন। শাস্ত্র বিদ্যা শেখানো এবং শেখা ব্রাহ্মনদের কাজ। ক্ষত্রিয়দের কাজ হলো অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করা এবং অস্ত্র পরিচালনা করা। বৈশ্যদের কাজ হলো ব্যবসা বাণিজ্য করা। আর শুদ্রদের কাজ হল এ তিন জাতির সেবা করা।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মনদের শ্রেষ্ঠত্ব থাকার কারণে আর্য ভারত ছিল ব্রাহ্মনদের প্রভুত্বাধীন। ব্রাহ্মনদের প্রভুত্ব ক্ষত্রীয়দের মেনে চলাই ছিল নিয়ম। ধর্মের চাবিকাঠি ছিল ব্রাহ্মনদের হাতে। অস্ত্রজীবি ক্ষত্রিয়গণের কাজ ছিল দেশ রক্ষা করা, রাজ্য বিস্তার করা এবং দেশ শাসন করা। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তাদেরকে ব্রাহ্মনদের দেয়া অনুশাসন মেনে চলতে হতো। রামায়নের নায়ক রামের পিতা-পুত্রে ষিযজ্ঞের আয়োজন করলে পর যজ্ঞে পৌরহিত্য করার জন্য বশিষ্ট মুণির দ্বারস্থ হতে হয়েছিল এবং তাঁর পরামর্শমত যজ্ঞ পরিচালনার জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ মুণিকে আনতে হয়েছিল। ব্রাহ্মনগণ ছিল বুদ্ধিজীবি। তারা তাদের প্রভুত্ব রক্ষার জন্যে যাবতীয় কলা কৌশল অবলম্বন করত। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্রাহ্মন এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। যেমন দ্বাপর যুগে বিষ্ণুর অবতার রাম ছিলেন একজন ক্ষত্রিয়

www.pathagar.com

সন্তান। ত্রেতা যুগে বিষ্ণুর অবতার ছিলেন দ্বারকার রাজা। তাঁরা উভয়েই ছিলেন অব্রাহ্মন। তুলনা মূলক ভাবে ক্ষত্রিয়দের চাইতে ব্রাহ্মনগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের জন্যে বশিষ্ট বিশ্বামিত্রার উপখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে। রাজা বিশ্বামিত্রা লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে মৃগয়া করতে একদিন এক বনে গেলেন। সেখানে বলিষ্ট মুনির আশ্রম ছিল। মুনি রাজাকে সদল বলে ভোজের জন্য আমন্ত্রন জানালেন। রাজা ভেবে অবাক হলেন যে আশ্রমবাণী দরিদ্র মুনি এত লোককে কেমন করে আপ্যায়িত করবেন। বশিষ্ট মুনির একটি কামধেনু ছিল। মুনি আদেশ করা মাত্র কামধেনুটি রাজা এবং অনুচরদের জন্যে প্রচুর খাদ্য সম্ভার সরবরাহ করতে লাগল। কামধেনুটির আশ্চর্য জনক ক্ষমতা দেখে বিশ্বামিত্রার একে পাবার জন্যে লোভ হলো। তিনি ঋষির নিকট কামধেনুটি চাইলেন। ঋষি এতে অসম্মতি প্রকাশ করলে রাজা তার লক্ষাধিক সৈন্যকে আদেশ দিলেন কামধেনুটি বল পূর্বক ছিনিয়ে নিতে। ঋষিও কামধেনুকে আদেশ করলেন রাজকীয় বাহিনীকে হটিয়ে দিতে। অমনি লাখ লাখ সৈন্য এসে রাজকীয় বাহিনীকে খতম করে ফেলল। ব্রহ্মতেজ দেখে রাজকীয় ক্ষমতা বিশ্বামিত্রার নিকট তুচ্ছ মনে হলো এবং তিনি ব্রাহ্মতেজ লাভের অভিলাষী হলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভের জন্যে তিনি ঘোরতর তপস্যায় রত হলেন এবং ত্রিশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যার পর আংশিক ব্রহ্মতেজ লাভ করলেন। তাই বলা হয় ক্ষাত্র শক্তির আংশিক ব্রহ্মতেজ লাভ ত্রিশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যার ফল।

কিন্ত এসবসত্বেও সাময়িক ভাবে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব ব্রাহ্মনদের হাত থেকে ক্ষত্রিয়দের হাতে চলে যেত এবং মহা ভারতের যুগে ব্রাহ্মনদের উপর ক্ষত্রিয়দের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই দেখা যায় ব্রাহ্মন দ্রো নার্চায যজন, যাজন, অধ্যয়ন ছেড়ে দিয়ে অস্ত্র বিদ্যা বিশারদ হয়েছেন এবং পঞ্চ পাণ্ডব তাঁর নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা লাভ করছেন।

বৈশ্যগন ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। রাজনৈতিক এবং সামাজিক অংগনে তাদের কোন প্রভাব ছিল না।

www.pathagar.com

পূর্বেই বলা হয়েছে আর্যদের আগমনের পূর্বে যারা এদেশে বসবাস করত তারা আর্যদের চেয়ে উন্নততর সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। তাদের নৈতিক মান ও অনেক উঁচুস্তরের ছিল। তবে তাদের এক দল বিজয়ী আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করে তাদের প্রভুত্ব মেনে নিল। যারা আর্যদের প্রভুত্ব মেনে নিল তারা আর্য সমাজে ঠাঁই পেল না। তারা শুদ্র নামে পরিচিত হলো। শুদ্রদের কাজ ছিল তার উপরের ত্রিবর্ণের পদসেবা করা। রাম রাজত্ব কায়েম করা প্রত্যেক বর্ণ হিন্দুর ঐকান্তিক ইচ্ছা। রামায়ন হতে একটি উদাহরণ পেশ করলেই বুঝা যাবে যে আর্য হিন্দু সমাজে এ সমস্ত শুদ্রের অবস্থা কি রকম ছিল।

শুদ্রগণের ধর্ম চর্চা করার অধিকার ছিল না। বেদ মন্ত্র শুনলে তাদের কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হত। বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করলে তাদের জিহ্বা উপড়ে ফেলা হত। যপতপ করা ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ। তাদের একমাত্র কাজ ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের পদসেবা করা।

রামের রাজত্বে জনৈক ব্রাহ্মনের পুত্র অকালে মারা যায়। ব্রহ্মন রামের নিকট অভিযোগ করেন যে দেশের মধ্যে ঘোর অনাচার চলছে তাই তার পুত্রের অকাল মৃত্যু হয়েছে। এর পর রাম চন্দ্র অনাচার অনুসন্ধানে বের হন। তিনি বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে শৈবাল গিরির উত্তরে এক বিশাল সরোবর দেখলেন। সে সরোবর তীরে অধোমুখে লম্বমান তপোরত তাপসকে দেখে এগিয়ে গেলেন এবং তার নাম জানতে চাইলেন। যেই তপোনিরত তপস্বী নিজেকে শুদ্র বলে পরিচয় দিলেন অমনি ভগবান রাম চন্দ্র খড়্গ নিষ্কাশিত করে শুদ্রের মস্তক ছেদন করলেন। শুদ্র নিহিত হলে ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেব বৃন্দ সাধু সাধু বলে অকুন্ঠলে রাম চন্দ্রের প্রশংসা করতে করতে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। মৃত ব্রাহ্মন তনয় জীবিত হয়ে উঠলেন। (৩৯)

---

(৩৯) রাজসেখর বসু কর্তৃক রচিত বাল্মিকী রামায়ন।

www.pathagar.com

এ সমস্ত শূদ্রদের বশে রাখার জন্যে রহস্যাবৃত জন্মান্তরবাদের মত-বাদ প্রচার করা হল। যার অর্থ হল এ জন্মে যদি শূদ্রগন ব্রাহ্মন ইত্যাদি উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের পদসেবা করে তাদের সন্তুষ্ট রাখতে পারে তবে পরজন্মে তারা উৎকৃষ্টতর যোনীতে জন্ম গ্রহন করবে। রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের মতে জন্মান্তরবাদ একটি ভাওতা এবং খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দে ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহন এর উদ্যোক্তা (৪০)।

যে সমস্ত অনার্য আর্যদের প্রভুত্ব মেনে নিতে পারেনি এবং নিজে-দের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় আগ্রহী ছিল তারা পাহাড় জংগলে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে থাকে। সংখ্যায় তারা বেশী এবং আধুনিক কাল পযন্ত নিজদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে গিয়ে তাদের বরাবরই হিন্দু সমাজের নিম্নতর স্তরে পড়ে থাকতে হয়েছে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রেও সাধারণ সুযোগ সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত থাকতে হয়েছে (৪১)।

যারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছিল তারা হিন্দু সমাজে অছ্যুৎ নামে পরিচিত। এদের স্থান শূদ্রেরও নীচে। মেথর, চন্ড ল, ডোম ও বাগ্দীগন এদেরই বংশধর। জন বসতির বাইরে এদের জন্য এলাকা নির্ধারিত। এরা সেখানে নিজস্ব পদ্ধতিতে জীবন যাপন করে।

আর্য হিন্দুরা অনার্য হিন্দুদের ধর্ম দ্বারা নিজেদের ধর্মীয় কাঠামো পূরণ করল। অনার্যদের রচিত পুস্তকাদি নিজেদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ হিসাবে গ্রহন করল। অনার্যদের দেবদেবী তাদের নিকট হতে পূজা পেতে লাগল। কিন্তু অনার্যগনকে মন্দির হতে বের করে দেয়া হল। ব্রাহ্মনগণ পুরোহিত সাজল আর অপরাপর বর্ণ হিন্দুরা পূজার নৈবেদ্য নিয়ে উপস্থিত হতে লাগল। ভারতীয় সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি, আর আম্বেদকরের কথায় বেদনাদায়ক এ দৃশ্যটি বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। বি, আর আম্বেদকর ছিলেন একজন অছ্যুৎ সন্তান। কিন্তু অসাধারণ মেধাবী। পাঠ্য জীবনে তাঁকে অন্যান্য ছাত্রদের সাথে একত্রে বসতে বা শ্রেণী কক্ষে ঢুকতে দেয়া হতো না। শ্রেনী কক্ষের

(৪০) রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন—ভল্গা থেকে গংগা।

www.pathagar.com

বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের পাঠ তৈয়ার করতেন। তিনি অস্পৃশ্য, এ কারণে কোন অফিস আদালতে ঢুকতে পারতেন না। কিন্তু পরে অসাধারণ প্রতিভা বলে তিনি ভারত সরকারের আইন মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং ভারতীয় সংবিধান প্রনয়নের গৌরব লাভ করেছিলেন। ভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর বিশেষ সহকারী এম, ও, মাথাইর সাথে কথোপকথন কালে তিনি বলেছিলেন "The Hindus wanted the Vedas and they sent for Vyasa, who was not a caste Hindu. The Hindus wanted an epic and they sent for Valmiki, who was an untouchable. The Hindus wanted constitution and they have sent for me." "অর্থাৎ হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থের চাহিদা পূরণ করল ব্যাসদেব বেদ রচনা করে। কিন্তু ব্যাসদেব কখনো হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন না। হিন্দুদের মহাকাব্যের চাহিদা পূরণ করল বাল্মীকি রামায়ন রচনা করে। বাল্মীকি ছিলেন অস্পৃশ্য। এখন হিন্দুদের জন্যে সংবিধানের প্রয়োজন তাই আমার ডাক পড়েছ (৪২)।

ডঃ আম্বেদকর এম, ও, মাথাইকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেন "You Malayalis have done the greatest harm to this country.....You sent that man Shankara charya a dessicated expert at logic on a padayatra (walking tour) to the north to drive away Budhism from this country.' Ambed Kar added that Budha was the greatest soul India ever produced." অর্থাৎ তোমরা মালয়লীগন এ দেশের সবচাইতে বেশী ক্ষতি সাধন করেছ। তোমরা শংকরাচার্য নামক এক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন তার্কিককে উত্তর ভারতে পদ যাত্রায় পাঠিয়েছিলে বৌদ্ধদের এ দেশ হতে বিতাড়িত করার জন্যে। আম্বেদকর আরো বলেন এ যাবত ভারতে যারা জন্ম গ্রহন করেছেন বুদ্ধ তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (৪৩)।

---

(৪২) M.O. Mathai—Reminiscence of Nehru Age.

(৪৩) ঐ

www.pathagar.com

আধিপত্যবাদের সাথে বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং হিংস্রতা পাশাপাশি বিরাজমান থাকে। আর্যরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অনার্যদের উপর নজীর বিহীন হিংস্রতার পরিচয় দিয়ে ছিল। অনার্যদেরকে দস্যু অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করেছিল। হত্যা করাকে তারা ধর্মীয় কর্তব্য এবং নিতান্ত পুণ্যের কাজ বলে মনে করত। তাই ঢাকার ইতিহাস প্রনেতা যতীন্দ্র মোহন রায় তার গ্রন্থে লিখেছেন, "সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে যখন হিংসা বহুল বৈদিক ধর্ম উপেক্ষিত হইয়া শুষ্ক ও কঠোর ক্রিয়া কলাপে মাত্র পর্যবসিত হইতেছিল, সেই সময়ে সমগ্র মানব জাতির কল্যান কামনায় ভগবান গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তু নগরে আবির্ভূত হইয়া অভিনব কৌশলে জরা, মরণ সংকুল সংসারে শান্তিময় নিষ্কাম, নির্বান ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই ধর্মমত অহিংসা ধর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত; দয়া, সৌভ্রাতৃত্ব, একপ্রাণতা ইহার মূলমন্ত্র" (৪৪)।

যতীন্দ্র মোহন রায়ের মতে আর্য হিন্দুদের ধর্মের ভিত্তি ছিল হিংসা। কিন্তু বাংগালীরা হিংস্র বা বিদ্বেষ পরায়ন ছিল না। তারা ছিল পরমত সহিষ্ণু এবং অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। লামা তারা নার্থের গ্রন্থে উল্লেখিত গোপালের রাজা নির্বাচিত হওয়া এ কথাই প্রমান করে। তাই বাংগালীরা হিংসাশ্রয়ী বৈদিক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলনা। বরং বৈদিক ধর্মের প্রতি ছিল তারা বীত-শ্রদ্ধ। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষার সাথে বাংগালীর চারিত্রিক বৈশিষ্টের মিল ছিল। তাই বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে তারা দলে দলে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা বাংগালীর অন্তরে বিপুল সাড়া জাগায়।

বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব-কালে ভারত বর্ষে আগমন করে বৌদ্ধ ধর্মের তীর্থস্থানগুলো পরিদর্শন করেন। তার বিবরণ হতে জানা যায় যে স্বয়ং বুদ্ধদেব কুমিল্লা,

---

(৪৫) প্রফেসার আবদুল জবর্বার—বাংলাদেশের ইতিহাস।

www.pathagar.com

সমতট প্রভৃতি স্থানে আগমন করেছিলেন এবং সমতটের উপকণ্ঠে সাতদিন অতিবাহিত করে স্বীয় মহিমা প্রচার করেন (৪৫)।

পরিব্রাজক ইউনিয়ান চোয়াং ৬৩৮ খৃঃ সমতটের রাজধানীতে আগমন করেছিলেন। তিনি লিখেছেন "সমতট রাজ্যে সত্য ধর্ম (বৌদ্ধ ধর্ম) এবং অপধর্ম উভয় ধর্মের বিশ্বাসিগণই বাস করে। এখানে ন্যূনাধিক ত্রিশটি সংঘরাম বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল মঠে প্রায় ২০০০ শ্রমন অবস্থান করেন। সমতট রাজ্যে একশত দেব মন্দির আছে। প্রত্যেক দেব মন্দিরেই নানা সম্প্রদায়ের লোক উপাসনা করে।" যখন নানা সম্প্রদায়ের লোকের এ সমস্ত মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল তখন বুঝতে হবে এ সকল মন্দিরে ব্রাহ্মন্য-বাদীদের আধিপত্য ছিল না। অপর চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং-৬৭২ খৃষ্টাব্দে সমতটে আগমন করেন। তিনি এখানে সংঘরামে কমপক্ষে ৪০০০ শ্রমন দেখতে পান। মাত্র চৌত্রিশ বৎসরের ব্যবধানে সমতটে বৌদ্ধ শ্রমনের সংখ্যা দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপংকর বজ্রাসন বিহারের পূর্ব দিকস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। বৌদ্ধ ধর্মে তিনি অসাধারণ পান্ডিত্য লাভ করেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি সাধন কল্পে লামা কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি তিব্বত গমন করেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। তিববতে স্বয়ং বুদ্ধদেব হতে শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপংকরের মর্যাদা অধিক।

পালবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ধর্মপাল রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এর মত প্রকাণ্ড বিহার ভারতবর্ষের আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ ছাড়াও তিনি কুমিল্লার ময়নামতি বিহার এবং বরেন্দ্রভূমির সোমপুরে দু'টি বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

---

(৪৪) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

www.pathagar.com

স্বয়ং বুদ্ধ স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে ছিলেন নির্বিকার, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কুষান সম্রাট কনিষ্কের আমলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা হীন-যান এবং মহাযান নামক দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়।

মহাযান সম্প্রদায় প্রথমতঃ বুদ্ধের পদচিহ্নের এবং পরে তাঁর মূর্তি তৈরী করে আর্য মূর্তি উপসাকদের অনুকরণে পূজা-অর্চনার প্রচ-লন করে এবং তাঁকে ভগবানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। বুদ্ধের শিক্ষার সাথে অসামঞ্জস্য বিহীন এই প্রথার প্রচলন করা সত্বেও বৌদ্ধরা বুদ্ধের অহিংসনীতি থেকে কখনও বিচ্যুত হয়নি।

বর্মরাজ বংশ

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বেলাবতে প্রাপ্ত বেলাব লিপি এবং ভব-দেব ভট্টের কুল প্রশস্তি হতে এতদুদ্দেশে বর্ম বংশীয় রাজাগণ স্বল্পকালের জন্যে রাজত্ব করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। বর্ম বংশীয় রাজাগণের মধ্যে হরি বর্মই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। হরি বর্মার রাজত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের ভবভূমি বার্তা হতে জানা যায় যে, "যবনাগমন, রাজ্যনাশ, দাবানল ও দস্যুভয় প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া গংগাপতি প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ কর্ণাবতী পরিত্যাগ পূর্বক বংগে আগমন করে (৪৬)।

কর্ণাবতীর অবস্থান ছিল কান্যকুব্জের পশ্চিমাংশে। যতীন্দ্র মোহন রায় তাঁর ঢাকার ইতিহাসে (২য় খণ্ড) যা লিখেছেন তা হল "সুলতান মাহমুদ ১০১৯ খৃঃ কনৌজ জয়ে অগ্রসর হন। প্রাচীন কান্যকুব্জ পরে ব্যসরাজ নাগভট্ট এবং ভোজদেবের বংশধর রাজ্য পালদের আত্মর-ক্ষায় অসমর্থ হইয়া মাহমুদের শরণাগত হন। মাহমুদ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলে চন্দেলরাজ গণ্ডের পুত্র বিদ্যাধরের আদেশে কচ্ছপাঘাত বংশীয় অর্জুন রাজ্য পালের মস্তক ছেদন করিয়া-

---

(৪৬) যতীন্দ্রমোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

www.pathagar.com

ছিলেন। 'তারিখে বাইহাকী' নামক পারস্য ভাষায় রচিত ইতিহাসে উল্লেখিত হইয়াছে মাহমুদের পুত্র মাসুদ যখন গজনীর অধীশ্বর, তখন (১০৩৩ খৃঃ) লাহোরের শাসনকর্তা আহ্মদ নিয়ালতিগীন বারানসী নগর আক্রমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বসৈন্যে গংগা পার হইয়া বামতীর দিয়া চলিয়া গিয়া হঠাৎ বেনারস নামক শহরে উপনীত হইলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে কাপড়ের বাজার, সুগন্ধি দ্রব্যের বাজার এবং মনি মুক্তার বাজার লুন্ঠন করিয়া সৈন্যগণ খুব লাভবান হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সমুদয় রাষ্ট্র বিপ্লবের সময়েই গংগাপতি প্রাণ ও মান সম্মান রক্ষার জন্যে বঙ্গে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন"। একই গ্রন্থকার রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের বরাত দিয়ে আরো লিখেন যে, "গংগাপতি প্রমুখ ব্রাহ্মনগণ প্রথমে যশোহরে এসে সেখানে অবস্থান করেন। তথায় তারা নানা প্রকারের দোষ প্রত্যক্ষ করেন। জলে কুমীর, স্থানীয় অধিবাসীগণের চিত্ত বক্র এবং নদী সকল লবনাক্ত জলে পরিপুর্ণ। এ সকল দোষ দেখিয়া গংগাপতি সেখানে বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি পুর্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং কোটালী পাড়া স্থান নিকটবর্তী হইলেন। তাঁহার নিকট স্থানটি অতীব মনোরম বলিয়া মনে হইল এবং সেখানে বানর, শুকর, ভল্লুক, প্রভৃতি দুষ্ট বন্য জন্তুগণের বা দস্যু তস্করের ভয় নাই। কোটালী পাড়ার মধ্যে যে স্থান দিয়া ঘর্ঘরানদ প্রবাহিত এবং যে নদকে কেহ কেহ ব্রহ্মপুত্র বলিয়াও নির্দেশ দিয়া থাকেন তার তীর ভূমির পূর্বদিকে এক অত্যুন্নত ভুভাগে তখন তাহারা উৎসুক্যযুক্ত হইয়া নয় খানি পর্ণশালা নির্মাণ করেন। এখানকার অধিপতি রাজা হরি বর্ম গংগাপতি প্রমুখ ব্রাহ্মনগণকে কোটালীপাড়া এবং তার চতুস্পার্শে যে সকল ভুমি আছে তাহা নিষ্কর বৃত্তি স্বরুপ দান করিলেন।"

রাঘবেন্দ্র কবি শেখরের মতে ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে গংগাপতি প্রমুখ ব্রাহ্মনগণ এদেশে আগমন করেন পলাতক হিসেবে। ব্রাহ্মনগণ বা ক্ষত্রিয়গণ বিজয়ীর বেশে কখনও বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ স্বল্প সংখ্যায় এর পূর্বে এদেশে এসেছিল। ক্ষত্রিয়গ

www.pathagar.com

এসেছিল বেতনভোগী সৈনিক হিসেবে এবং বৈশ্যগণ এসেছিল ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে। বর্ম বংশ ইতিহাসে এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে ইতিহাসে সাক্ষ্য দেয় যে তাঁদের আমলে ব্রাহ্মনগণ আর্যাবর্ত হতে পালিয়ে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আগমন করে। বাংলাদেশে আর্যদের প্রথম আগমন ঘটেছিল পলাতক হিসেবে, বিজয়ীর বেশে নয়।

শূর বংশ

বাংলাদেশর ইতিহাসে সূর বংশীয় আদিশূর নামক এক নরপতির উল্লেখ রয়েছে। আদি শূরের অস্তিত্ব জনশ্রুতির উপর নির্ভরশীল। শূর বংশের অস্তিত্বের খবর মিলে বংগদেশীয় কুশলাস্ত্র গ্রন্থ থেকে। কুলশাস্ত্র গুলোর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সংদহ রয়েছে। বিভিন্ন কুলশাস্ত্র গুলোর বিষয়বস্ত পরস্পর বিরোধী। কুলশাস্ত্রের সমর্থনে কান শিলা লিপি বা তাম্র শাসন আবিস্কৃত হয়নি বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রনেতা শ্রী যোগেন্দ নাথ গুপ্তের মতে আদিশুর সেন বংশোদ্ভব। তিনি গৌড় রাজ্য থেকে বৌদ্ধ দিগকে বিতাড়িত করেন এবং বিক্রমপুরে পঞ্চ ব্রাহ্মন আনয়ন করেন (৪৭)। প্রফেসর আবদুল জব্বার সাহেবের মতে তিনি বর্তমানের পশ্চিম বংগের কোনও এক স্থান রাজত্ব করতেন (৪৮)।

ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ, গৌড় রাজমালার লেখক রামা প্রসাদ চন্দ্র ও রাখাল দাস ব্যানার্জীর মতে আদিশূরের ঐতিহাসিক ভিত্তি অতি ক্ষীণ। কারণ পরস্পর বিরোধী কুলশাস্ত্র এবং প্রচলিত কিংবদন্তী ব্যতীত তাঁর অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও নিদর্শন আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি। কিন্তু প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্র নাথ

---

(৪৭) যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত—বিক্রম পুরের ইতিহাস।

(৪৮) প্রফেসার আবদুল জব্বার—বাংলাদেশের ইতিহাস।

www.pathagar.com

বসু বিশ্বকোষ এবং বংগের জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন জয়ন্ত ও আদিশূর অভিন্ন ব্যক্তি এবং ইনিই রাজতরংগিনীতে উল্লেখিত গৌড়াধিপতি জয়ন্ত।

কাশ্মিরী ঐতিহাসিক কহলন প্রনীত রাজতরংগিনীতে উল্লেখ আছে যে জজ্জা নামক এক ব্যক্তি জয়াপীড়ের রাজত্ব হস্তগত করলে তিনি অনুযাত্রীগণ সহ গংগাতীর উপনীত হন এবং একাকী ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক পুন্ড্রবর্দ্ধন নগরে আগমন করেন। জয়াপীড় নগরে প্রবেশ করে দেখেন যে কার্তিকেয় মন্দিরে আরতি হচ্ছে। সে সময় দেব নর্তকী কমলা মন্দির প্রাঙ্গনে নৃত্য করছিল। জয়াপীড় কমলার সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হন। কমলাও এ অপরিচিত যুবকের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে তাঁকে নিয়ে স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্তন করে। এ সময়ে নগরে সিংহের উপদ্রবে জনগন আতংকগ্রস্ত ছিল। নগর বাসীরা এ সিংহকে বিনাশ করতে সক্ষম ছিল না। জয়াপীড় কমলার মুখে নগর বাসীদের বিপদের কথা শুনে সিংহের উদ্দেশ্যে গমন করেন। জয়াপীড়ের হস্তে সিংহ বিনষ্ট হয়। জয়াপীড়ের অজ্ঞাতসারে তার স্বর্ণ নির্মিত অংগদ সিংহমুখে সংযুক্ত হয়ে থাকে। পর দিন নগরবাসীগণের মুখে সিংহের নিধন বার্তা শুনে পৌনড্রাধিপতি জয়ন্ত সপার্ষদ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন ও সিংহের মুখে জয়াপীড়ের নামাংকিত কেয়ূর দেখতে পান। তিনি ইতিপূর্বে লোক মুখে জয়াপীড়ের পূর্ব দেশাভিযান প্রসংগ শুনেছিলেন। তিনি জয়াপীড়কে স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন পূর্বক আপন কন্যা কল্যানী দেবীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেন। জয়াপীড় জয়ন্তের আলয়ে কিছুকাল অবস্থান করে পাঁচ জন নৃপতিকে পরাজিত করে শ্বশুরকে রাজচক্রবর্ত্তী করেন। কহলনের রাজতরংগিনীর ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী নয়-আজগুবি, গাঁজাখুরি গল্পে ভরপুর। যতীন্দ্র মোহন রায় বলেন "আদিশুর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রনালীতে আলোচনা করিবার উপযুক্ত মালমসলা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই" (৪৯)।

(৪৯) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

www.pathagar.com

আদিশূরকে নিয়ে আলোচনার প্রবৃত্ত হবার কারণ সেন রাজাদের সাথে আদিশূরের সম্পর্ক রয়েছে বলে কেউ কেউ বলে থাকেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে যোগেন্দ্র গুপ্ত আদিশূরকে সরাসরি সেন বংশোদ্ভূত বলেছেন। জনশ্রুতি মতে সেন রাজা বল্লাল সেন আদিশূরের কন্যা লক্ষ্মী কন্যার গর্ভজাত। আদিশূর বলে কোন নৃপতির অস্তিত্ব যদি প্রকৃতপক্ষে থেকে থাকে তবে বাংলাদেশের ইতিহাস প্রনেতা আবদুল জব্বার সাহেবের অনুমান সমর্থন করে বলা যেতে পারে যে তিনি পশ্চিম বংগের কোন এলাকার অধিপতি ছিলেন। তবে আদিশূরের অস্তিত্ব এখনও সংশয় পূর্ণ।

সেন যুগ

বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা বর্ণ হিন্দুদের আধিপত্য তুংগে পৌঁছে সেন যুগে। ঐতিহাসিক যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত তাঁর "বিক্রম পুরের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে সেন রাজ বংশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এ অধ্যায়ের শিরোনামে লিখেছেন "হিন্দু শাসন কাল।"

সেন বংশীয় রাজাগন যে মূলতঃ বাংলার অধিবাসী ছিলেন না সে বিষয়ে ঐতিহাসিকরা সকলে একমত। তাঁরা ছিলেন বহিরাগত। সেন নরপতিদের পূর্বপুরুষ দাক্ষিনাত্য থেকে বংগ দেশে আগমন করেন। তাঁরা ব্রাহ্মন বা ক্ষত্রিয় ছিলেন না। ঐতিহাসিকগন সকলেই যে বিষয়ে ঐক্যমত পোষন করেন তা হল সেনগন বৈদ্য জাতীয় ছিলেন।

সেন রাজগনের তাম্রশাসন ও শিলা লিপিতে সর্ব প্রথম সামন্ত সেনের নাম উল্লেখিত হয়েছে। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন। হেমন্ত সেনের স্ত্রীর নাম যশোদেবী। হেমন্ত সেন ও যশোদেবীর পুত্রের নাম বিজয় সেন। ঢাকার ইতিহাস প্রনেতা যতীন্দ্র মোহন

www.pathagar.com

রায় বলেন—"সেন বংশের প্রকৃত প্রথম রাজা ছিলেন বিজয় সেন। হিন্দু আইন দায়ভাগকার উদ্ভাবক জীমূতবাহন বিজয় সেনের অমাত্য ছিলেন বলে এডুমিশ্রের কারিকায় উল্লেখ রয়েছে। এডুমিশ্রের কারিকার মতে বিজয় সেন বিশ্বক সেন নামে ও অভিহিত হতেন (৫০)। বিশ্বক সেন রাঢ়মন্ডলে অর্থাৎ পশ্চিম বংগে অবস্থান করে একদিকে পাল রাজ অপর দিকে বর্ম বংশীয় নৃপতিদের কবল থেকে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় যত্নবান ছিলেন। সে সময়ে জীমূত বাহন তাঁর অমাত্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক যোগেন্দ্র নাথ গুপ্তের মতে আদিশূরের কন্যার নাম ছিল লক্ষ্মীকন্যা (৫১)। এ লক্ষ্মী কন্যার গর্ভেই বল্লাল সেনের জন্ম। যতীন্দ্র মোহন রায়ও বলেন যে বিজয় সেনের পুত্রের নাম বল্লাল সেন। তবে বিজয় সেন বল্লাল সেনের ঔরসজাত পুত্র নহেন—ক্ষেত্রজপুত্র। যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত রাজেন্দ্র বাবু প্রদত্ত বংশ তালিকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন। তিনি রামজয় কৃত বৈদ্যকুল পঞ্জী হতে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে যে—

"কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্রের নাহি ব্যবহার
কিন্তু বৈদ্য বংশে এক পাই সমাচার
আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেন বংশ তাজা
বিশ্বক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা (৫২)।

হিন্দু ধর্মে স্ত্রীকে ক্ষেত্রের নাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। যে কোন লোক ক্ষেত্রে শষ্য উৎপন্ন করতে পারে। কিন্তু উৎপাদনকারী শষ্যের মালিক হয়না। শষ্যের মালিক সে যে ক্ষেত্রের মালিক। সন্তান অপর লোকের ঔরসে জন্ম গ্রহন করলে যার স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের

---

(৫০) যতীন্দ্র মোহন রায়--ঢাকার ইতিহাস।
(৫১) যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের ইতিহাস।
(৫২) ঐ ঐ

www.pathagar.com

জন্ম হয়েছে সেই সন্তানের পিতা বলে পরিচয় লাভ করে। এ রকম সন্তানকে ক্ষেত্রজ সন্তান বলা হয়ে থাকে। যতীন্দ্র মোহন রায় তাঁর ঢাকার ইতিহাসে বলেন "বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে বিবিধ অলৌকিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ বলেন বল্লাল বিশ্বক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। কেহ বলেন তিনি ব্রহ্ম পুত্র নদের পুত্র। কথিত আছে রাজা বিজয় সেন বল্লাল জননীকে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নির্বাসিত করেন। বল্লালের মাতা বিজয়ের জ্যেষ্ঠ্যা মহিষী ছিলেন, কিন্তু সপত্নীর সহিত তাঁর বণিতনা, তজ্জন্যই তিনি নির্বাসিত হন। ব্রহ্মপুত্র নদের তটে বল্লালের জন্ম হয়, তজ্জন্যই তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অরণ্য প্রদেশে জন্ম হওয়াতে রাজকুমারের বল্লাল নাম হয়" (৫৩)।

সপত্নীর সাথে বনিবনাত না হলে বিশ্বক সেন বল্লাল জননীর বসবাসের জন্যে পৃথক ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারতেন। 'সপত্নীর সাথে বনিবনাতের অভাবে তাকে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে গভীর বনাঞ্চলে বনবাস দেয়ার কথা অবিশ্বাস্য। বনবাসে পাঠানো হয়ে থাকে অপরাধের শাস্তি স্বরুপ। বল্লাল জননী এমন কি অপরাধ করেছিলেন যার জন্যে তাঁকে বনবাসে যেতে হয়েছিল। বল্লাল জননী ভ্রষ্টা চরিত্রের ছিলেন বলেও জনশ্রুতি আছে। কেউ কেউ বলেন তাঁর চরিত্রহীনতা এবং অবৈধভাবে গর্ভধারণের জন্যে তাঁকে বনাঞ্চলে নির্বাসিত করা হয়। বনবাসে থাকাকালীন সময়ে তিনি পূজার্চনার জন্যে একটি মন্দির নির্মান করেন যার নাম ঢাকেশ্বরীর মন্দির। ঢাকেশ্বরীর মন্দিরের নামানুসারে ঢাকা শহরের নাম হয়েছে বলে অনেকের ধারনা।

বিশ্বকসেনের ক্ষেত্রজপুত্র বল্লাল সেন কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহন করেন তা নিয়ে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। বল্লাল রচিত অদ্ভুতসাগর হতে অনুমিত হয় যে বল্লাল সেন ১১৬০ খৃঃ সিংহাসনে

(৫৩) যতীন্দ মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

www.pathagar.com

আরোহন করেছিলেন। বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রনেতা যোগেন্দ্র নাথ গুপ্তের মতে তিনি ১০৬৬খৃঃ সিংহাসনে আরোহন এবং ১১০৬ খৃঃ পরলোক গমন করেছিলেন (৫৪)। আবার বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার নিকটে সীতাহাটি নামক স্থানে প্রাপ্ত শিলা লিপি হতে মনে হয় যে বল্লাল সেন সম্ভবতঃ ১১১৮ বাং ১১১৯ খৃঃ পরলোক গমন করেছিলেন। বল্লাল সেনের জন্ম, সিংহাসনারোহন এবং মৃত্যু সম্পর্কে পন্ডিতগন একমত হতে পারেননি। মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে গাড়োয়াল প্রদেশান্তর্গত যোশী মঠ থেকে আগত সিংহগিরি নামক জনৈক শৈব সন্ন্যাসীর নিকট শৈব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তিনি ব্রাহ্মন প্রতিপালক হয়ে ছিলেন (৫৫)।

তাই সেন নৃপতিগন নিজেরা ব্রাহ্মন না হয়ে ও ব্রাহ্মন ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে বল্লাল সেনের রাজ প্রাসাদের ছাদে একবার শকুন বসেছিল। এরূপ ঘটনা নাকি অমংগলের পূর্বাভাস। বল্লাল সেন এ অমংগল হতে উদ্ধার পাবার জন্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্যোগ নেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মনের প্রয়োজন। বংগদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মনের খোঁজ পাওয়া গেলনা, কারন তখন বাংলাদেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মন বাস করত তাদেরকে সাতসতী ব্রাহ্মন বলা হতো। বেদ সম্পর্কে এদের কোন জ্ঞান ছিল না। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বর্মরাজ হরিবর্মের আমলে গংগাপতি প্রমুখ নয়জন ব্রাহ্মন গোপালগঞ্জ জেলাধীন কোটালী পাড়াস্থে নদীর তীরে নয়খানি পর্ণকুটির নির্মান করেন। এদের পূর্বে বংগদেশে কোন ব্রাহ্মন আগমন করেনি। এ নয়জন ব্রাহ্মনের বংশধরগণই সাতসতি ব্রাহ্মন নামে পরিচিত হয়েছিল নাকি ইতি মধ্যে আরো ব্রাহ্মন আগমন করেছিল তা সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়। তাই যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য তিনি কনোজ থেকে পাঁচ জন ব্রাহ্মন আনয়ন করেন। এদের নাম হল (১) ভট্টনারায়ন—শান্ডিল্য গোত্রের প্রধান (২) হর্ষ—ভরদ্বাজ গোত্রের

(৫৪) যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের ইতিহাস।

(৫৫) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

www.pathagar.com

প্রধান (৩) ছান্দর—শার্বর্ন গোত্রের প্রধান (৪) বেদ গর্ভা—বাৎস্য গোত্রের প্রধান ও (৫) দক্ষ—কাশ্যপ গোত্রের প্রধান।

ব্রাহ্মনগন সস্ত্রীক এদেশে এসেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে ভৃত্যও সংগে করে এনেছিলেন (১)। ভট্ট নারায়নের ভৃত্যের নাম ছিল মকরন্দ ঘোষ (২) হর্ষের ভৃত্যের নাম ছিল কালী পদ মিত্র (৩) ছান্দরের ভৃত্যের নাম ছিল দশরথী গুহ (৪) বেদগর্ভার ভৃত্যের নাম ছিল দাশরথী বোস এবং (৫) দক্ষের ভৃত্যের নাম ছিল পুরুষোত্তম দত্ত।

এদেশের লোকের সংস্পর্শে এসে যাতে ব্রাহ্মনগণ এবং তাঁদের কায়স্থ ভৃত্যগন শ্রেষ্ঠত্ব না হারান তজ্জন্য বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। কায়স্থগন ব্রহ্মনগনের ভৃত্য হিসাবে এদেশে আগমন করেছিল। তাদের কৌলীন্য প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত ছিল যে তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে তারা ব্রাহ্মনদের ভৃত্য। দক্ষের সাথে আগমন কারী নিজকে ভৃত্য বলে পরিচয় দিতে অস্বীকার করে। সে বলে "দত্ত কারো ভৃত্য নয় সংগে শুধু এসেছে" (৫৬)। ফলে দত্তগনকে কৌলীন্য দেয়া হলোনা। এ সমস্ত ব্রাহ্মনদেরকে রাঢ় অঞ্চলে পুনর্বাসিত করা হয়। তাদের ৫৬ জন বংশধরদেরকে ভরনপোষনের জন্যে ৫৬ খানি গ্রাম প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ৩৪ জন ছিলেন মুখ্য কুলীন এবং ২২ জন ছিলেন গৌণ কুলীন। এদেরকে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মন বলা হয়।

ভট্টনারায়নের এদেশে মৃত্যু হলে কনৌজে অবস্থানরত তাঁর পুত্রগণ পিতার শ্রাদ্ধের আয়োজন করেন। কিন্তু পিতা বংগদেশে আগমন করাতে তাঁরা জাতি ভ্রষ্ট হয়েছেন এ অজুহাতে নিমন্ত্রিতেরা নিমন্ত্রন গ্রহনে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ভট্টনারায়নের পুত্রগণ সমাজচ্যুত হয়ে এদেশে আগমন করলে রাজা তাঁদেরকে রাঢ় দেশে বসবাসের অনুমতি দেন। কিন্তু তাঁরা জানান যে সেখানে তাঁদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগন বসবাস করেছেন। তাই তাদের সাথে বনিবনাত হবে না। তাঁরা রাজার নিকট বরেন্দ্র ভূমিতে বসবাসের জন্য

(৫৬) আবদুল জলিল খাঁ—সুন্দরবনের ইতিহাস।

www.pathagar.com

অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাজা তাদের আরজী মঞ্জুর করলে তারা বারীন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মন নামে পরিচিতি লাভ করেন। এ ভাবে বংগদেশে রাঢ়ী এবং বারীন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মনের উদ্ভব ঘটে।

যতীন্দ্র মোহন রায় বলেন "যে প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়কে বৌদ্ধধর্মানুরাগী এবং পাল রাজ বংশের পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া বিজয় সেন ব্রাহ্মন, বৈদ্য এবং কায়স্থ জাতির মধ্যে আভিজাত্য সৃষ্টি করিবার সংকল্প গ্রহন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র বল্লাল সেনের সময়ে আদিশূর ও পঞ্চ ব্রাহ্মনাদি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া নূতন আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (৫৭)।

বল্লাল সেনের জন্ম বৃত্তান্ত যেমন কলংকজনক তাঁর চরিত্র ছিল তার চাইতে আরো বেশী কলংকিত। বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক হলেও তিনি নিজে এক ডোম কন্যাকে অপহরন করে সম্ভোগ করেন। এ বিষয়ে যদুনন্দের ঢাকুরে যে বিবরণ দেয়া হয়েছে পাঠক বর্গের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্যে তার উল্লেখ করা গেল ঃ

"একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ হইল আচম্বিতে।।
ত্যাজিয়া বিপনী রাজা গেল লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আলয়ে।।
সেই রাত্রে তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক ডোম কন্যা প্রাতঃ কালে আসি।।
অতি শুভ্র দধি বাঁশের বেতিতে লৈলা।
পরম যতন করি রাজভোগ দিলা।।
তাহাতে সন্তুষ্ট রাজা হইলা বহুতর।
দিলা রাজা ধন রত্ন বস্ত্র-অলংকার।।
বিবাহ করিব বলি লইয়া আইল্যা ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে।।

(৫৭) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

www.pathagar.com

যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দা বানী।
সর্বস্ব হরিয়া তারে তাড়ান তখনি ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনি করায় বিচার।
শাস্ত্র মতে বিচার করি কি দোষ আমার" (৫৮) ॥

উল্লেখিত কবিতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বল্লাল সেন ব্রাহ্মনদেরকে কৌলীন্য দান করেছিলেন। বিনিময়ে ব্রাহ্মনগণ তাকে এহেন অপকর্মে সমর্থন যুগিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মনগণ সমর্থন করলেও রাজপুত্র লক্ষন সেন পিতার এহেন দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। উক্ত কবিতায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"এত শুনি রাজপুত্র মনে দুঃখ পেয়ে।
চলিল পিতার কাছে ক্রোধান্বিত হয়ে ॥
জলের দৃষ্টান্তে কহেন রাজাকে বচন।
পরম পবিত্র হয়ে নীচেতে গমন ॥"

রাজপুত্র পিতার উপর রুষ্ট হয়ে নদীয়াতে গিয়ে পৃথক ভাবে বসবাস করতে থাকেন। একদা চাঁদনী রাতে পুত্র বধুর বিরহ গাথা শুনে বল্লাল সেনের মন বিগলিত হয়। তিনি নদীয়া হতে লক্ষণ সেনকে আনার জন্যে জেলে কৈবর্তগনকে পাঠান। তারা ছিপ নৌকা যোগে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে নদীয়া থেকে তাকে রামপালে এনে উপস্থিত করে। এতে খুশী হয়ে বল্লাল সেন জেলে কৈবর্তদেরকে জলচল করেন অর্থাৎ তাদের ছোঁয়া পানি বর্ণ হিন্দুরা গ্রহন করলে তারা জাতিচ্যুত হবেনা। কিন্তু জেলে কৈবর্তগণ অস্পৃশ্য থেকে যায়।

পিতার অনুরোধে সাময়িকভাবে রামপাল আগমন করলেও লক্ষণসেন অল্প দিন পরেই নদীয়াতে ফিরে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং বখ্‌তিয়ার খিলজীর আক্রমণের মুখে পলায়ন করে পুনরায় রামপালে এসে বসবাস করতে থাকেন।

---

(৫৮) যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের ইতিহাস।

www.pathagar.com

বল্লাল সেন তদীয় নব প্রনয়িনী ডোম কন্যার হাতে অন্ন গ্রহন করার নিমিত্ত সমাজের সমুদয় ব্যক্তিকে বাধ্য করতে চেষ্টা করলে বৈদ্য এবং কায়স্থগণের মধ্যে ঘোরতর বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। একদা বল্লাল সেন বৈদ্যগণকে নিমন্ত্রণ করেন এবং এ রমনী কর্তৃক পাক করা অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করেন। তাঁর পুত্র লক্ষন সেনের উপদেশে বৈদ্যগণ স্ব-স্ব উপবীত পরিত্যাগ পূর্বক নিজেদেরকে শূদ্র বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। এ ভাবে বৈদ্যকুল বল্লালী এবং লক্ষ্মনী এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বল্লাল সেনের নির্যাতনে প্রজাকুল অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। অনেকেই মান সম্ভ্রম রক্ষার্থে বিভিন্ন রাজ্যে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। তখন বাংলার লোক মুখে যে গাঁথাটি প্রচলিত ছিল তা হলো —

"উৎপাত করিয়া রাজা না থুইলা দেশ।
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেল অবশেষ" (৫৯)॥

বল্লাল সেনের পর তদীয় পুত্র লক্ষন সেন পিতৃ সিংহাসনে আরোহন করেন। লক্ষ্মন সেন সিংহাসন লাভের পর রাম পালে পুনরাগমন করেন নি। তিনি নদীয়া বা নবদ্বীপ হতে পৈতৃক রাজ্য শাসন করতে থাকেন। শ্রীমতি বসুদেবী ছিলেন লক্ষ্মন সেনের মহিষী। হলায়ুধ মিশ্রের সেক শুভোদয়ায় লিখিত আছে যে রাজা শেষ বয়সে বল্লভানাম্নী এক নারীকে বিবাহ করছিলেন। বল্লভা অত্যন্ত প্রগলভা এবং স্বেচ্ছাচারিনী ছিলেন। এমন কি তিনি রাজ সভায় উপস্থিত হয়ে রাজ কার্যের ব্যাঘাত জন্মাতেন। বল্লভার ভ্রাতা কুমার দত্ত লম্পট ও দুঃশ্চরিত্র ছিলেন। রাজ্য মধ্যে তাঁর প্রবল প্রতাপ ছিল। তাঁর নামে কোন অভিযোগ উপস্থিত হলে বল্লভা ভ্রাতৃ পক্ষাবলম্বন করতেন। একদা মধুকর নামক বনিকের পত্নী মাধবীর সতীত্ব নাশের চেষ্টা ও রত্নালংকার হরণের অভিযোগে কুমার দত্ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত হলে বল্লভা ভ্রাতার পক্ষাবলম্বন করেন এবং বিচারে

(৫৯) যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত...বিক্রমপুরের ইতিহাস।

www.pathagar.com

বাধা প্রদান করেন। দুর্মতি কুমার দত্তের শাস্তি হওয়া দূরে থাকুক মাধবীর রত্নালংকার বলপূর্বক কেড়ে নেয়া হয় এবং রাজ সভায় তাকে অপমানিত করা হয়।

এক সময়ে গংগাস্নান উপলক্ষে গংগাতীরে বহু লোকের সমাগম হয়েছিল। কবিজয়দেব প্রমুখ পন্ডিত সস্ত্রীক গংগাস্নানে আগমন করেছিলেন। রাজ মহিষী বল্লভা তৎকালে জনৈক নগর বাসিনীর প্রকোষ্ঠ শোভিত সুন্দর কংকন বল পূর্বক গ্রহন করেন এবং উহা প্রত্যর্পন করতে অস্বীকার করেন। রাজ সভার প্রধানগন রাজ মহিষীর এ রকম ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে উঠলেন। নগরবাসিনী রানীকে "কাঠকুড়ানীর বেটি বলে গালি দিল।" ঢাকার ইতিহাস প্রনেতা যতীন্দ্র মোহন রায় বলেন "সেক শুভোদয়ার এ সমস্ত উক্তি কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কিন্তু অধঃ পতনের কালে রাজপরিবারে এবং রাজতন্ত্রে এই রূপ দূর্নীতি প্রবেশ করিয়া থাকে। সেক শুভোদয়ার উক্তি সত্য হইলে স্ত্রীও শ্যালকের প্রতি পক্ষপাতিত্বই লক্ষন সেনের চরিত্রের কলংক বলিয়া অনুমিত হয়" (৬০)।

সেক শুভোদয়ার উক্তি সত্য না হবার কোন কারন নেই। সেক শুভোদয়ার প্রনেতা হলায়ুধ মিশ্র লক্ষনসেনের সমসাময়িক। হলায়ুধ মিশ্র তৎপ্রনীত ব্রাহ্মন, সর্বস্ব গ্রন্থে লিখেছেন যে লক্ষন সেন বাল্যে তাঁকে রাজপন্ডিতের পদ এবং যৌবনারিম্ভে মন্ত্রী পদ এবং প্রৌঢ় অবস্থায় ধর্মাধিকরনের পদ প্রদান করেছিলেন। এহেন পৃষ্ঠপোষকের নামে তিনি মিথ্যা কলংক আরোপ করবেন, কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক এ রকম ধারনা পোষন করতে পারেনা। সভা কবি হরি মিশ্র সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন লক্ষ্মনসেনের সময়ে বংগের রাজ-ধানীর রাজপথ সায়ংকালে বারবিলাসিনীগনের মঞ্জুরী নিক্কনে চমকিত হইত।" ধোয়ী কবি বিরচিত পবন দুতম গ্রন্থে রাজধানীর তৎকালীন অবস্থা বিশদরুপে বর্ণিত হয়েছে। কবি বলেছেন "রাজপথ বারাংগনা গনের মঞ্জুরী নিক্কনে চমকিত এবং নিশীথে স্বেচ্ছা বিহারিনী অভিসারিকা-গনের অব্যাহত গতিতে মুখরিত। প্রেম লিপ্সু কামিনীগনের প্রেমালাপে

(৬০) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

www.pathagar.com

সমস্ত বিভাবরী উদভ্রান্ত।" সেন আমলে বাংলার জনগণের দুর্ভোগের করুণ কাহিনী অংকিত রয়েছে। ধোয়ীর "পবন দূতম" গোবর্দ্ধনাচার্য্যের আর্য সপ্তসতী এবং কবিকুল বরেন্য জয়দেবের গীত গোবিন্দ নামক কাব্য গ্রন্থ সমূহে (৬১)।

বাংলার জনগণ যখন হিন্দুসেন রাজাদের অত্যাচার অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছিল তখন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি মাত্র ১৭ জন ঘোড়সওয়ার নিয়ে নদীয়ার রাজ প্রাসাদ আক্রমণ করেন। জনগণ এমনকি তাঁর বেতনভূক সেনাদল পর্যন্ত লক্ষ্মণ সেনের উৎখাতের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তাই বখতিয়ার খিল্‌জিকে ত্রাণকর্তা মনে করে তারা কোন প্রকারের বাধা দেয়নি। বখতিয়ার খিল্‌জী সহজেই রাজ প্রাসাদ দখল করে নেন! অশিতিপর লক্ষ্মণসেন তখন খেতে বসেছিলেন। তিনি সামনের খাবার ফেলে রেখে খালি পায়ে পেছনের দরজা দিয়ে নৌকায় চড়ে বিক্রমপুরে পলায়ন করেন।

উত্তর ও পশ্চিম বংগে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ এর পরেও বেশ কিছুকাল রামপালে রাজধানী স্থাপন করে বিক্রমপুর শাসন করতে থাকেন।

লক্ষ্মণসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসন ত্যাগ করে হিমালয় প্রদেশে গমন করেন। অতঃপর লক্ষ্মণ সেনের অপর পুত্র কেশব সেন রামপালের সিংহাসনে বসেন। কেশব সেনের পর তদীয় ভ্রাতা বিশ্বরূপসেন পূর্ব বাংলা শাসন করেন। বিশ্বরূপ সেনের পর কয়েক বৎসর পর্যন্ত সেন বংশীয় রাজাগণের মধ্যে যাহারা পূর্ব বংগের শাসন দণ্ড ধারণ করেন তাঁদের মধ্যে কেউ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তবে তাঁদের পরে দ্বিতীয় বল্লাল সেনের নাম যে কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে তা হলো তাঁর আমলে বাবা আদম নামে একজন কামেল দরবেশ রামপালের নিকটবর্তী আবদুল্লাপুর গ্রামে ছাউনি ফেলেন। কালক্রমে দ্বিতীয় বল্লাল সেনের সাথে বাবা আদম এবং তাঁর সঙ্গীদের যুদ্ধ

(৬১) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

www.pathagar.com

বাঁধে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নামাজের সময় উপস্থিত হলে বাবা আদম যুদ্ধ বন্ধ করে নামাজে রত হন। তখন বল্লাল সেন সুযোগ বুঝে বাবা আদমকে স্বীয় তলোয়ার দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করতে থাকেন। কিন্তু তিনি অক্ষত অবস্থায় নামাজ আদায় করে চলেন। নামাজান্তে বাবা আদম দ্বিতীয় বল্লাল সেনকে বলেন যে তাঁর পাশে রাখা নিজ তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন তলোয়ারের আঘাতে তাঁর কোন ক্ষতি হবেনা। তখন বল্লাল সেন ক্ষিপ্রগতিতে বাবা আদমের তলোয়ার তুলে নিয়ে তা দিয়ে তাঁকে বার বার আঘাত করে শহীদ করেন।

বাবা আদম শাহাদত বরন করেন কিন্তু বল্লাল সেনের সমস্ত শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। তিনি তাঁর রক্তসিক্ত দেহ ও বস্ত্র ধোয়ার জন্যে যখন নিকটবর্তী জলাশয়ে গোসল করছিলেন তখন তাঁর শিথিল বস্ত্রের ভিতর হতে একটি কবুতর বের হয়ে উড়ে যায়। বল্লাল সেন পূর্ব মহিলাদেরকে বলে এসে ছিলেন যে যদি কবুতরটি গৃহে ফিরে আসে তবে পরাজয় ও মৃত্যু বুঝতে হবে। কবুতরটিকে একা প্রত্যাবর্তন করতে দেখে রাজ পরিবারের রমনীগণ মান সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রান বিসর্জন করেন।

বল্লাল সেন প্রাসাদে ফিরে দেখতে পান যে পুরমহিলারা সকলে অগ্নিকুন্ডে আত্মাহুতি দিয়েছেন। এরূপ অবস্থায় জীবন ধারন করা বিষম ভয়াবহ বোধে তিনি ও তাদের মত আগুনে আত্মবিসর্জন করলেন (৬২)। গোপাল ভট্ট রচিত বল্লাল চরিত্রেও এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে (৬৩)।

---

(৬২) আওলাদ হোসেন—নোটস অন্ এন্টিকুইটিস অব ঢাকা।

(৬৩) যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের ইতিহাস।

www.pathagar.com

মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা।

মুসলমানদের দ্বারা বাংলাদেশ বিজিত হওয়ার সময় এদেশ বর্ণ-হিন্দু সেনরাজাদের দ্বারা শাসিত হচ্ছিল। অধিবাসীদের মধ্যে বর্ণহিন্দু, বৌদ্ধ ও নিম্নবর্নের তফসিলী হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দু আমলের শাসকদের মধ্যে এই সেন বংশই ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেন আমলের পূর্বে ব্যবসা বানিজ্য বা চাকুরী উপলক্ষে কিছু সংখ্যক ক্ষত্রিয়ও বৈশ্য এখানে এসেছিল বটে তবে তারা এদেশের অধিবাসীদের উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

সেকালের রাজা নির্বাচন হতে প্রমান মিলে যে বাংলার জনগন প্রভুত্বকামী ছিলনা। তারা ছিল সমঅধিকারে বিশ্বাসী। উচ্চ নীচ ভেদাভেদ সম্বন্ধে তাদের মধ্যে সচেতনতা ছিলনা। সেন বংশীয় রাজাগন ছিল বহিরাগত। তাদের আদি পুরুষ সামন্ত সেন চালুক্য রাজা বিক্রমমাদিত্যের সমর যাত্রার সময় এদেশে আসেন। দেশে ফেরত না গিয়ে তিনি এদেশেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি ক্ষত্রিয় গোত্রের ছিলেন না। তিনি ছিলেন বৈদ্য বংশীয়। তাই নিশ্চিত রূপে বলা যায়না যে সামন্ত সেন সৈনিক হিসাবে এসেছিলেন, নাকি সমর যাত্রীদের সহগামী হলেও অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

বিদেশী সেন রাজাদের শাসন বাংগালীদের মনঃপুত ছিলনা। সেন রাজাগনের কার্যকলাপের জন্যে তাঁরা এদেশবাসীর নিকট ঘৃনার পাত্র ছিলেন। এদেশের অধিকাংশ অধিবাসী তখনও বৌদ্ধ ধর্মালম্বী ছিল। তারা তাদের স্বদেশবাসী পাল রাজাগণের যশোগৌরবের কথা তখনও ভুলতে পারেনি। অতীতের গৌরবমন্ডিত স্মৃতি তখনও তাদের মনে জাগরুক ছিল। পাল রাজাদের প্রতি এদেশবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখে বল্লাল সেন কনৌজ থেকে ব্রাহ্মন এনে হিন্দু সমাজে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন এবং সমাজে ব্রাহ্মনদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে বর্ণবাদ প্রথা চালু করা সেন রাজাদের একটি অন্যতম অবদান।

www.pathagar.com

বাংলার সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এদেশের সমাজ জীবনে ক্ষত্রিয়দের কোন অস্তিত্ব নেই। বৈশ্যগনের ভূমিকাও অনুল্লেখযোগ্য। এখানে হিন্দু সমাজের স্তর বিন্যাস হল ব্রাহ্মন, কায়স্থ, বৈদ্য এবং শূদ্র। ব্রাহ্মন, কায়স্থ এবং বৈদ্যগন বর্ণ হিন্দু সমাজভূক্ত। আর ভারতের বৈদিক শ্রেণী বিন্যাস হল ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। সেখানে ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ বর্নহিন্দু সম্প্রদায় ভূক্ত বলে বিবেচিত। এখানে শূদ্র সম্প্রদায় বলে হিন্দু তফশীলি সম্প্রদায়ে রয়েছে; কিন্তু এখানে আর্যাবত তথা ভারতে যেমন অচ্ছ্যুৎ সম্প্রদায় রয়েছে তেমন কোন সম্প্রদায় নেই। আর্য্যাবর্তে যে সমস্ত অনার্য বিজয়ী আর্যদের প্রভূত্ব স্বীকার করে তাদের পদ সেবায় রাজী হল তারা শূদ্রত্ব পেল। আর যারা আর্যদের প্রভূত্ব অস্বীকার করল এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চাইল তাদেরকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে বন জংগলে আশ্রয় নিতে হল এবং তারা অচ্ছ্যুৎ নামে পরিচিত হল। বাংলাদেশে ক্ষত্রিয় এবং অচ্ছ্যুতদের অনুপস্থিতির কারন হল যে আর্যগন এখানে বিজয়ী হিসাবে আসেনি। বৈদ্যবংশীয় সেন রাজাগন ছিলেন বর্ণ হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। আর এদেশের অধিবাসীদের অনুরাগ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি। সেন রাজাগণ হিন্দু ধর্মকে বৌদ্ধ ধর্মের উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য ব্রাহ্মন আমদানী করেন। তাঁদের সাথে আগমনকারী ভৃত্যগন কায়স্থ নামে পরিচিতি লাভ করে। কায়স্থ শব্দের অর্থ লিখক অর্থাৎ যারা লেখা পড়ার কাজ করে। অবশ্য এ লেখা পড়া ধর্ম বিষয়ে নয়। কারন ধর্ম শাস্ত্র লেখা এবং পড়ার অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মনদের মধ্যেই সীমিত ছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে রচিত আর্য্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে এদেশের লোকেরা অসুর ভাষাভাষী। ঐতিরেয় পুরানে এদেশের লোকের মুখের ভাষাকে বলা হয়েছে "পক্ষীর ভাষা" (৬৪)। সেনগনের পূর্বে বাংলাদেশের প্রচলিত ভাষার নাম ছিল গৌড়ীয়

(৬৪) ডঃ এনামুল হক—মুসলিম বাংলা সাহিত্য।

www.pathagar.com

প্রাকৃত। গৌড়ীয় প্রাকৃতের অপভ্রংশ কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলা ভাষার শৈশবাবস্থার যে নমুনা পাওয়া গেছে তার নাম "চর্যাচর্য বিনিশ্চয়" অর্থাৎ জীবনে কি আচরণ করতে হবে আর কি আচরণ করতে হবে না তার বিবরণ (৬৫)। চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের আধুনিক নাম চর্যাপদ (৬৬)। ডঃ এনামুল হক এর মতে "ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষন দ্বারা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে চর্যাপদগুলির ভাষা' সূজ্যমান কালের বাংলা ভাষা। উদাহরণ স্বরুপ একটি পদ উদ্ধৃত করা গেল ঃ

"উচা – উচা পাবত, তহি বসই যাবরী বালী।
মোবসিংগ পুচ্ছ পরহিন, গিবত গুঞ্জরী মালী।।
উমত শবরো পাগল শবরো নাকর গুল গুহরী।
তোহেরি নিঅ ঘরিনী নামে সহজ সুন্দারী ॥
নানা তরুবর মৌলিলরে; গঅনত লাগেলি ডালী!
একেলী শবরী এ বন হিন্ডই কর্ণকুন্ডল বজ্রধারী ॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা শবরো, মহা সুহে সেজি ছাইলী।
শবরো ভুজংগী নৈরামনি দারী পেম্ম রাতি পোহাইল ॥"

অর্থাৎ "উঁচু উঁচু পর্বত—তায় শবরী বালিকা বাস করে। সে ময়ুর—পুচ্ছ পরিহিতা তাহার গলায় গুঞ্জার মালা, হে উম্মত্ত, শবর, পাগল শবর, গোল গোহারী করিও না, তোমার নিজ গৃহিনী সহজ সুন্দরী নামে পরিচিতা! ওরে। নানা তরুরব মুকুলিত হইল গগনে তাদের ডাল লাগিল। শবরী বালিকা এই বনে একাকিনী ভ্রমন করে, সে কর্ণে কুন্ডল ও বজ্রধারীনি। তিনধাতুর খাট পড়িল, হে শবর তুমি মহাসুখে শয্যা বিছাইলে। শবর ভুজংগ (সদৃশ) আর নৈবাত্মাদারা (স্ত্রী তুল্য) উভয়ই প্রেমে রাতি পোহাইল (৬৭)।"

---

(৬৫) ডঃ এনামুল হক—মুসলিম বাংলা সাহিত্য।

(৬৭) ঐ ঐ

(৬৬) আবদুল জব্বার—বাংলাদেশের ইতিহাস।

www.pathagar.com

এ পর্যন্ত ৪৭ চর্যাপদ এবং ২৩ জন রচয়িতার নাম পাওয়া গিয়েছে। চর্যাগীতির কবিরা প্রায় সকলেই বাংগালী। চর্যাপদ রচনায় সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করা হয়নি। উপরোক্ত পদটি তার প্রমাণ। সংস্কৃত ভাষার সাথে এদেশের লোকের পরিচয় ছিলনা। সেন রাজাগন এ দেশের লোকের উপর ব্রাক্ষনদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তাঁরা তাদের মুখের ভাষাও কেড়ে নেয়ার জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। বল্লাল সেন নিজে একজন পন্ডিত লোক ছিলেন। তিনি দানসাগর এবং অদ্ভূতসাগর নামক দু'খানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র যে বল্লাল চরিত এবং সেক শুভোদয়া রচনা করেন তাও সংস্কৃতে। কবি ধোয়ীর কাব্য "পবন দূতম" বিখ্যাত কবি জয়দেবের "গীত গোবিন্দ" হরি মিশ্রের 'কারিকা' সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এদেশের বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে ব্রাক্ষ্মন্যবাদীদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁরা যে নির্যাতন চালিয়েছিলেন তাতে আমাদের দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এবং মুসলমানদের আগমনকে তারা যে স্বর্গীয় আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহন করেছিল তার প্রমাণ মিলে সমসাময়িক কালের কবি রমাই পন্ডিতের রচিত "নিরঞ্জনের রুষ্মা" অর্থাৎ ভগবানের উষ্মা নামক কবিতা হতে। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

জাজপুর বাদি ষোল শঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কনূত্র নগুন।
দক্ষিন্যা মাগিতে জায় জার ঘরে নাক্রিপায়
শাপ দিয়ে পোড়ায় ভুবন।

মালদহে লাগেকর না চিনে আপন পর
ত্রাসের নাহিক দিশ পাশ।
বলিষ্ট হইয়া বড় দশবিশ হৈয়্যা জড়
সদ্ধমীরে — করত্র্ বিনাশ।
বেদ করি উচ্চারণ বেরা্যঅ অগ্নি ঘনঘন
দেখিয়া সভায় কম্পমান।

www.pathagar.com

মনেতে পাইআ মর্ম সভে বলে রাখ ধর্ম
মায়াতে হইল অন্ধকার।
ধর্ম হৈলা জবনরুপী মাথায়েত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হএ ত্রিভুবনে লাগে ভএ
খোদাএ বলিআ একনাম।
ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হইলা শূলপাণি।
গনেশ হইলা গাজী কাত্তিক হইল্যা কাজী
ফকির হইলা জথ মুনি।
তেজআ আপন ভেক নারদ হইলা শেক
পুরন্দর হইলা মলনা।
চান্দ সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সবে
সভে মেলে বাজাএ বাজনা।
আপনি চণ্ডিকা দেবী তিহ হৈলা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈলা বিবি নুর।
জথেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর।
দেউল দেহারা ভাংগে ক্যাড়া ফিড়্যা খাত্র রংগে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্মের পাত্র রামাঞি পণ্ডিত গাঞি
ইবড় বিষম গোল (৬৮)।

অর্থাৎ "জাজপুর (উড়িষ্যায়) ষোলশত বৈদিক ব্রাহ্মনের বাস। তাহারা কানে নগুন (পৈতা) তুলিয়া লইয়া দক্ষিনা মাগিতে যায় এবং যাহার ঘরে দক্ষিনা পায়না তাহার সংসার (ভুবন) শাপ দিয়া পোড়াইয়া দেয়। মালদহে তাহারা আপন পর না ভাবিয়া কর

(৬৮) ডঃ এনামুল হকের মুসলিম বাংলা সাহিত্য।

www.pathagar.com

বসাইয়া দেয় — তাহাদের জাল জুয়াচুরীর শেষ নাই। তাহারা বড় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। দল বাধিয়া (দশ বিশ জড় হইয়া) সদ্ধর্মীকে (বৌদ্ধ জনসাধারনকে) বিনাশ করিতেছে। তাহারা বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে। তাহাদের মুখ দিয়া ঘন ঘন অগ্নি বাহির হয় — সকলে তাহা দেখিয়া রুপমান। সকলে মনে মনে ইহার অর্থ বুঝিয়া বলে 'হে ধর্মদেবতা রক্ষা কর। তুমি ব্যতীত কে আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে? ব্রাহ্মনরা এইরুপে সৃষ্টি বিনাশ করিতে লাগিল. এ যে বড় অত্যাচার। ধর্ম দেবতা বৈকুন্ঠে বসিয়া মনে মনে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া মায়াতে আচ্ছন্ন হইলেন। অতঃপর ধর্ম-দেবতা মাথায় কালো টুপী পরিয়া হাতে তীরকশ কামান (ত্রিকচ কামান) লইয়া উত্তম অশ্বে আরোহন করিয়া, ত্রিভুবনে ভয় উৎপাদক "আল্লাহু আকবর" (খোদাত্র বলিয়া একনাম) ধ্বনি তুলিয়া যবন (মুসলিম) রুপ ধারন করিলেন। ব্রহ্মা মুহাম্মদ হইলেন, বিষ্ণু পয়গাম্বর হইলেন আর মহাদেব হইলেন আদম। গনেশ গাজী, কাতিক কাজী ও যত মুনি ঋষি ফকির বা দরবেশ হইলেন। আপন বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া নারুদ সেখ ও পরন্দর মৌলানা সাজিলেন। চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি আদিদেব পদাতিক হইয়া বাজনা বাজাইয়া তাহাদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং চণ্ডিকা দেবী হাওয়া বিবি হইলেন, আর পদ্মাবতী হইলেন বিবি নুর। যত দেবতা ছিল, এই ভাবে সকলে একমত হইয়া জাজাপুরে প্রবেশ করিল। তাহারা দেউল দেহারা (দেবালয় ও দেবগৃহ) ভাংগিল, মনের আনন্দে লুঠতরাজ করিয়া খাইতে লাগিল। 'ইত্যবসরে দারুন গণ্ডগোল দেখিয়া রমাই পন্ডিত ধর্মের পায়ে লুটিয়া পড়িয়া (গান) গাহিলেন)"।

কবিতাটির বিষয়বস্তু হতে মনে হয় যে উহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দিতে রচিত। এতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর উড়িষ্যা হতে আগত ব্রাহ্মনদের অত্যাচারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের আগমনের ফলে যে বৌদ্ধ এবং অব্রাহ্মনেরা ব্রাহ্মনদের কবল থেকে রেহাই পায় তাও উল্লেখিত হয়েছে। এদেশের ব্রাহ্মনদের দ্বারা নিপী-

www.pathagar.com

ড়িত জনগণ কর্তৃক মুসলমানেরা যে সমাদৃত হয়েছিল তাও স্পষ্ট প্রতীয়মান। সেন আমলে যে ব্রাহ্মনেরা সংখ্যায় অল্প ছিল তাও বুঝা যায়, কারণ উড়িষ্যাতে বসবাসকারী ষোল শত ঘর ব্রাহ্মন এ দেশবাসীর উপর নির্যাতন চালাতে আসত। সেন রাজাদের পৃষ্ঠ-পোষকতার কারণেই তাদের এ রকম করা সম্ভব ছিল। জনসাধারণ মনে প্রানে সেন বংশের উৎখাত চাইত। বর্ণ হিন্দুদের আধি-পত্যবাদ সামাজিক অবিচার ও নৈতিক অবক্ষয় দেশকে করুণপরিনতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

হিন্দু রাজাদের শাসনের ফলে বৌদ্ধ ধর্মও সামাজিক ও নৈতিক অব-ক্ষয়ের শেষ সীমানায় পৌঁছে। যে হিন্দু ধর্মের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরুপ বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল সেই বৌদ্ধ ধর্মের ভিতরও নানা পরিবর্তনের ফলে বৌদ্ধরা মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। যদিও বৌদ্ধগণ অহিংসা, সর্ব জীবে দয়া, শ্রেণী বৈষম্য হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো মোটামুটি ভাবে পালন করত, তবুও ধর্মীয় বিধি বিধানে তাদের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধ নিজে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ছিলেন নীরব, অথচ তাঁর মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্ম হীনযান ও মহাযান নামে দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়লে, মহাযান বৌদ্ধগণ তাঁকেই ভগবান রূপে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাঁর মূর্তি তৈরী করে পূজা অর্চনা করতে থাকে। ক্রমান্বয়ে হিন্দু ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম এর বৈশিষ্ট্য অনেকটা হারিয়ে ফেলে। হিন্দু রাজাদের মধ্যে অনেকে হর্ষ বর্ধনের মত পরধর্মমত সহনশীল রাজা হয়, আরও কেউ কেউ ছিলো, তবে বেশীর ভাগ হিন্দু শাসকই বৌদ্ধ ধর্মের চরম বিরোধী ছিলেন। বাংলার রাজা শশাংক ও সেন রাজারা এর প্রকৃষ্ট উদাহরন। ধারণা করা হয় সম্রাট অশোক যখন ব্রাহ্মনাবাদের অবসানের জন্য কতিপয় আদেশ জারী করেন এবং সাম্রাজ্যে জীব হত্যা বন্ধ করার নির্দেশ দেন, তখন থেকেই হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীলরা মৌর্য বংশের ধ্বংস কামনা করতে থাকে; কিন্তু যতদিন অশোক জীবিত ছিলেন, ততদিন প্রকাশ্যে কোন কিছু করতে সাহস পায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দুদের প্ররোচনায়ই মৌর্য সম্রাটের প্রবীন সেনা-

www.pathagar.com

পতি পুষ্যমিত্র কর্তৃক মৌর্যবংশ ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয় এবং যে রাজধানী পাটুলী পুত্র থেকে অশোক তাঁর সংস্কার কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন, সেই পাটুলী পুত্রই প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মনদের স্বার্থ সংরক্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। এ হেন সময়ে মুসলমানদের আগমন স্থানীয় অধিবাসীরা আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

বিজয়ীবেশে মুসলমানদের বাংলাদেশে প্রবেশ করবার পূর্বেও এদেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই পরিচয় হয়েছিল মূলতঃ কিছু সংখ্যক সূফী, দরবেশ ও আরব বণিকদের মাধ্যমে। উচ্চ–নীচ ভেদাভেদ বিহীন, সততার প্রতীক, এক আল্লাহর উপাসক, ন্যায়নীতির পৃষ্ঠপোষক, নিরহংকার, উদার মতাবলম্বী, আত্মবিশ্বাসী, মানবতার মর্যাদা দানকারী এইসব সূফী দরবেশ অত্যাচারিত, নিপীড়িত, মানবেতর জীবনযাপনকারী স্থানীয় জনসাধারণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভারতের সিন্দু প্রদেশ আগেই মুসলমানদের শাসনাধীনে এসেছিল। বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক উপস্থিতি ঘটেছিল মুহম্মদ ঘোরীর দিল্লী জয়ের পরে। এর আগে সুলতান মাহমুদ বহুবার ভারত আক্রমণ করে হিন্দু রাজন্যবর্গকে বারংবার পরাজিত করা স্বত্বেও রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হননি।

মুহাম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি কুতুবুদ্দীন আইবকের এক সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশ আক্রমণ করে এদেশে মুসলিম শাসনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। অতঃপর পাঁচশত বছরেরও অধিককালব্যাপী এদেশে মুসলমান শাসন অব্যাহত থাকে।

মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ খিলজী:

মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ছিলেন তুর্ক সম্প্রদায়ের লোক। তিনি নিতান্ত সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। প্রথম জীবনে তিনি দিন মজুরের কাজ করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী।

www.pathagar.com

প্রথমে তিনি শিহাব উদ্দিন ঘোরীর সৈন্য দল ভুক্ত হতে চেষ্টা করেন; কিন্তু বিফল হন। এর পর তিনি কুতুব উদ্দিন আইবেকের সেনা বাহিনীতে যোগ দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বেঁটে এবং কুৎসিত আকৃতির লোক। তিনি এতই দরিদ্র ছিলেন যে তাঁর একটি বর্ম থাকা তো দূরের কথা এমন কি একটি ঘোড়াও ছিলনা। তাই বাছাইতে তিনি বাদ পড়েন। বখতিয়ার হতোদ্যম না হয়ে আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং অবশেষে বদায়ুনের সিপাহসালার মালিক হিজবার উদ্দিন তাঁকে নিজ সেনা বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত করেন। কিন্তু তিনি জায়গীর পাবার উপযুক্ত বিবেচিত হননি। তাঁকে নগদ বেতনে সেনা বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। অল্প দিন সেখানে চাকুরী করার পর তিনি অযোধ্যায় ওয়ালী মালিক হিসাম উদ্দিনের নিকট গমন করেন এবং নিজ প্রতিভার স্বীকৃতি পান। কিন্তু হিসাম উদ্দিন এ উচ্চাভিলাষী এবং দক্ষ সেনাপতি সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং তাঁকে তাঁর এলাকার বাইরে পূর্ব প্রান্তে হানাওয়াচ নামক স্থানের জায়গীর প্রদান করেন। বখতিয়ারের পূর্বে এতদঞ্চলে কোন মুসলিম বাহিনী পদচারনা করেনি। হানাওয়ার জায়গীর লাভ করে তিনি গাহড়বার বংশীয় হিন্দু নরপতিদের বিরুদ্ধে, অভিযান পরিচালনা করতে থাকেন। কথিত আছে যে কুতুবুদ্দিন আই-বেক ইসলামের এই উদীয়মান তারকাকে খেলাত এবং প্রশংসাবানী পাঠিয়ে উৎসাহিত করেন। এর পর তিনি ওদন্তপুর বৌদ্ধ বিহার দখল করেন। বৌদ্ধ বিদ্বেষী হিন্দুদের আক্রমনের ভয়ে তখন বৌদ্ধ বিহারগুলি দুর্গা কারে নির্মিত হত। ওদন্তপুর বিহার ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আশ্রম এবং সেখান থেকে তারা বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করত। কিন্তু মুসলমানগন একে দুর্গ মনে করে অধিকার করে। পরে যখন জানতে পারে যে এটি বৌদ্ধদের একটি মাদ্রাসা তখন ভিক্ষুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সমস্ত এলাকার নামকরন করে বিহার অর্থাৎ বিদ্যাপীঠ।

সেন বংশীয় বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মন সেন তখন বংগদেশে রাজত্ব করতেন। নদীয়া বা নবদ্বীপ ছিল তাঁর রাজধানী।

www.pathagar.com

১২০৩ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। সূর্য তখন মধ্য গগনে অবস্থানরত। এমনি সময়ে ১৭ জন অশ্বারোহী বীর গতিতে রাজধানীর তোরনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাজধানীর সদর দরজার নিকটে এসে তারা তাদের গতি আরো মন্থর করে এবং এমন ভান করে যেন তারা বিদেশ থেকে আগত একদল বনিক, বানিজ্যের উদ্দেশ্যে রাজধানীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। তারা বিনা বাধায় লক্ষ্মন সেনের প্রাসাদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে তলোয়ার কোষমুক্ত করে। মুসলিম ঐতিহাসিকদের ভাষায় জেহাদ শুরুকরে। শহরে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায় এবং সকলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। লক্ষ্মনসেন সে সময়ে খেতে বসেছিলেন। তিনি সামনের খাবার ফেলে রেখে খালি পায়ে খিড়কির দরজা দিয়ে পূর্ব বাংলার দিকে পালিয়ে যান এবং বিক্রমপুরের রামপালে পৌঁছেন। সেখান থেকেই অতঃপর তিনি পূর্ব বাংলা শাসন করতে থাকেন। বখতিয়ার নদীয়া বা নবদ্বীপ দখল করে চুপ করে বসে রইলেন না। সেখানে কয়েক দিন বিশ্রামের পর গৌড়ের দিকে ধাওয়া করলেন এবং তা জয় করে সম্পূণ বরেন্দ্র ভূমি পদানত করলেন। অতঃপর নানা প্রকারের উপঢৌকন সহ তিনি দিল্লীর সম্রাট কুতুবুদ্দিনের সমীপে উপস্থিত হন।

১২০৩ থেকে ১২০৫ খৃঃ পযন্ত তিনি তাঁর বিজিত এলাকায় সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি অনেক মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তিনি দশহাজার সেনার এক বাহিনী নিয়ে দেবকোট থেকে তিব্বতে অভিযান পরিচালনা যা করেন পরিনামে তাঁর জন্যে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম দিকে কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেও পরে প্রতিকূল পরিবেশে তাঁর বিরাট বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং তিনি মাত্র ১০০ জন সহযাত্রী সেনাসহ দেবকোটে ফিরে আসেন। এর পর লজ্জায় তিনি কাউকে মুখ দেখাতে চাইতেন না এবং তাঁর মুখমন্ডল সব সময় কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতেন। তিনি শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন তিনি ভীষন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী তখন আলী মর্দান খিলজী তাঁর বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করেন। এঘটনা ঘটে তার তিব্বত অভিযান থেকে ফিরে আসার মাত্র তিন মাস পরে।

www.pathagar.com

খিলজী বিজেতাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ :

লাখনৌয়ের শাসনকর্তা মুহাম্মদ শিরাণ খিলজী বখতিয়ারের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহনার্থ আলী মর্দান খিলজীর বিরুদ্ধে এক অভিযান চালনা করেন এবং তাঁকে বন্দী করেন। খিলজী সম্প্রদায় একমত হয়ে মালিক ইয়াজ উদ্দিন মহাম্মদ শিরাণ খিলজীকে সিংহাসনে বসান। মুহাম্মদ শিরান আলী মর্দানকে বন্দী করে তাঁর তদারকির ভার তাঁর বাবা হাজী ইস্পাহানীর উপর ন্যাস্ত করেন। কিন্তু আলী মর্দান তাঁর প্রহরায় নিয়োজিত বাবা হাজী ইস্পাহানীকে বশীভূত করে কারাগার থেকে পলায়ন করেন এবং দিল্লীতে কুতুবুদ্দিন আইবেকের নিকট উপস্থিত হন।

এদিকে দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দিন হোসাম উদ্দিনকে লক্ষ্মৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বখতিয়ার কর্তৃক বিজিত এলাকা লাক্ষ্মৌতি গৌড় নামে পরিচিত ছিল। উত্তরে পূর্ণিয়া থেকে রংপুর, পূর্ব এবং পূর্ব-দক্ষিনে তিস্তা করতোয়া, দক্ষিনে গংগা এবং পশ্চিমে কুশীয়ারা নদী হতে রাজ মহলের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত যে এলাকা তা লাক্ষ্মৌতি, লক্ষ্ণাবর্তী বা গৌড় নামে অভিহিত হত (৬৯)।

আলী মর্দান কুতুবুদ্দিনের সংস্পর্শে এসে তাঁর মন জয় করতে সমর্থ হন। কুতুবুদ্দিন তাঁকে লক্ষ্মৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। হোসাম উদ্দিন আলী মর্দানের আধিপত্য মেনে নেন। আলী মর্দান সুলতান আলাউদ্দিন উপাধি গ্রহন করেন। ক্ষমতার মদমত্ততায় তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং খিলজী সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন চালাতে থাকেন। ফলে খিলজী অভিজাত সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টায় সুলতান আলাউদ্দিন আলী মর্দান খিলজী নিহত হন এবং গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খিলজী তাঁদের নেতা নির্বাচিত হন।

গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খিলজী :

গৌড়ের মসনদে আরোহনকারী সুলতানদের মধ্যে গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খিলজী ছিলেন সব চাইতে বেশী জনপ্রিয়। তাঁর সময়ে উড়িষ্যার শক্তিশালী গংগবংশীয় সম্রাট তৃতীয় অনংগভীম রাঢ় অঞ্চল আক্র-

(৬৯) History of Bengal, Vol. II Compiled by D.U.

www.pathagar.com

মণ করেন এবং তাঁর সেনাপতি বিষ্ণু মুসলিম সীমান্ত ঘাঁটি লাখনৌ অধিকার করেন। কিন্তু গিয়াস উদ্দিন তাঁকে সেখান থেকে শুধু বিতাড়িতই করেননি, কর প্রদানেও বাধ্য করেছিলেন। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যখন অনংগভীম রাঢ় অঞ্চল আক্রমন করেন তখন তথাকার আদি বাসিন্দা এমনকি হিন্দুরাও তাদের স্বধর্মাবলম্বীদের সহায়তায় এগিয়ে যায়নি বা মুসলমানদের বিরোধীতা করেনি (৭০)। মুসলিম শাসনকে তারা তখন মনে প্রাণে সমর্থন করেছে। গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ দেবকোট থেকে গৌড় লক্ষ্মনাবতীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং পূর্ব বাংলার উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য তৎপর হন। তিনি কয়েকবার পূর্ব বাংলার উপর হামলা চালিয়ে এর আয়তন খর্ব করেন। হরি মিশ্র তাঁর কারিকায় উল্লেখ করেন "লক্ষ্মনসেনের পুত্র কেশব সেন যবনদের ভয়ে সব সময় কম্পমান থাকতেন। কেশব যখন গৌড় রাজ্য পরিত্যাগ করেন তখন তথায় ব্রাহ্মনদের বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়ে (৭১)। বিশ্বরূপ সেন একজন প্রতাপশালী রাজা হলেও তাঁর রাজত্ব ঢাকা, ফরিদপুর এবং বরিশালের মধ্যে সীমিত ছিল। মিনহাজ-ই-সিরাজে উল্লেখ রয়েছে যে এসময়ে সেন রাজাগন গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ বাংলার প্রথম স্বাধীন মুসলিম নরপতি। তিনি আব্বাসীয় খলিফা আল নাসীরের কাছ থেকে সনদ ও খেলাত পেয়েছিলেন। তিনি নিজ নামাংকিত মুদ্রাও চালু করেন। গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ সংগত কারনেই ধরে নিয়েছিলেন যে দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস তাঁর এ ঔদ্ধত্য সহ্য করবেন না। কিন্তু এ সময়ে দিল্লীর সুলতানকে অন্যদিকে মনোযোগ দিতে হয়। অযোধ্যার হিন্দুগণ পৃথু নামক জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে (৭২)। পৃথুর বিদ্রোহ, চেংগিস খানের ভারত আক্রমণ, ইত্যাদি কারণে ইলতুৎমিস গিয়াসউদিন ইওয়াজের দিকে মনযোগ দিতে

(৭০) History of Bengal, Vol II. Compiled by D.U.
(৭১) যতীন্দ্র মোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।
(৭২) History of Bengal, Vol. II, Compiled by D.U.

www.pathagar.com

পারেননি। এ সমস্ত বাধা অপসারিত হলে তিনি তাঁর পুত্র নাসির উদ্দিনের অধীনে এক সেনা বাহিনী পাঠান এবং যুদ্ধে গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ পরাজিত ও বন্দী হন। পরে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। অতঃপর লক্ষনাবতী দিল্লীর অধীন হয়ে পড়ে।

মামলুক সুলতানদের অধীনে বংগদেশ
মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন ইয়াজবুক

সুলতান ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এ সুযোগে তুগ্রীল তুগান খাঁ লক্ষনাবতীর শাসন কর্তৃত্ব হস্তগত করেন। তিনি দিল্লীর সুলতানের আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর পর যাঁরা লক্ষনাবতীর শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন, তাঁদের মধ্যেই যিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন ইয়াজবুক। তিনি নিজে সুলতান উপাধি গ্রহন করেন এবং সুলতান মুঘিস আল দুনিয়া ওয়ালদ্দীন আবুল মোজাফফর ইয়াজবুক আল-সুলতান নামে নিজেকে পরিচয় দেন। তিনি উড়িষ্যার হিন্দু রাজার সাথে সাফল্যের পরিচয় দিলেও কামরূপ জয় করতে গিয়ে সপরিবারে নিহত হন।

ইখতিয়ার উদ্দিন ইয়াজবুকের পর মালিক ইয়াজ উদ্দিন ইয়াজবুক লক্ষনাবতীর শাসন ভার লাভ করেন। তিনি দিল্লীর অধীনতা মেনে নেন। তিনি পূর্ব বাংলার উপর আক্রমন চালানো অব্যাহত রাখেন সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন আমিন খাঁকে লক্ষনাবতীর গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং তুগ্রল খাঁকে ডেপুটি গভর্ণর নিযুক্ত করেন। গিয়াস উদ্দিন ইয়াজবুক হতে শুরু করে ইয়াজ উদ্দিন ইয়াজবুক পর্যন্ত সকলেই পূর্ব বাংলার উপর আক্রমন চালায়। ফলে সেন রাজ্যের পরিসর সংকুচিত এবং মুসলিম শাসিত এলাকা আয়তনে বৃদ্ধি পায়। তাই গিয়াস উদ্দিন বলবন কর্তৃক তুগ্রল খাঁকে ডেপুটি গভর্ণরের পদে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

আমিন খাঁ প্রকৃত পক্ষে অযোধ্যার শাসন কর্তা ছিলেন, ফলে তুগ্রল খাঁ লক্ষনাবতীর প্রকৃত শাসক হয়ে দাঁড়ান। তিনি মুসলিম

www.pathagar.com

শাসিত এলাকার সীমানা ফরিদপুর এবং ঢাকার অধিকাংশ এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ঢাকা হতে ২৫ মাইল দক্ষিনে নারিকেলাতে তিনি এক কিল্লা নির্মান করেন যাকে ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দিন বারনী কিল্লা তুগ্রল নামে অভিহিত করেছেন। এ কেল্লাটিকে তিনি তাঁর ধন রত্ন এবং পরিবার বর্গের জন্যে নিরাপদ মনে করে তাদেরকে এখানে রাখেন।

জিয়া উদ্দিন বারনী মুসলিম শাসিত এলাকাকে আরসাহ-ই-বাংলা নামে অভিহিত করেছেন। ভাটি অঞ্চল যাকে তিনি দিয়ারে বাংলা নামে অভিহিত করেছেন তা তখনও মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়নি। তখনও সোনারগাঁয়ে হিন্দু রাজা দনুজ রাজা রাজত্ব করতেন এবং বরিশাল পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তুগ্রল ত্রিপুরা পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন যখন মোগলদের আক্রমনে ব্যতিব্যস্ত তখন তুগ্রল স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রা ও খুৎবা পাঠ চালু করেন। গিয়াস উদ্দিন বলবন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। বংগদেশ আবার দিল্লীর প্রভুত্বাধীন হয়ে পড়ে এবং বলবন তাঁর পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিন (বুগরা খাঁ) কে বংগ দেশের শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। দিল্লীর মামলুক সুলতানদের উৎখাত করে খিলজীরা ক্ষমতা দখল করার পর সুলতান নাসির উদ্দিনের বংশধরগন মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকাল পর্যন্ত প্রায় ৪০ বৎসর কাল স্বাধীনভাবে বংগদেশে রাজত্ব করেন। এ সময়ে সামসুদ্দিন ফিরোজ নামে এক ব্যক্তি বংগদেশ এবং বিহারের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। প্রথম জীবনে সম্ভবতঃ তিনি গিয়াস উদ্দিন বলবনের ক্রীতদাস ছিলেন। পরে নাসির উদ্দিনের সময়ে প্রাধান্য লাভ করেন এবং তাঁর নামে বাংলা-বিহার শাসন করতে থাকেন। সুলতান সামুসুদ্দিন ফিরোজের আমলে মোমেন শাহী এবং সিলেট মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়। সামসুদ্দনের পুত্র বাহাদুর শাহের আমলে গিয়াস উদ্দিন তুঘলক বংগদেশ আক্রমন করেন এবং সোনারগাঁওকে দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বাহাদুর শাহকে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে যান এবং

www.pathagar.com

নিজ সেনাপতি বাহরাম খাঁর উপর সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও এর শাসনভার অর্পন করেন।

তুগলকদের শাসনাধীনে বংগ দেশ ঃ

গিয়াস উদ্দিনের পর তৎপুত্র মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহনের পর বাহাদুর শাহকে মুক্তি দেন এবং তাঁর উপর সোনারগাঁও এর শাসনভার অর্পন করেন। কিন্তু তাঁকে বাহরাম খাঁ ওরফে তাতার খানের নির্দেশ মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনার নির্দেশ দেন। কদর খাঁকে লক্ষ্মনাবতী এবং আজম মালিককে সাতগাঁও এর শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। এরূপে মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বংগদেশকে তিন ভাগে ভাগ করেন। সোনার গাঁও হলো পূর্ব বাংলা, লক্ষ্মনাবতী বা গৌড় হলো উত্তর বাংলা এবং সাতগাঁও হলো পশ্চিম বাংলা।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্ব কালে ত্রিপুরা এবং চাটগাঁও দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুহাম্মদ বিন তুঘলক যখন মুলতানে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত তখন বাহাদুর শাহ তাঁর অভিভাবক তাতার খাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও ধৃত হন। তাঁর গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে দিল্লীতে সম্রাটের নিকট পাঠানো হয়।

বাহরাম খাঁ ওরফে তাতার খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিলাহদার (বর্ম রক্ষক) ফখরা ওরফে ফখরুদ্দিন সোনারগাঁয়ের শাসন ভার গ্রহন করেন। এক বৎসর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষনা করেন এবং ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ উপাধি গ্রহন করেন। ফলে কদর খাঁ এবং আজম মালিক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং তাঁকে সোনারগাঁও হতে বিতাড়িত করেন। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ মেঘনা নদীর অপর পাড়ে পালিয়ে যান। পরে কদর খাঁ তাঁর কার্যকলাপের জন্যে স্বীয় সেনা দলের বিরাগভাজন হন এবং তারা ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের দলে যোগ দেয়। তিনি তাদের সহায়তায় কদর খাঁকে হত্যা করে স্বাধীন ভাবে সোনারগাঁও শাসন করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্মনাবতী জয়ের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবে সোনার গাঁও দিল্লীর অধীনতার নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়।

www.pathagar.com

ইলিয়াস শাহী বংশ ঃ

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষ দিকে সাম্রাজ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। হাজী ইলিয়াস সেই সুযোগে ইলিয়াস শাহ নাম ধারন করে ১৩৩২ খৃঃ লক্ষ্মনাবতীর সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৩৫৩ খৃঃ ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের পুত্রকে পরাজিত করে তিনি সোনারগাঁও দখল করেন। তিনি ত্রিলুত, মম্পারন এবং নেপাল জয় করেন এবং পশ্চিম দিকে তাঁর রাজ্য গোরক্ষপুর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তদসময়ে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উত্তরাধিকারী ফিরোজ তুঘলক বংগদেশ অক্রামন করলে তিনি একডালা নামক দূভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নেন এবং পরাজয়ের পর পরাজয় বরন করেন। লক্ষ্মনাবতীর পশ্চিমের সমস্ত এলাকা তাঁর হস্তচ্যুত হয়। কিন্তু দিল্লীর সুলতান একডালা দূর্গ অধিকার করতে ব্যর্থ হয়ে ৪৭টি হাতি এবং অন্যান্য উপঢৌকন সহ দিল্লী ফিরে যান। অতপর দিল্লীর সুলতান ইলিয়াস শাহের সাথে সখ্যতা স্থাপন করেন। তিনি তাঁর নিকট বংগদেশের হাতির জন্যে অনুরোধ জানন এবং বিনিময়ে সুলতানের জন্যে আরবী ঘোড়া পাঠান।

সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের পর তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ মসনদে আরোহণ করেন। তাঁর সময়ে ফিরোজ শাহ তুঘলক পুনরায় বংগদেশ আক্রমণ করেন। পিতার মত তিনিও একডালার দুর্গে আশ্রয় নেন। দিল্লীর সুলতান দূর্গ অধিকারে ব্যর্থ হয়ে সিকান্দর শাহের সাথে সন্ধি করেন এবং বন্ধুত্ব সূত্র আবদ্ধ হন। এর পর বংগদেশের সুলতানগন ২০০ বৎসর কাল নিরুপদ্রবে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন।

সিকান্দর শাহের সাথে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের মনোমালিন্য ঘটে এবং আযম শাহ সোনার গাঁয়ে এসে আশ্রয় গ্রহন করেন। পরে পিতা পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে সিকান্দর শাহ প্রান হারান।

গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সাহসিকতা ও ন্যায় পরায়নতার জন্যে খ্যাত ছিলেন। কথিত আছে তাঁর নিক্ষিপ্ত তীরে

www.pathagar.com

এক বিধবার পুত্র নিহত হয়। বিধবা কাজী সিরাজ উদ্দিনের দরবারে নালিশ করে। কাজী সুলতানকে তাঁর দরবারে হাজির হতে নির্দেশ দেন। কাজীর নির্দেশানুসারে তিনি আদালতে হাজির হলে কাজী তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে তাঁকে রক্তপণ পরিশোধ করার আদেশ দেন, অন্যথায় উপযুক্ত শাস্তি গ্রহনের জন্যে প্রস্তুত হতে বলেন। গিয়াস উদ্দিন রক্তপণ পরিশোধ করার পর কাজী উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শণ করেন। তখন গিয়াস উদ্দিন তাঁর জামার আস্তিনের ভেতর লুকানো তলোয়ার বের করে বলেন কাজী যদি বিধবার ন্যায় বিচার না করে সুলতানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতেন তবে তিনি তলোয়ারের আঘাতে তাঁর শিরোচ্ছেদ করতেন। কাজীও তাঁর আসনের নীচ থেকে চাবুক বের করে বলেন, সুলতান যদি তাঁর হুকুম অমান্য করতেন তবে চাবুক দ্বারা তিনি তাঁর পিঠের চামড়া তুলে নিতেন। গিয়াস উদ্দিনের আমলে ভাতুরিয়ার জমিদার গনেশ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেন এবং তার চক্রান্তে তিনি নিহত হন।

গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের পুত্র সাইফুদ্দিন হামজার রাজত্ব কালে গৃহযুদ্ধ বাঁধে এবং সে সুযোগে গনেশ সিংহাসন দখল করেন।

রাজা গনেশ "দনুজ মর্দন দেব" অর্থাৎ চন্ডীদেবীর পদতলে আশ্রিত উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম ওলেমা এবং দরবেশদের উপর নির্যাতন চালাতে থাকেন। এতে সুফী সম্প্রদায়ের প্রধান হযরত নুর কুতুবুল আলম জৌনপুরের শাসন কর্তা ইব্রাহিম শকিকে বংগদেশ অধিকার করে মুসলমানদের উদ্ধারের জন্যে আহবান জানান। ইব্রাহিম শকি সসৈন্যে বংগদেশাভিমুখে রওয়ানা হলে রাজা গনেশ ভীত হয়ে পড়েন এবং নিজপুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে নাম দেন জালালুদ্দিন এবং তাঁর সপক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন। ইব্রাহিম শকি জৌনপুরে ফিরে গেলে পর তিনি জালালুদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করেন এবং পুনরায় নিজে সিংহাসনে আরোহন করেন। অতঃপর রাজা গনেশ মুসলমানদের প্রতি আরো খড়্গহস্ত হয়ে উঠেন এবং সেখ আনোয়ার নামক জনৈক দরবেশকে হত্যা করেন। যে দিন সেখ আনোয়ার নিহত হন সেদিনই গনেশ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

www.pathagar.com

গনেশের মৃত্যুর পর জালালুদ্দিন কারামুক্ত হয়ে সিংহাসণে আরোহন করলে মুসলমানগনের নির্যাতন নীপিড়নের অবসান ঘটে। জালালুদ্দিনের পরে ইলিয়াস সাহের বংশধরগন বংগদেশের মসনদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুলতান রুকনুদ্দিন বারবাক শাহ। তাঁর রাজত্বকালে সেনাপতি ইসমাইল গাজী রংপুর (কামতাপুর) ও দিনাজপুরের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাফল্য লাভ করেন। ফলে এতদাঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আসে। ইসমাইল গাজী একজন কামেল দরবেশ ছিলেন। তাঁর নিকট কামতাপুরের পরাজিত হিন্দুরাজা ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইলিয়াস শাহী বংশের দুর্বলতার সুযোগে হাবসী ক্রীতদাসগণ শাসন ক্ষমতা করতলগত করে। শেষ হাবসী ক্রীতদাস সুলতান সামসুদ্দিন মুজাফফরকে হত্যা করে সায়েদ হোসাইন বংগদেশের সিংহাসনে আরোহন করেন।

হোসাইন শাহ ঃ

সামসুদ্দিন মোজাফফরকে হত্যা করে হোসাইন শাহ বংগদেশের অধিপতি হন। মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়ের কথা বলতে গিয়ে হোসাইন শাহ বা তৎপুত্র নসরৎ শাহের আমলের যুদ্ধ বিগ্রহের অবতারনা অনাবশ্যক। ঐতিহাসিকগণ হোসাইন শাহকে বংগদেশের স্বাধীন সুলতানদের মুকুট মনি বলে বর্ণনা করেছেন। তাই তাঁকে নৃপতি তিলক, জগৎভূষন ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করা হয়েছে। তাঁর সীমাহীন উদারতার ফলে ব্রাহ্মন্যবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তাঁর পূর্বেও মুসলমান রাজা, বাদশাহগণ হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন। কিন্তু তারা যাতে বর্ণ বিদ্বেষের প্রভুত্ব স্থাপিত করতে না পারেন সে বিষয়ে খেয়াল রাখতেন। কিন্তু হোসাইন শাহ দেশের শাসনভার বর্ণ হিন্দুদের উপর ছেড়ে দেন। তাঁর প্রধান উজীর ছিলেন গোপীনাথ বসু, যাঁকে পুরন্দর খাঁ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। কেশব ছত্রী ছিলেন তাঁর দেহ রক্ষী বাহিনীর প্রধান। টাকশালের অধিকর্তাও হিন্দু ছিল। রূপ ও সনাতন নামে দুই সহোদর তাঁর অধীনে

www.pathagar.com

উচ্চ সরকারী পদে নিয়োজিত ছিলেন। এঁদের একজন ছিলেন তাঁর দবীরে খাস (একান্ত সচীব)। মালাধর বসু, বিপ্রদাস, যশোরাজ খাঁ ইত্যাদি কবিগণ বাংলা ভাষায় প্রতি তাঁর পৃষ্ঠ পোষকতার কারণে নানাভাবে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলাতে তাঁর অনুদিত মহাভারতের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

"নৃপতি হুসেন শাহ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার ;
কলিকালে হের যেন কৃষ্ণ অবতার॥"

হোসাইন শাহ কর্তৃক নিয়োজিত চাটগাঁ এর শাসনকর্তা পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বরের দ্বারা মহাভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদ করিয়েছিলেন। কোন কোন বৈষ্ণব কবি এমন ধারণাও পোষণ করতেন যে হোসাইন শাহ শ্রী চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে স্বীকার করেছিলেন।

হোসাইন শাহের পর তদীয় পুত্র নসরৎ শাহের আমলে পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন। হোসাইন শাহের পৌত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে কবি মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণের প্রনয় লীলা বিষয়ক "শ্রী কৃষ্ণ বিজয়" নামক একখানি বাংলা মহাকাব্য রচনা করেন। কবি মালাধর বসু তার সম্পর্কে লিখেছেন—

"নিঃগুন মুই নাহি কোন গ্রাম
গৌড়েশ্বর দিল নাম গুন রাজ খাঁ।"

হোসাইন শাহের বংশের শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের আমলে ১৫৩৮ খৃঃ শের খাঁর সেনাপতি খাবাস খাঁ গৌড় অধিকার করলে পর ২০০ বৎসর পরে বংগদেশ আবার স্বাধীনতা হারিয়ে দিল্লীর পদানত হয় এবং এর স্বতন্ত্র ইতিহাস লেখা নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

এদেশে মুসলমানদের আগমনের পর এখানকার অধিবাসীগণ ইসলামের উদারতা দর্শনে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। অপরদিকে হিন্দু সমাজ হতে কেউ মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে যাতে এর উৎকর্ষতা

www.pathagar.com

উপলব্ধি করতে না পারে সে জন্যে হিন্দু সমাজপতিরা মুসলমানদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে কড়া বাধা নিষেধ আরোপ করে চলে। কিন্তু এরূপ সংকীর্ণতা হিন্দু সমাজের জন্য ক্ষতির কারন হয়ে দাঁড়ায়। কিছু সংখ্যক হিন্দু সমাজ সংস্কারক অনুদার নীতি পরিহার করে হিন্দু সমাজকে সংকীর্ণতা মুক্ত করার প্রয়াশ পান। মুসলিম শাসকদের উদারতা তাঁদের এরূপ কার্যক্রমে উৎসাহিত করে। কবি শ্রীকর নন্দী তাঁর বাংলা মহাভারতের অশ্বমেধ সর্গে লিখেছেন—

"পন্ডিতে পন্ডিতে সভাখন্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি।।
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুন্য কথা।
মহামুনি জৈমিনী কহিল সংহিতা।।
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভা খণ্ডে আদেশিলেন খাঁ মহাশয়।।"

হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরনের নেতৃত্ব দেন শ্রী চৈতন্যদেব। তিনি ছিলেন ঘোর মুসলিম বিদ্বেষী। মুসলিম শাসন উৎখাত করে হিন্দু প্রভুত্ব কায়েম করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। শ্রী চৈতন্য ও তাঁর পেটোয়া শিষ্য যবন হরিদাসের মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথন শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ রয়েছে ঃ-

"একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তারে লঞা গোষ্ঠি তাহারে পুছিলা।।
হরিদাস। কলিকালে যবন অপার।
গো ব্রাহ্মনে হিংসা করে মহাদুরাচার।।

শ্রী চৈতন্যের মতে কলিকালে যবন অর্থাৎ মুসলমানেরা অত্যন্ত প্রবল। তারা গরু হত্যা করে এবং ব্রাহ্মনদেরকে হিংসা করে, তাই তারা মহাদুরাচার। অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ—

"পাষন্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার
পাষন্ডী সংহারী ভক্তি করিমু প্রচার।।"

www.pathagar.com

পাষণ্ডী শব্দের অভিধানিক অর্থ হল বেদ বিরোধী। শ্রী চৈতন্য দেবের সময়ে এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব ছিলনা। তাই বেদ বিরোধী বলতে মুসলমান ছাড়া আর কাউকে বুঝায় না। শ্রী চৈতন্য বুঝেছিলেন যে হিন্দু ধর্মকে সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখে ইসলামকে প্রতিহত করা যাবে না। ইসলামকে মোকাবেলা করতে হলে হিন্দু ধর্মকে উদার করতে হবে এবং ভক্তি প্রচারই হবে উদারতার হাতিয়ার। প্রশাসনিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলিম সুলতান এবং রাজকর্মচারীদের অসীম উদারতাই যে শ্রী চৈতন্যকে এ সাহস যুগিয়েছিল সে জন্যে একটি প্রমাণই যথেষ্ট।

শ্রী চৈতন্য প্রতিদিন শেষ রাত্রে দলবল সহ নগর সংকীর্তনে বের হতেন। এতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে বলে ব্রাহ্মনগণ কাজীর দরবারে নালিশ করে। কাজী তাঁকে তলব করেন। শ্রী চৈতন্য কাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হন। কৃষ্ণ দাস কবিরাজ কাজী এবং শ্রী চৈতন্যর মধ্যে কথোপকথনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হল ঃ—

"আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমি দেখি লুকাইলা এ ধর্মকেমত।।
কাজী কহে তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া।।
এবে তুমি শান্ত হইলে আমি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তোমাহেন অতিথি পাইলাম।।
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধে হৈতে গ্রাম সম্বন্ধে স্যাঁচা।।
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।।
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহায়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা নালয়।" (৭৩)।

মুসলমান কাজী যখন চৈতন্যদেবের সংগে মামা ভাগিনা সম্পর্ক পাতাবার জন্য ব্যগ্র তখন তিনি মুসলমানদের সংহার করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

(৭৩) Dr: Abdul karim Social History of the Muslims of Bengal

www.pathagar.com

রূপ ও সনাতন ছিলেন হোসাইন শাহের অত্যন্ত বিশ্বাস ভাজন। তাঁদের একজন ছিলেন তাঁর দবীরে খাস অর্থাৎ একান্ত সচীব। অথচ তাঁরা তাঁদের প্রতিস্থাপিত আস্থার সুযোগে এদেশ থেকে মুসলমান-দের উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের এ ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত সুলতানের নিকট ফাঁস হয়ে পড়ে এবং তিনি সনাতনকে লক্ষ্য করে বলেন :-

"তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব বহু মারি কৈল চাকলা ছার খার॥
হেথা তুমি কেলে আমার সর্বনাশ॥ (৭৪)।

যখন ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পারল যে তাঁদের স্বরূপ সুলতানের নিকট ধরা পড়েছে তখন তাঁরা এদেশে অবস্থান নিরাপদ মনে করলেন না। সনাতন চৈতন্য দেবকে যে কথা বলে দেশ ত্যাগের জন্য প্ররোচিত করলেন তা হল :-

"ইহা হইতে চল, ইহ নাহি কাজ,
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি " (৭৫)

গৌড়রাজ চৈতন্যদেবকে ভক্তি করলেও যবন জাতিকে বিশ্বাস করতে নেই। তাই এদেশ ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর শ্রী চৈতন্য বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে গমন করেন। রূপ মহাপ্রভুর সংগ নেন। কিন্তু সনাতনের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সুলতান তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু সনাতন কারা রক্ষীকে সাত হাজার মুদ্রা ঘুষ দিয়ে কারাগার থেকে পলায়ন করেন এবং বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হন। শ্রী চৈতন্য আনন্দাতিশয্যে তাঁকে আলিংগন করতে যান। কিন্তু নীচু জাতির সংস্পর্শে থেকে তাঁর দেহ কলুষিত হয়েছে, তাঁর আর্যত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি মনে করে সনাতন বলতে থাকলেন :

---

(৭৪) মোঃ আক্রম খাঁ ——মোসলেম বাংলার সামাজিক ইতিহাস।
(৭৫) ঐ ঐ

www.pathagar.com

"তোমা স্পর্শযোগ্য প্রভু, মুই ছার নই কভু,
পাপময় মুই অনার্য সকল সাধুর ত্যাজ্য,
মোরে স্পর্শ প্রভু কভুনা করহ।" (৭৬)।

এ সমস্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে মুসলিম নরপতিরা দুর্বল ছিলেন না। যদি তাঁদের শাসন ব্যবস্থায় কোন প্রকারের দুর্বলতা থাকত তবে শ্রী চৈতন্য দেবকে শিষ্যবর্গ সহ এদেশ থেকে পালাবার সুযোগ হতো না। অতিরিক্ত উদারতাই ছিল তাদের দুর্বলতা।

হোসাইন শাহ্ এবং তাঁর বংশধরদের আমলে প্রভুত্বকামী অভিজাত শ্রেণী এদেশ হতে মুসলমানদের বিতাড়িত করার জন্যে যে ষড়যন্ত্র মেতে উঠেছিল তার ছেদ পড়ে যখন শের শাহ বংগদেশ অধিকার করে তা দিল্লী সম্রোজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

শের শাহ এবং তাঁর পুত্র ইসলাম খাঁ মোট ১৩ বৎসর দিল্লীর সাম্রাজ্য শাসন করেন। ইসলাম খাঁর মৃত্যুর পর বংগদেশ দিল্লীর সাম্রাজ্য হতে খসে পড়ে এবং স্বাধীনতা ঘোষনা করে। ১৫৬৫ সাল হতে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত সুলতান সোলায়মান কররানী স্বাধীন ভাবে বংগদেশ শাসন করেন। সোলায়মান কররানীর পর তাঁর ছেলে দাউদখাঁ কররানী বংগদেশের সুলতান হন। তিনি ১৫৭৪ খৃঃ আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ'র নিকট রাজমহলের যুদ্ধ পরাজিত ও নিহত হন। অতপর বংগদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবাবা প্রদেশে পরিণত হয়। এর স্বাধীন সত্ত্বার বিলুপ্তি ঘটলে পর এর ইতিহাস মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শক্তির পতন ঃ

সর্ব শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট আওরংগজেবের আমলে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর পূর্বে দিল্লী বা মগধের কোন সম্রাটই এত বড় সামাজ্য শাসন করার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। কিন্তু আওরংগ জেবের আমলে হিন্দু পুনর্জাগরনের

(৭৬) মোঃ আক্রাম খাঁ মোসলেম বাংলার সামাজিক ইতিহাস।

www.pathagar.com

আন্দোলন জোরদার হয়। দাক্ষিনাত্যের মারাঠাগণ শিবাজীর নেতৃত্বে ভারতে হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় মেতে উঠে। তিনি বাঘনখ নামক ধারালো অস্ত্র কাপড়ের ভিতর লুকিয়ে রেখে বিজাপুরের সেনাপতি আফজাল খাঁর সাথে সাক্ষাৎ প্রার্থী হন। আফজাল খাঁ তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দেন। সাক্ষাতের সময় যখন আফজাল খাঁ তাঁকে আলিংগণ করতে যান তখন শিবাজী তাকে বাঘনখ অস্ত্র দ্বারা গুরুতরভাবে আহত করেন। পরে তিনি শাহাদাত বরন করেন।

আওরংগজেবের আমলে শিবাজী পালিয়ে বেড়াতেন এবং আওরংগজেব তাঁকে পার্বত্য মুষিক বলে উপহাস করতেন। কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকার বলেন—"শতশত বৎসর পরাধীনতার গ্লানি বহন ও নির্যাতন ভোগ করার পরও যে শুষ্ক মৃতপ্রায় হিন্দু ধর্ম ডালপালা ছড়াতে পারে এবং তাতে নতুন পাতা গজাতে পারে তা শিবাজী প্রমান করেন। তিনি নিজে গো-ব্রাহ্মন প্রতিপালক উপাধি গ্রহন করেন।" (৭৭)

আওরংগজেবের জীবদ্দশাতে মারাঠাগণ তেমন সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয় এবং মারাঠাগন প্রবল হয়ে উঠে। তারা এত শক্তি শালী হয়ে উঠে যে দিল্লীর মুঘল সম্রাট তাদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়ায়।

দিল্লীর সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগে প্রদেশগুলো নামে মাত্র দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নিয়ে স্বাধীন ভাবে চলতে থাকে। ১৭৪০ খৃঃ মির্জা মোহাম্মদ আলী যিনি পরবর্তী কালে আলি বর্দি খাঁ নামে পরিচিত হন, নবাব সরফরাজ খাঁকে পরাজিত করে বংগদেশের নবাব হন। আগে থেকেই তিনি বিহারের নায়েবের পদে নিয়োজিত ছিলেন। পরে তিনি উড়িষ্যাও নিজ রাজ্য ভুক্ত করেন।

তাঁর সময়ে মারাঠা দস্যুগণ বংগদেশের উপর পুনঃ পুনঃ হামলা চালিয়ে পশ্চিম বংগকে শ্মশানে পরিনত করেন। কিন্তু তারা গংগা

(৭৭) Dr. Padma shah's Indian National Congres and Muslims.

www.pathagar.com

পার হয়ে এর পূর্ব পারে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাতে সক্ষম হয়নি। ঐতিহাসিক সলিমুল্লাহ বলেন–"সমৃদ্ধ শালী এবং সম্ভ্রান্ত সকল পরিবার বর্গীদের হাতে তাদের মহিলাদের নির্যাতনের ভয়ে গংগার পূর্বপারে আশ্রয় গ্রহন করে।" (৭৮)।

গংগারাম নামক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরন হতে জানা যায় "ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে তাদের জানমাল নিয়ে পলায়ন করে। তারা (বর্গীরা) একদল লোককে সমতল ভূমির উপর ঘেরাও করে। তাদের কারো হাত; কারো নাক এবং কারো কান কেটে দেয় এবং অনেককে হত্যা করে। সুন্দরী তরুনীদেরকে তারা অপহরন করে। বর্গীরা জঘন্যতম কাজ সমাধা করে এসমস্ত মহিলাদেরকে ছেড়ে দেয়। সমতল ভুমিতে লুটপাট চালাবার পর তারা গ্রামে প্রবেশ করে এবং ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা চারদিকে অবাধে লুটপাট চালাতে থাকে আর টাকা দাও, টাকা দাও, বলে অনবরত চীৎকার করতে থাকে। যারা টাকা দিতে অক্ষম ছিল তাদের নাকে পানি ঢালা হত এবং এবং পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হত। ভাগিরথী পার হতে পারলেই লোকজন নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করত (৭৯)"।

বর্দ্ধমানের মহারাজার সভাপণ্ডিত ভানেশ্বর বিদ্যা রত্নালংকার বর্গীদের অত্যাচারের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি লিখেছেন "বর্গীদের মধ্যে দয়া মায়ার লেশ মাত্র ছিলনা। তাদের হত্যাযজ্ঞ থেকে গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুরাও রেহাই পেতনা। ব্রাহ্মন এবং দরিদ্রদেরকে তারা ছাড়ত না। তারা ছিল অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির। চুরি ডাকাতি এবং যে কোন দুষ্কর্ম সাধনে তারা ছিল অসাধারণ পটু। এ সমস্ত কাজে দ্রুতগামী অশ্বই ছিল তাদের প্রধান সহায়। মুখোমুখি যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখলে তারা পালিয়ে যেত।" (৮০)

---

(৭৮) History of Bengal, Vol II. Compiled by D.U.
(৭৯) ঐ
(৮০) ঐ

www.pathagar.com

প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে মারাঠা দস্যুগণ বংগদেশে যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল তা স্মরন করলে বাংগালীরা আজও ভয়ে আঁৎকে উঠে। মাতা সন্তানকে ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াবার জন্যে যে ছড়া শুনায় তা হল ঃ

"ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে।
বুল বুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে ?
ধান ফুরাল পান ফুরাল খাজনার উপায় কি ?
আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।"

আভ্যন্তরীন গোলযোগ এবং বর্গীদের আক্রমন নবাব আলীবর্দিকে তাঁর বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত রাখে। অবশেষে ১৭৫৬ খৃঃ ৮০ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শাসনকার্য নির্বাহের জন্যে কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তিনি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করেন নি। তাঁর আমলে যে সমস্ত হিন্দু উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জানকী রাম সোম, তার পুত্র দুর্লভ রাম, রাম নারায়ন, কিরাত চান্দ, উম্মিদ রায়, বিরু দত্ত, রাম রাম সিংহ এবং গোকুল চাঁদা বিশিষ্ট হিন্দু মহাজনদের সাথেও তিনি সদ্ভাব রাখতেন। কিন্তু হিন্দুরা তাঁর বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ১৭৫৪ খৃঃ কর্নেল স্কট নামক কোম্পানীর জনৈক ইঞ্জিনিয়ার মিঃ নোবল নামক তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন. "হিন্দু জমিদার এবং অভিজাত সম্প্রদায় মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। তারা মুসলিম শাসক উৎখাতের জন্যে গোপনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে (৮০)."

নবাব আলীবর্দির মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বংগদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। জগৎশ্রেষ্ঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ ইত্যাদি হিন্দু আমলা, জমিদারও ব্যবসায়ীগণ মীর জাফর আলী খাঁকে তাদের মুখপাত্র হিসাবে দাঁড় করিয়ে সিরাজকে সিংহাসন-চ্যুৎ করার জন্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ আমলাদের সাথে গোপনে আঁতাত গড়ে তোলে। ফলে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলা পরাজিত, ধৃত এবং নিহত হন। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষ-

(৮০) History of Bengal, Vol II. Compiled by D.U.

www.pathagar.com

কতায় মীর জাফর আলী মসনদে আরোহন করেন। কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে যায়। তারা যাকে ইচ্ছা তাকে নবাবের গদীতে বসিয়ে তাঁর নিকট হতে প্রচুর উপঢৌকন এবং এদেশ বাসীকে অবাধ শোষনের সুযোগ আদায় করত। মীর জাফর আলীকে লোকে ক্লাইভ এর গাধা বলে অভিহিত করত। এ দিকে বংগদেশ হতে বর্গীরা বিতাড়িত হলেও সারা ভারতে তাদের দাপট ছিল প্রচণ্ড। দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। শিবাজীর উদ্দেশ্য ছিল ভারত হতে মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে নিখাদ হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠাগণ এত দূর শক্তিশালী হয়ে উঠে যে, যে কোন সময়ে তারা দিল্লীর সম্রাটকে অপসারিত করে পেশোয়ারকে দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত করতে পারতো। তাদের এ রকমের পরিকল্পনাও ছিল। ভারতের মুসলমানদের জীবনে যখন দুর্যোগের কালো ছায়া নেমে আসে তখন সুফী সাধক শাহ ওয়ালী উল্লা দেহলভী আফগানিস্তানের শাসনকর্তা আহমদ শাহ আবদালীকে ভারতীয় মুসলমানদেরকে দুর্দশার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যে আহবান জানিয়ে নিম্নোক্তপত্র লিখেন ঃ

"সংক্ষেপে বলতে গেলে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা নিতান্তই করুন। দেশের শাসন যন্ত্র হিন্দুদের হাতের মুঠোয়, কারণ তারা পরিশ্রমী, দক্ষ এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। সম্পদ এবং সমৃদ্ধি তাদের হাতে কেন্দ্রীভূত। মুসলমানদের ভাগ্যে শুধু বিড়ম্বনা আর লাঞ্ছনা। এ সময়ে আপনিই একমাত্র দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বাদশাহ যার শত্রুদের নিপাত করার ক্ষমতা আছে। আপনার জন্যে যে কাজ করনীয় তা হল—ভারতে অভিযান চালিয়ে মারাঠাদের প্রভুত্ব খতম করা এবং দুর্বল এবং অধঃপতিত মুসলমানদেরকে মারাঠাদের কবল থেকে উদ্ধার করা। আল্লাহ না করুন যদি বিধর্মীদের প্রভুত্ব অব্যাহত থাকে তবে ইসলামী চেতনা মুসলমানদের লুপ্ত হয়ে যাবে এবং তারা এমন এক জাতিতে পরিণত হবে যে অমুসলিমদের সাথে তাদের কোন পার্থক্য থাকবেনা (৮১)।

---

(৮১) Dr. Padma Shah's the Indian National Congress and the Muslims, 1928—1947

www.pathagar.com

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর এ আহবানে সাড়া দিয়ে আহমদ শাহ আবদালী মাত্র বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ভারতে অভিযান চালান। তাঁর সাথে রোহিলা খণ্ডের নবাব নজীব উদ্দৌলা ৭০ হাজার সেনার এক বাহিনী নিয়ে যোগ দেন। নব্বই হাজার মুসলিম সেনার এই মোজাহেদ বাহিনী পানি পথ প্রান্তরে ন'লক্ষ মারাঠা সেনার মোকাবেলা করেন এবং তাদের শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। মারাঠা শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। মারাঠাদের দিল্লীর মসনদে আরোহনের এবং হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে দেব সাহিত্য কুটির কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ব পরিচয়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা হলো– "মুসলমানদের সুদীর্ঘ শাসনকালে মুসলমানদের দ্বারা ভারতের উন্নতির কোনও উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার কথা ইতিহাসে লেখা নেই। মন্দির ধ্বংস, হিন্দু পীড়ন, হিন্দু নারীকে ছলে বলে অন্তঃপুর বাসিনী করা, পাঠাগার দাহ, লুন্ঠন প্রভৃতির জন্য বিব্রত হয়ে হিন্দুরা আশা করেছিল দেশে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে ভারতে হিন্দু রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা শেষ হয়ে গেল" (৮২)।

আহমদ শাহ আবদালীর এদেশে রাজ্য বিস্তার করা উদ্দেশ্য ছিলনা। তিনি সম্রাট শাহ আলমের নিকট দিল্লীর সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে কাবুলে ফিরে যান। কিন্তু ভারতীয় মুসলিম সমাজের শক্তি ভিতর হতে নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল। বাইরে থেকে শক্তির যোগান দিয়ে একে শক্তিশালী করা সম্ভব হলো না। মারাঠীদের প্রভুত্ব খতম হল বটে কিন্তু ভারতীয় মুসলমানেরা তাদের পূর্বের শৌর্য বীর্য আর ফিরে পেলনা।

বংগদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মীর জাফরকে পদচ্যুত করে মীর কাসিমকে গদীতে বসান। মীর কাসিমের সাথে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধ বাঁধে। মীর কাসিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সাহায্য নিয়ে ইংরেজদের মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি মেজর

(৮২) দেব সাহিত্য কুটির কতৃক প্রকাশিত—বিশ্বপরিচয়।

www.pathagar.com

মনরোর নিকট তিনি পরাজিত হন। বক্সারের যুদ্ধের পর দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে বার্ষিক ২৬ লাখ টাকা দেয়ার অংগীকারে কোম্পানী বংগদেশের দেওয়ানী লাভ করে অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা পায়। তখন থেকে প্রকৃত ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে চলে যায় এবং "খালকে খোদা, মুলকে বাদশাহ, হুকুমে কোম্পানী বাহাদুর" প্রবাদ বাক্য চালু হয়, যার অর্থ হল খোদার সৃষ্টি, বাদশাহর রাজ্য কিন্তু হুকুম চলে কোম্পানী বাহাদুরের।

বাংলাদেশে মুসলমান ঃ

দিল্লী কয়েক শত বৎসর প্রবল প্রতাপশালী মুসলিম সম্রাটদের রাজধানী ছিল। মুসলিম শক্তির কেন্দ্র বিন্দু থাকা সত্বেও সেখানে মুসলমানেরা ছিল সংখ্যালঘু। কিন্তু বাংলাদেশ দিল্লী হতে বহুদূরে অবস্থিত হলেও এখানে মুসলমানেরা সংখ্যা গুরু। ঐতিহাসিকদের নিকট এটা এক বিস্ময়কর ঘটনা।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মোহাম্মদ বিন্ কাসিম সিন্দুদেশ জয় করলেও সে পথে মুসলমানেরা বেশী দুর এগুতে পারেনি, কারন সিন্দুর মরুময় অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার ছিল অর্থনৈতিক ভাবে অলাভজনক। তাই তারা এ পথ ধরে বেশীদুর অগ্রসর হননি। এরপর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে সুলতান মাহমুদ সতের বার ভারত আক্রমন করেন। প্রত্যেক বারে বিজয়ী হলেও তিনি এদেশে রাজ্য বিস্তার করেন নি। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরী তরাইনের যুদ্ধে দিল্লী ও আজমীরের রাজা পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি তাঁর ক্রীতদাস এবং সেনাপতি কুতুবুদ্দীনকে বিজিত সাম্রাজ্য দান করে স্বদেশে ফিরে যান।

কুতুবুদ্দীনের আমলে ১২০৩ খৃঃ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিল্‌জী সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মন সেনকে পরাজিত করে নদীয়া বা নবদ্বীপ অধিকার করেন এবং পরে গৌড় বা লক্ষ্মনাবতী অধিকার করেন। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আরও উল্লেখ করা হয়েছে বখতিয়ার খিলজীর বংগ বিজয়ের বহু পূর্ব হতেই আরবদের বাংলাদেশের সাথে পরিচয় ছিল। আরবদের বাণিজ্য পোত এডেন হতে সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত যাতায়াত করত। ভারত মহাসাগর এবং চীন সাগরের বাণিজ্য পথ ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার ছিল আরব বণিকদের।

ভৌগলিক খোরদাদবেহ আল ইদ্রিসী "সমন্দর" নামে যে দেশের বর্ণনা দিয়েছেন বাংলাদেশের সাথে তার মিল রয়েছে। ৮৫১ খৃঃ আরব বণিক সোলাইমানের লিখিত বিবরনে রাহমী নামক স্থানের উল্লেখ রয়েছে। রলিফ ফিচ ১৫৮৫-৮৬ সালে এদেশ ভ্রমন করেন। তাঁর বিবরন হতে জানা যায় যে চাটগাঁও এবং আরাকান রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানকে রামু বলা হতো। আরবদের রাহিমী এবং রালফ-ফিচের রামু একই স্থান। মেঘনার মোহনা হতে কস্ত্রা রাজার পর্যন্ত উপকূল এলাকা আরব বনিকদের উপনিবেশে পরিনত হয়। আরাকান রাজ্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সুলতায়ং সানদায়া নামক রাজা ৯৫২ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন এবং তিনি বংগের সুরাতনকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন এবং সেটটা গংগে একটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। সেট্টাগং বর্তমানে চিটাগং নামে পরিচিত। ডঃ এনামুল হকের মতে সুরাতন বলতে আরাকানীরা সুলতানকে বুঝিয়েছে। এ বিবরন থেকে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হল মেঘনার মোহনা হতে নাফ নদী পযন্ত একটি মুসলিম রাজ্য ছিল যার শাসককে সুলতান বলা হতো। ইবনে বতুতার বিবরন এবং আবুল ফজলের লিখিত ইতিহাস হতে জানা যায় যে চিটাগাং গংগার মোহনার অনতিদূরে ছিল। তাই এ স্থানকে "শাত আল গংগা" (গংগার প্রান্তে বদ্বীপ) বলা হত। সাত আল গংগা নাম হতে বুঝা যায় যে আরবদের সাথে এ স্থানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাই বক্তিয়ার খিলজীর বংগ বিজয়ের বহু পূর্বে হতেই বাংলাদেশে যে ইসলাম প্রচারের কাজ চলেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ইসলাম প্রসারের সাথে মুসলিমদের ছোঁয়াচ এড়াতে গিয়ে

www.pathagar.com

কুলীন হিন্দুরা যে বিপাকে পড়ে ছিল তা রামায়নের বঙ্গানুবাদক কৃত্তিবাস ওঝার বিবরন হতে বুঝা যায়। কৃত্তিবাস ওঝা বলেন—

"পূর্বেতে আছিল শ্রী দনুজ মহারাজা
তার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা ।।
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মনের অধিকার
রংগে ভোগে ভুজে তিহ সুখের সংসার
বংগ দেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির
বংগদেশ ছাড়ি ওরা আইল গংগা তীর (৮৩)।"

দনুজ মর্দন সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের সময়ে সোনার গাঁয়ের অধিপতি ছিলেন। কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা তাঁর সভাসদ ছিলেন। বলবনের সময় সোনার গাঁওতে মুসলমানদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও ইসলামের প্রসার বেড়ে চলে ছিল। তাই নর সিংহ ওঝা মুসলমানদের সংস্পর্শ এড়াবার জন্যে পূর্ববাংলা ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নেন।

বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়কে দুভাগে ভাগ করা চলে— বহিরাগত মুসলমান এবং স্থানীয় মুসলমান। বহিরাগত মুসলমানেরা সৈনিক, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং ধর্ম প্রচারক হিসাবে এদেশে আগমন করেন এবং স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন।

স্থানীয় মুসলমানগন মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে ইসলাম কবুল করেন। এদেশে যখন মুসলমানেরা আসে তখন ব্রাহ্মন্যবাদীদের একনিষ্ঠ সেবক সেন রাজাদের নির্যাতনের চাকার তলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা পিষ্ট হচ্ছিল। তাই তারা ব্রাহ্মন্যবাদীদের নির্যাতনের কবল হতে রেহাই পাবার জন্যে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহন করে।

---

(৮৩) Dr. Abdur Rahman's the Social Cultural History of Bengal, Vol

www.pathagar.com

ব্রাহ্মনদের প্রভুত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ধর্মে অব্রাহ্মনেরা মানবেতর জীবন যাপন করত। কোন ধর্মীয় আচরন বিধি পালন করার অধিকার তাদের ছিল না। তাদের ধর্ম ছিল ব্রাহ্মনদের সেবা করা। ব্রাহ্মনদের সেবা করে তাদের আশীর্বাদপুষ্ট হতে পারলে পরবর্তী জন্মে উন্নতমানের জীবনের অধিকারী হতে পারবে বলে যারা বিশ্বাস করতো তারা সামাজিক জীবনে গ্লানির ঘানি টেনে চলতে থাকল। বস্তুতঃ বৈদিক ধর্ম ব্রাহ্মন-ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই কেবল আবেদন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। সাধারন জনগন বৈদিক ধর্মে কোন উৎসাহ বোধ করেনি। স্থানীয় জনসাধারন তাদের নিজস্ব ধর্ম মতে স্থির থাকে। পরে অনেকে নানাবিধ কারনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু মুসলমানদের আগমন কালে হিন্দু ধর্মের পূনর্জীবনের প্রচেষ্টা এবং সে কারনে ধর্মীয় নির্যাতন বেড়ে যায়। এহেন অবস্থায় অনেকে ইসলামের মানবীয় মর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব বোধ এবং সাম্য নীতিতে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করে। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত সুফী দরবেশগন এদেশে আগমন করেছিলেন তাদের উন্নত মানের চরিত্র, জনগনের প্রতি তাদের দরদ অনেক উচ্চ বর্ণের হিন্দুদেরকে ইসলাম গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ইসলামের প্রসারে ভীত হয়ে বর্ণ হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় বিধি নিষেধ আরো বেশী কড়াকড়ি করে যাতে হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে মেলা মেশা না করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুসলমানদের হাতের মুঠোয় থাকাতে চাকুরী বাকুরী ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে অনেক সময় তাদের মুসলিম শাসকদের মুখাপেক্ষী হতে হতো। মুসলমানদের সাথে যারা মেলা মেশা করত বর্ণ হিন্দুরা তাদেরকে সমাজচ্যুত করত। ফলে অনেক ব্রাহ্মন কায়স্থ ও মুসলমান হতে বাধ্য হতো।

সিংগটিয়ার জমিদার কামাল উদ্দিন চৌধুরী এবং জামাল উদ্দিন চৌধুরী মূলতঃ ব্রাহ্মন ছিলেন। মুসলমানদের সাথে হৃদ্যতা থাকার কারনে তারা বর্ণ হিন্দু কর্তৃক সমাজচ্যুত হন এবং উপায়ান্তর না দেখে তাঁরা পীর আলীর নিকট মুসলমান হন। মুসলিম শাসনামলে বংগ-

www.pathagar.com

দেশের মুসলমানগণ সংখ্যাগুরু ছিলনা। ১৮৭২ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১৬ লাখ আর হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ১৭ লাখ। কিন্তু ১৯১১ সালের আদমশুমারীতে মুসলমানদের সংখ্যা ২৪ লাখে দাঁড়ায় আর হিন্দুদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯ লাখে (৮৪)। তাই কোন মতেই বলা চলে না যে এক হাতে কুরআন এবং অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে এদেশে ইসলাম প্রচার করা হয়েছে। এফ, বি-ব্রাড্‌লী বার্ট তাঁর "রোমান্স অন এ্যান ইস্টার্ণ ক্যাপিটাল" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে বলেন— " ... ... মুসলমানদের দ্বারা পূর্ব বংগ বিজিত হওয়ার পর থেকে মুসলমান শাসকগণ হিন্দুদের পূজা-পার্বণ বা ধর্ম বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ বা ধর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন নি। হিন্দুদের মন্দির মুসলমানদের মসজিদের পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও সে গুলোর কোন ক্ষতি সাধিত হয়নি। পূর্ব বাংলার দীর্ঘ দিনের ভাংগা গড়ার ইতিহাসে ব্যাপক কোন ধর্মীয় নির্যাতন অনুষ্ঠিত হয়নি। এই প্রদেশ বরাবরই এই অভিশাপ থেকে মুক্ত থেকে গেছে" (৮৫)।

হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক বিয়ের প্রচলন রয়েছে। তবে মুসলমানেরা এক সাথে চারটির অধিক বিয়ে করতে পারে না। কৌলীন্য প্রথার কারনে কুলীন হিন্দু মেয়ের জন্যে কুলীন জামাতার প্রয়োজন হতো। অকুলীনের হাতে মেয়ে সম্প্রদান করলে পিতাকে সমাজচ্যুত হতে হতো। কুলীন জামাতা যোগাড় করা খুবই দুরূহ ব্যাপার ছিল। তাই কোন কোন কুলীন পুরুষ এমনকি শতাধিক পর্যন্ত বিবাহ করতো। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীদের অনেকেই থাকত বালিকা এবং স্বামী বৃদ্ধ। বিয়ের দু'এক বৎসর পর হয়তো স্বামী মারা যেত এবং এ সমস্ত শতশত বালিকা বধূদের আজীবন বিধবা থাকতে হতো। তাই অমুসলিমদের আমলে ও মুসলমানদের অনুপাতে হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি।

---

(৮৪) Dr. Abdur Rahim—The Social and Cultural History of Bengal. Vol 2

(৮৫) রহিমুদ্দিন সিদ্দিকী কর্তৃক অনূদিত ও বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত রোমান্স অব এ্যান ইস্টার্ণ ক্যাপিটাল পুস্তক দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় মুসলিমদের অবদান ঃ

মুসলিম বিজয় বংগ দেশে বাংলা ভাষার পরিচর্যার সুযোগ এনে দেয়। বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশে মুসলমানদের অবদান হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশী। মুসলিম সুলতানগনের আমলে বাংলা ভাষা ভাষী অঞ্চল একত্রিত হয়। সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ গৌড়, সোনারগাঁও এবং সাত গাঁওকে ঐক্যবদ্ধ করেন, যা'র ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং বাংলা ভাষা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিলাভ করতে থাকে। ডঃ আবদুর রহিম তাঁর বাংলাদেশের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মত প্রকাশ করেছেন যে "বাংলাদেশে বিজয়ী মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে ইতিহাসের পাতায় বাংলা ভাষা এবং বাংগালী জাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না। সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক গৌড়ীয় হিন্দু সমাজের অবজ্ঞা এবং বৈরীতার কারণে বাংলা ভাষা অবহেলিত থাকত এবং বর্তমানে মর্যাদার যে উঁচু আসনে আসীন তাতে সমাসীন হতে পারত না। প্রকৃত পক্ষে মুসলিম শাসকরা বাংগালীদেরকে শুধু রাজনৈতিক ভাবেই ঐক্যবদ্ধ করেনি, তারা বাংলা ভাষা এবং বাংগালী সংস্কৃতির উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রও প্রস্তুত করে গিয়েছেন।" (৮৬)। বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মুসলিম সুলতানদের প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে বংগদেশের হিন্দু রাজাগণ যদি তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারতেন তবে বাংলা ভাষা কোনদিনই রাজ দরবারে প্রবেশ করতে পারত না। মুসলিম শাসক এবং অভিজাত সম্প্রদায় বাংলা ভাষার প্রতি যখন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে থাকে তখন হিন্দু সমাজপতি এবং জমিদারগণও এর পৃষ্ঠ-পোষকতা করতে থাকেন।

মুসলমানদের বংগবিজয় সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া হয় সুদূরপ্রসারী।

---

(৮৬) Dr Abdur Rahim the Social Cultural History of Bengal, Vo IIX

www.pathagar.com

হিন্দু আমলে শিক্ষা, সংস্কৃতি এর ধর্ম সকল কিছুর ভিত্তি ছিল সংস্কৃত ভাষা আর সংস্কৃত ভাষা শেখার অধিকার শুধু ব্রাহ্মনদেরই ছিল। দেশের বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের জন্যে লেখা পড়ার দুয়ার ছিল রুদ্ধ এবং জনগণের মুখের ভাষা বাংলা ভাষা ছিল অবহেলিত ও ঘৃণিত। মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্রাহ্মনদের একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হয় এবং সংস্কৃত ভাষার প্রভাবও খর্ব হয়। বাংলা-ভাষা রাজ দরবারে ও সমাজে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিবর্তন কায়স্থদের প্রতিভা স্ফুরনের সুযোগ এনে দেয় এবং তাদের মানষিক উৎকর্ষতা সাধনে সহায়তা করে। এর ফলে তারা সমাজে সমৃদ্ধি এবং মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলমান শাসনামলে অব্রাহ্মনদের উপর ব্রাহ্মনদের প্রভুত্ব রহিত হয়ে যায়। তাই তারা ব্রাহ্মনদের কোপানল থেকে মুক্ত হয়ে বাংলা ভাষায় রচিত স্বীয় ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ থেকে সম্যক জ্ঞান লাভের সুযোগ পায়। উদার চেতা মুসলমানদের অনুপ্রেরণার ফলে হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থ রামায়ন, মহা-ভারতের বংগানুবাদ হয়। ফলে নীচু জাতীয় হিন্দু সমেত সকল শ্রেণীর হিন্দুরই তাদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের সাথে পরিচয় লাভের সুযোগ হয়।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বংগদেশের অধিবাসীদের মুখের ভাষা ছিল গৌড়ীয় প্রকৃত ভাষা। কিছু কিছু বৌদ্ধ শ্রমন গৌড়ীয় প্রাকৃত ভাষায় ধর্ম বিষয়ক চর্যাপদ রচনা করতেন। এ চর্যাপদ হতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি।

মুসলিম বিজয়ী বহিরাগত মুসলমানগণ এদেশকে স্থায়ী আবাস হিসেবে গ্রহণ করে। তাই তারা জনসাথারনের মুখের ভাষার উৎকর্ষতা সাধনে মনযোগী হন যাতে তাদের সাথে ভাবের বিনিময় চলে এবং হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। তা ছাড়া মুসলিম সুফী দরবেশগণ ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে এদেশের জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই তারা বালা ভাষা আয়ত্বে আনতে এবং এর উন্নতি বিধানে প্রয়াসী হন।

www.pathagar.com

গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের অনুপ্রেরনায় শাহ মোহাম্মদ সগীর বাংলা ভাষায় "ইউসুফ জোলায়খা" নামক কাব্য রচনা করেন। মুসলিম শাসন কৃত্তিবাসকে রামায়ন বাংলায় অনুবাদ করতে উৎসাহিত করে। সুলতান সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের অনুপ্রেরনায় মালাধর বসু ভগবতের বাংলানুবাদ করেন এবং শ্রী কৃষ্ণ বিজয় নামে একটি কাব্য প্রনয়ন করেন। হোসেন শাহের সভাসদ যশোরাজ খাঁ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য রচনা করেন। একই সময়ে বিপ্র দাস এবং বিজয় গুপ্ত মথাক্রমে মনসা মংগল এবং মনসা বিজয় কাব্য প্রনয়ন করেন। হোসেন শাহ কর্তৃক নিয়োজিত চাটগাঁয়ের শাসন কর্তা পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বর ভদ্রকে দিয়ে মহাভারতের বাংলানুবাদ করান। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ'র নির্দেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের বাংলানুবাদ করেন। কবি শেখর যিনি নাকি বিদ্যাপতি নামে পরিচিত ছিলেন তিনি হোসেন শাহ্ এবং নসরৎ শাহের অধীনে চাকুরী করতেন। তিনি তাঁর রচনায় হোসেন শাহ এবং নসরৎ শাহের উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করেছেন। নসরৎ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহের অনুপ্রেরনায় শ্রীধর বিদ্যাসুন্দর নামক মহা-কাব্য রচনা করেন। মুসলিম শাসকগনের প্রচেষ্টার ফলে অব্রাহ্মন হিন্দুরা তাদের ধর্ম গ্রন্থ ভাগবত, মহাভারত এবং রামায়নের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পায়।

মুসলিম কবিও সাহিত্যিকগণও ইসলামকে ভিত্তি করে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের আমলে শাহ মোহাম্মদ সগীর "ইউসুফ জোলায়খা" নামক কাব্য রচনা করেন। সারিবিদ খাঁ" হানিফাও কয়রা পরী," দোনাগাজী "সয়ফুল মুলুক" এবং দৌলত উজীর বাহরাম "লায়লা মজনু" ফারসী ভাষা হতে বাংলায় অনুবাদ করেন। মুসলিম শাসকগণ বাংলা ভাষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুসলিম সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচিত সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করতেন আরবী ও ফারসী সাহিত্য হতে। তাই তাঁরা স্বভাবতঃ ই তাঁদের সাহিত্যিক কর্মে প্রচুর আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহার করে একে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এ সমস্ত শব্দ ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুসলিম সাহিত্যিকগণের সাহিত্যকর্মে

www.pathagar.com

কোরআন, কিতাব, আলেম, ফাজেল, রাসুলে খোদা, নূরে মোহাম্মদী, সওয়াল-জওয়াব, তাজ তলোয়ার, সজাব, গুনাহ, মাফ, নেকী, বদী ইত্যাদি আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায়। আরবী এবং ফার্সী শব্দের প্রচুর ব্যবহারের উদাহরণ স্বরূপ ফিরোজ শাহের আমলে আফজাল আলী কর্তৃক রচিত নসিহত নামা হতে একটি উদাহরণ পেশ করা হলো ঃ

গায়েবী মর্তবা প্রভু তাহানে যে দিলা
গায়েবের ভেদ যত কহিতে লাগিলা
গায়েবী ফকির বলি দেশ দেশান্তর
তজবিজ করিলা কাদি তার পাশে নিয়া
উপাস্য করে বলি মুনাফিকগণ
আয়েত হাদিস লেখিয়াছি তেকারণ
খোয়াব বলিয়া শাহ রুস্তম কহিলা
ওয়ালীগণ প্রনামী পুনি পুনি
ভবে ডুবি যে বা পারে ছাড়ে কুফরানী
খোয়ব যে নছিহত নামা তার নাম।"

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিরাট অংগ জুড়ে রয়েছে পুঁথি সাহিত্য। পুঁথি সাহিত্যে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দই আরবী ও ফারসী শব্দ হতে সংগৃহীত। এ ছাড়া এমনকি হিন্দু কবিগণও তাঁদের বিজয় কাব্য এবং মংগল কাব্য রচনায় প্রচুর আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহার করতেন। বিজয় গুপ্তের মনসা মংগল কাব্যে রয়েছে—

"পাতে পাতে লিখে উসুল বাকী" অর্থাৎ পৃষ্ঠার পৃষ্ঠায়।
"অনাদায় পাওনা আদায়ের কথা লিখে"

আবার

"চান্দের নফর ধনা জানে নানা ফন্দি
আপনি দিয়াছেন আশ ইনাম আমাদের দিবাখাসা"
অর্থাৎ চাঁদের ভৃত্য ধনা নানা রকম কুট কৌশল জানে

www.pathagar.com

আপনি আমাদের অনেক পুরস্কার দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

"তাকাই মোল্লা কিতাব ভাল জানে
কাজীর মেজবান (মেহমান) হইলে আগে তারে আনে
কাছা খুলিয়া মোল্লা ফরমায় অনেক ."

মুকুন্দরাম তাঁর চন্ডি কাব্যে লিখেছেন—

"বাড়ী বাড়ী গুনি দিয়া কর্জে ফরাক হইয়া
খারিজ করিব বাড়ী ঘর।"

ব্যাধ রাজা কালকেতুর নিকট ভীরুদত্ত তহশীলদারের চাকুরী প্রার্থী হয়। তাকে চাকুরীতে নিয়োগ করলে সে প্রজাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের সম্পদের তালিকা প্রনয়ন করবে। এরূপ করা হলে পর দেখা যাবে যে তাদের নিকট খাজনা বাকী রয়েছে এবং বাকী খাজনার দায়ে সে তাদেরকে বাড়ী ঘর হতে উৎখাত করবে।

মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনার বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ছিল মানবীয় কর্মকাণ্ড এবং তাদের প্রেম-বিরহ, জয়-পরাজয় ইত্যাদি। তাঁরা তাঁদের মহাপুরুষদের জীবন বৃত্তান্ত, বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী নিয়েও বিজয় কাব্য রচনা করেছেন। ইউসুফ সাহেব সভাকবি জৈনুদ্দীন 'রসুল বিজয়' এবং শেখ ফয়জুল্লাহ্ 'গাজী বিজয়' নামক কাব্য রচনা করেছিলেন। মুসলমান কবিরা অনেকে গুরু অর্থ সম্বলিত পদাবলীও রচনা করেছেন।

হিন্দু সাহিত্যিকদের রচনার বিষয় বস্তু ছিল দেবতাদের লীলা খেলা কেন্দ্রিক।

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের উপর মুসলিম শাসনের প্রতিক্রিয়া :

জ্ঞাননুশীলনের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের জ্ঞানান্বেষনের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনে। মুসলিম পূর্ব যুগে জ্ঞানচর্চার এক চেটিয়া অধিকার ছিল ব্রাহ্মনদের। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা এ অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। ব্রাহ্মন ছাড়া আর কেউ শাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী হতে পারতনা। মুসলমান ধর্মের সংস্পর্শে এসে শ্রী চৈতন্যদেব উপলব্ধি

www.pathagar.com

করতে পেরেছিলেন যে ব্রাহ্মন্যবাদীদের সংকীর্ণতা হিন্দু ধর্মকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই তিনি উচ্চ নিম্ন বর্ণ নির্বিশেষে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সম অধিকারের বানী প্রচার করেন। শ্রী কৃষ্ণ কর্তৃক প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রী কৃষ্ণের নাম জপ করত। এতে ব্রাহ্মনগণ ক্রুদ্ধ হয়ে কাজীর নিকট নালিশ করেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল শ্রী চৈতন্যদেব হিন্দু ধর্মের সর্বনাশ করছেন। তিনি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের কে ধর্মের নামে উত্তেজিত করছেন। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা পুনঃ পুনঃ শ্রী কৃষ্ণের নাম 'যপ' করলে যে পাপ হবে তাতে নবদ্বীপ ধ্বংস হয়ে যাবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম 'যপ' করলে যে পাপ হবে তা নবদ্বীপকে ধ্বংস করে ছাড়বে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের নাম যদি সবাই উচ্চারন করে তবে তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে এবং তাতে কোন ফল হবে না। চৈতন্য চরিতামৃতে ব্রাহ্মনদের অভিযোগের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা হল ঃ-

'হিন্দু ধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারী।
কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বার বার।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রী চৈতন্যদের তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে ভোর রাত্রে বাদ্য যন্ত্র সহকারে নগর সংকীর্তনে বের হতেন। এতে ব্রাহ্মনেরা কাজীর নিকট নালিশ জানায় যে শ্রী চৈতন্যের নগর সংকীর্তনে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। কাজী তাকে নগর সংকীর্তন করতে নিষেধ করলে পর শ্রী চৈতন্য তার বাড়ী পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেন।

মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা নিম্ন বর্ণের হিন্দুদেরকে বর্ণ হিন্দুদের জোর জুলুম থেকে রেহাই দেয় এবং তাদেরকে একই মর্যাদায় বিভূষিত করে। মানিক চন্দ্র রাজার গান হতে জানা যায় যে হদীস এবং পোদ নামক নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা মুসলিম আমলে এত দূর লেখা পড়া শিখেছিল যে তারা দলীল দস্তবেজ লিখতে ও পড়তে পারত। এমনকি নাপিত ঝাড়ুদারদের মধ্যে ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিল। কর্চা নামক গ্রন্থের প্রনেতা গোবিন্দ দাস পেশায় একজন কর্মকার ছিলেন। মধু

www.pathagar.com

সুদন নাপিত মহাভারতে বর্ণিত নল-দময়ন্তির উপাখ্যান নিয়ে কাব্য রচনা করে ছিলেন। নাম থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি একজন ক্ষৌরকার ছিলেন। ভাগমন্ত ধূপী হরি বংশ প্রণয়ন করে অমর হয়ে রয়েছেন। শ্রীমাঝি কাইভ, গংগাদেশ সেন, কালী চরন গোপ, রাম প্রসাদ দেও, রাম দত্ত আরো অনেকে উচ্চ শিক্ষালাভ করে বাংলা ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করেছেন।

এসময়ে এমনকি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মহিলারাও যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিতা ছিলেন। চণ্ডালিকা গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বাধ রমনীগণ যেমন ফুল্লরা; খুল্লনা, বিপুলা এবং রাজু দেবীর হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। এক মালীর স্ত্রী হিসাবের খাতা লিখতে সক্ষম ছিল (৮৭)।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বল্লাল সেন যে পাঁচজন ব্রাহ্মন কনৌজ হতে এনেছিলেন তাঁদের সাথে ঘোষ, বোস, গুহ, মিত্র এবং দত্ত খেতাবধারী পাঁচ জন ভৃত্য এসেছিল। ঘোষ, বোস, গুহ এবং মিত্র নিজেদেরকে ব্রাহ্মনদের ভৃত্য হিসাবে স্বীকার করায় তাদের কৌলীন্য দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পুরোষত্তম দত্ত ব্রাহ্মন দক্ষের ভৃত্য হিসাবে পরিচয় না দেয়ায় কৌলীন্য হতে বঞ্চিত হলো। এরাই পরে কায়স্থ নামে পরিচিতি লাভ করে। যদি বংগদেশে মুসলিম শাসনের প্রবর্তন না হত তবে হয়তো তারা ব্রাহ্মনদের আজ্ঞাবাহী একটি শ্রেণী হিসাব চিরস্থায়ী হয়ে থাকত। কিন্তু মুসলিম বিজয় তাদের ব্রাহ্মনদের প্রভুত্বের কবল থেকে মুক্তি দেয়। তারা লেখা পড়া শিখে মুসলিম সরকারের অধীনে বিভিন্ন সম্মানজনক পদে নিয়োগ লাভ করে। ফলে তারা হিন্দু সমাজে অপেক্ষাকৃত উঁচু স্তরে আসন করে নিতে সক্ষম হয়।

কায়স্থ শব্দের অর্থ লিখক (Scribe)। মুসলিম শাসনামলে যে কাজে লেখা পড়ার প্রয়োজন হতো সে পদে তারা নিয়োগ লাভ করত। বর্ণবাদী আর্য সমাজে যে শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে তাতে কায়স্থদেব কোন

(৮৭) Dr: Abdul Rahim--The Social and Cultural History of Bengal Vol, 2

www.pathagar.com

স্থান নেই। বংগদেশে আর্যগণ বিজয়ীরবেশে আসতে পারেনি তাই ভারতের অন্যান্য স্থানে কায়স্থ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব না থাকলেও বাংলা-দেশে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়গনের পরিবর্তে বর্ণ হিন্দুদের স্তরে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলমানদের উপর পলাশী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ঃ

পলাশী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বংগদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়-দ্বয়ের মধ্যে শুধু বিভিন্নভাবেই প্রতিফলিত হয়নি বরং তা ছিল পুরোপুরি বিপরীতমুখী। পলাশীর যুদ্ধের পর মুসলমানেরা চিহ্নিত হয় পরাজিত শত্রু হিসাবে। বিজেতা এবং বিজিতগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ন হয়ে থাকে। তাই বিজয়ী ইংরেজগণ বিজিত মুসলমানদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধ্বংস এবং সামাজিক ক্ষেত্রে হেয় প্রতিপন্ন করার সকল রকম পদক্ষেপ গ্রহন করে।

অপরদিকে হিন্দুদের জন্যে পলাশীর যুদ্ধছিল প্রভুবদলের পালা মাত্র। হিন্দুরা মুসলিম শাসন উৎখাত করে হিন্দু রাজ কায়েমের যে স্বপ্ন দেখে ছিল তা পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে মিলিয়ে যাওয়াতে তারা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহন করে এবং পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ের জন্যে সব রকমের সাহায্য ও সহযোগীতা করে। তাই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী হিন্দু সম্প্রদায়ের আনুগত্য ও সক্রিয় সহায়তায় এদেশে নিজেদের শাসন ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার প্রয়াশ পায়। এখানে হিন্দু সম্প্রদায় বলতে মূলতঃ বহিরাগত আর্যগোষ্ঠিভুক্তদেরকে বুঝতে হবে। এদেশের আদি অধিবাসী যে সমস্ত অনার্য বর্ণ হিন্দুদের অধীনতা স্বীকার করে শুদ্রত্ব গ্রহন করেছিল তারা বর্ণাশ্রয়ী হিন্দু সমাজের এত পেছনের কাতারে পড়েছিল যে ইংরেজ আমলেও সামনের কাতারে স্থান করে নিয়ে সরকারের বিলানো হালুয়া রুটিতে ভাগ বসানোর সাধ্য তাদের ছিলনা।

স্বাধীন বাংলার প্রথম অর্থ সচিব ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক তার "বৃটিশ পলিসি এন্ড দি মুসলিমস ইন বেংগল (১৭৫৭—১৮৫৭) "বইতে যা বলেছেন তা অনুবাদ করলে অর্থ দাঁড়ায়—"মুঘল সাম্রাজ্য যতই

www.pathagar.com

দুর্বল হতে থাকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পুণর্জাগরণ এবং মুসলিম বিদ্বেষ ততই প্রবল আকার ধারণ করে। ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে ইউরোপীয়দের আগমণ হিন্দুদের এই মুসলিম বিদ্বেষ কার্যকরী করার পথ প্রশস্ত করে দেয়। মারাঠা বর্গীদের হামলার মুখে কিছু কিছু হিন্দু আলিবর্দী খাঁ এর সাথে সহযোগিতা করে ছিল এ কথা সত্য, কিন্তু এ রকমের সহযোগীতা ছিল সাময়িক। মারাঠা বর্গীদের লুণ্ঠত-রাজের হাত হতে নিজেদের ধন সম্পদ রক্ষা করার জন্যে বর্গী বিরোধী যে কোন সরকারের সাথেই তারা সহযোগীতা করত। কিন্তু সিরাজ-দ্দৌলার আমলে সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে হিন্দুদের এ আনুগত্য চলে যায় এবং প্রায় সকল হিন্দুই ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করে। নবাব বিঘোষিত মৃত্যু দন্ড দেশ অগ্রাহ্য করে হিন্দু জমিদার নব কিষেন রায় ফলতায় আশ্রয় গ্রহনকারী ইংরেজদেরকে খাদ্য দ্রব্যাদি পাঠান। হিন্দু-দের সাথে আঁতাত করে ইংরেজরা মুসলিম নবাবের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়। এমনকি নবাব মীর জাফরের সাথে কতিপয় শীর্ষ স্থানীয় হিন্দুর সম্পর্কের অবনতি ঘটানে ইংরেজদের হস্তক্ষেপের ফলে তাঁরা নবাবের রোষানল থেকে বেঁচে যান। সেতাব রায় ইংরেজদের প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। তাঁর ছেলে কল্যাণ সিং, মহারাজা বেনী বাহাদুর এবং রায় সুধারাম ইংরেজদের পক্ষে দিল্লী এবং অযোধ্যার রাজদরবারে প্রচার কায চালিয়ে ছিলেন যার ফলে কোম্পানীর পক্ষে দেওয়ানী লাভ সম্ভবপর হয়েছিল। তাই প্রথম থেকেই যাঁরা ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু অথবা লেজুড় ছিলেন (৮৮)।"

ইংরেজরা তাদের অধিকার হরন করেছে; মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে এবং পদাণত রেখেছে মনে করে মুসলমানেরা ইংরেজদের শত্রু হিসাবে গন্য করতে থাকে এবং ইংরেজ বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। এ কথা সত্য যে বক্সারের যুদ্ধের পরাজয় মুসলিম সম্প্রদায়ের

(৮৮) Dr. Azizur Rahman Mallick, The British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1857),

www.pathagar.com

মেরুদন্ড ভেংগে দিয়েছিল এবং তারা পুনরায় ব্যাপকভাবে সুসংগঠিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু তাদের ইংরেজ বিরোধী কার্যকলাপে ভাটা পড়েনি। তবে এ সমস্ত সংগ্রাম ছিল অঞ্চল বিশেষে সীমিত এবং অনুল্লেখ যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষকারীদের যাঁরা নেতৃত্ব দান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ফকির মজনু শাহের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মজনু শাহের প্রকৃত নাম জানা যায়নি। তিনি ছিলেন বুরহানা সম্প্রদায় ভুক্ত একজন সুফী দরবেশ। তাঁর জন্ম পাঞ্জাবের অন্তর্গত মেওয়াট নামক স্থানে। সুফীগন নানা দেশ ঘুরে বেড়ান। মুসলিম শাসনামলে তিনি বংগদেশে আগমন করেন এবং অনেকে তাঁর মুরীদ হয়। তাই তিনি এদেশেই থেকে যান। পলাশীর যুদ্ধের পর মজনু শাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদে লিপ্ত হন। ১৭৭১ খৃঃ মজনু শাহ ঘোড়া ঘাট এবং গোবিন্দ গঞ্জের পথে একদল কোম্পানী সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং পরাজিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে শতাধিক আহত অনুসারীসহ মস্তানগড়ের (মহাস্থান গড়) দিকে অগ্রসর হন।

১৭৭২ খৃঃ মজনু শাহ তার অনুসারীদেরকে অস্ত্রসজ্জিত করেন এবং উত্তর বংগে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তিনি কোম্পানীর আদায়কৃত অর্থ নিয়ে যান এবং পরগনার কাচারী ও দখল করে রাখেন। ফকীর দল ছিল তলোয়ার, বর্শা, গাঁদা-বন্দুক এবং কামান সজ্জিত।

১৭৭৬ সালে পুনরায় উত্তর বংগের বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুরে ফকীরদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে বগুড়া জেলার কোম্পানীর সুপারভাইজার প্লাড উইনের লিখিত বিবরন হতে মজনু শাহের সাথে কোম্পানীর প্রেরিত বাহিনীর এক সংঘর্ষের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন" প্রায় আধ ঘন্টা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এ ফকির দল স্থান ত্যাগ করে। তাদের নেতা মজনু শাহ ও অশ্ব পৃষ্ঠে পলায়নে সমর্থ হয় (৮৯)।

(৮৯) রতন লাল চক্রবর্তী—ফকীর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ,

www.pathagar.com

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে আলাপ সিংহ পরগনায় ফকীরদের আক্রমন তীব্র আকার ধারন করে। এ পরগনার অন্তর্গত পুখরিয়া নামক স্থানে মজনুর ফকীর দলের সাথে কোম্পানীর সৈন্য দলের এক বিরোধ বাধে এবং মজনু শাহ পরাজিত হয়ে মধুপুরের জংগলের দিকে পালিয়ে যান। ১৭৮৫ সালে মজনুর সাথে কোম্পানীর সৈন্য দলের আর একবার বিরোধ বাধে এবং মজনু পুনরায় পরাজিত হন।

পরবর্তী বছর ফকীর দল দু'দলে বিভক্ত হয়ে তাদের বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। মজনুশাহের নেতৃত্বে মোমেন শাহী অঞ্চলে এবং মুসা শাহের নেতৃত্বে উত্তর বংগে তারা কোম্পানী বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। ১৭৮৬ সালে মজনু শাহের সাথে কোম্পানীর সৈন্য দলের পরপর দু'টি মারাত্মক সংঘর্ষ হয়। ফলে শ্বরের যুদ্ধে মজনু শাহ বহু সংখ্যক অনুচর হারান। তাঁর আহত অনুচরদের একাংশকে "ডুলি" যোগে মেওয়াটে নিয়ে যাওরা হয়। এর পর তিনি আর কোন অভিযান পরিচালনা করেননি। সম্ভবতঃ ১৭৮৭ সালে কানপুর জেলার মাখনপুরে মজনু শাহ এন্তেকাল করেন। মজনু শাহের উত্তরাধিকারীদের নাম ছিল মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ, সোবহান শাহ, মাদার বক্স, জরিশাহ, করিম শাহ।

উঠতি পুঁজিপতি বেনিয়া যেমন—কান্ত বাবু, দেবী সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, রাম কান্ত রায়, দুলাল রায়, জয়নারায়ন ঘোষালের দল ফকীরদের বিরোধীতা করেন, অন্যদিকে বাংলার জনসাধারণ ফকিরদের সাথে সহযোগীতা করে।

মজনু শাহের স্বাধীনতা সংগ্রাম যতটা শক্তি শালী অপরাপর সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গুলো ততটা প্রবলতা লাভ করতে পারেনি। এগুলো সীমিত এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে সিলেটের ধর্মীয় নেতা মীর্জা আগা মুহাম্মদ রেজা বেগ কোম্পানীর শাসনকে 'শয়তানের শাসন' বলে ফতোয়া জারী করেন এবং ফিরিংগী হুকুমত ধ্বংস করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্যে জেহাদ ঘোষনা করেন। জেহাদের প্রচার পত্রে তিনি বলেন "তোমরা জান যে, ফিরিংগী

www.pathagar.com

শাসনের সময় সীমা মাত্র চল্লিশ বৎসরের জন্য ছিল এবং তা ফুরিয়ে গিয়েছে। আল্লার অনুগত বান্দা এবং রাসুলের অনুসারীদের বিজয় সন্নিকট। আমার প্রতি যদি তোমাদের আস্থা থাকে তবে তোমরা ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে নেমে পড় এবং বিধর্মীদেরকে হত্যা করে গর্তে পুঁতে ফেল ৯০।"

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বলাকী শাহ নামক এক স্থানীয় ফকিরের নেতৃত্বে বাকের গঞ্জের লোকেরা স্বাধীনতা ঘোষনা করেছিল।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে ছিল উত্তর মোমেন শাহী অঞ্চলের পাগল পন্থীরা। তারা পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। করম শাহ নামক এক পাঠান এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৭৫ সাল নাগাদ করম শাহ সুশং পরগনার লেতার-কান্দা গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তার মুরিদ বা শিষ্যদের মধ্যে ছিল পাহাড়িয়া, প্রকৃতি পূজক, হিন্দু ও মুসলমান। তাদের মতে সকল মানুষই আল্লার সৃষ্টি তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। তাদের জীবন যাত্রা এমন অস্বাভাবিক ছিল যে জনসাধারণ তাদেরকে পাগল বলত। করম শাহকে একজন কামেল দরবেশ বলে মনে করা হতো। তাঁর ফুঁতে যে কোন রকমের রোগ নিরাময় হয় বলে ভক্তরা বিশ্বাস করত।

করম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু শাহ গদীতে বসেন। টিপু শাহও তাঁর পিতার মতো আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী বলে লোকে বিশ্বাস করত। টিপু অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারেন বলে তাঁর মুরিদগনের বিশ্বাস ছিল। টিপু ও তাঁর মায়ের নেতৃত্বে পাগলদের সাংগঠনিক স্তর ছিল। স্তর বিন্যাসের পর্যায় গুলো হলো জমাদার, সর্দার, তহশিল দার, কাজী, ফৌজদার ইত্যাদি।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের সাথে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ বাধে। কোম্পানী স্থানীয় জমিদারদের উপর পলটনের রসদ যোগাড়, যানবাহন চলা চলের জন্য রাস্তা নির্মান, এবং ভারবাহী পশু সরবরাহের নির্দেশ

(৯০) ডঃ সিরাজুল ইসলাম—আঠার-উনিশ শতকে কৃষক বিদ্রোহের রাজ-নৈতিক চরিত্র।

www.pathagar.com

দেয়। জমিদারগণ এ অজুহাতে প্রজাদের উপর নানা প্রকারের অবৈধ করের বোঝা চাপিয়ে দেয়। এ সময়ে জনসাধারন পাগলদের স্লোগানে আকৃষ্ট হয় এবং প্রচার চালায় যে "বৃটিশ রাজত্বের অবসান আসন্ন, জমিদারী ক্ষমতা বিলুপ্তির পথে এবং নতুন রাজত্বের কর্ণধার হবেন টিপু। তাদের ভাষায় ফিরিংগী ও জমিদার চলে গেলে টিপুই হবেন রাজা। তখন প্রতি একর কৃষি জমির খাজনা হবে মাত্র চার আনা। সকল রায়ত তখন প্রথম তিন বছর জমি নিষ্কর ভোগ করবে। তাদের বেগার খাটতে হবেনা। আবওয়াব, মাথট ইত্যাদি কর দিতে হবে না। পাগল টিপু হবেন তাদের দয়ালু শাসক" (৯১)। টিপু কোম্পানীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করে।

বিদ্রোহের প্রথম পর্বে ১৮২৫ সালের ৬ই জানুয়ার টিপুকে বন্দী করা হলেও টিপুর অনুসারীরা ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত বিদ্রোহী তৎপরতা অব্যাহত রাখে। এর পর অবশ্য কোম্পানীর সামরিক শক্তি মোকাবিলায় পাগল পন্থীদের বিদ্রোহী তৎপরতায় ভাঁটা পড়ে।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত বিদ্রোহ সংগঠিত হয়ে ছিল তার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ডঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন, "প্রাথমিক পর্বে কোন বিদ্রোহই এর আদি সংগঠন ও নেতৃত্বে সীমিত থাকেনি। প্রতি বিদ্রোহই দানা বেধেঁছে স্থানীয় ভাবে এবং বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছে স্থানীয় ভাবে। কিন্তু পরে দাবানলের মত তা ছড়িয়ে পড়ে, সারা অঞ্চলে বিদ্রোহ আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহ করলে এর সংগঠন ও নেতৃত্বে রূপান্তর ঘটে। পর্যায় ক্রমে বিদ্রোহের নেতৃত্ব চলে যায় ধর্মীয় নেতাদের হাতে" (৯২)।

কিন্তু স্মরণ রাখা যেতে পারে বিদ্রোহ স্থানীয় ভাবে সংগঠিত হলেও এর পেছনে কাজ করেছে মুসলমানদের ধর্মীয় প্রেরনা এবং উদ্দেশ্য ছিল তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুন রুদ্ধার করা।

---

(৯১) ডেলাম ফন স্প্রেঙ্গেল—ময়মনসিংহের পাগল পন্থী।

(৯২) ডঃ সিরাজুল ইসলাম—আঠারো-উনিশ শতকে কৃষক বিদ্রোহের রাজনেতিক চরিত্র।

www.pathagar.com

মোমেন শাহীর পাগল পন্থীদের বিদ্রোহ সম্পর্কে ডেলাম ফন স্ক্রেগুেল যে মন্তব্য করেছেন তার সারমর্ম হলো—"কৃষক বিদ্রোহকে যারা বিংশ শতকের কৃষক আন্দোলনের খাপে ফেলতে চান তাদের পক্ষে ময়মনসিংহ বিদ্রোহকে অনুধাবন করা একটা সমস্যা বটে এবং তাদের পক্ষে এ বিদ্রোহ পাশ কাটিয়ে যাওয়া আশ্চর্যের বিষয় কিছু নয়। প্রচলিত ধারায় এ বিদ্রোহকে প্রাক-জাতীয়তাবাদী, প্রাক-সমাজ-তান্ত্রিক বা প্রাক—সামাবাদী বলে আখ্যায়িত করার মধ্যে কোন যুক্তি নেই।"

এ মনোভংগীর উপমা তীতুমীরের বিদ্রোহ ও ফরায়েজী আন্দোলনের উপর গবেষনা সমূহ। এ সব গবেষনা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে যে এ সব সশস্ত্র বিক্ষোভ ও আন্দোলন ছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক তৎপরতা যা পরবর্তীতে ইসলামিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে রূপায়িত হয়" (৯৩)।

ডঃ সিরাজুল ইসলাম তাঁর নিবন্ধে যে সমস্ত বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করেছেন তার সাথে কোনটারই কৃষি কাজে নিয়োজিত কৃষকদের সম্পর্ক নেই। টিপুর বিদ্রোহ কৃষক আন্দোলন ছিল না। তিনি কোম্পানীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করতে চেয়েছিলেন। মজনু শাহের বিদ্রোহ ছিল সুপরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত। এতে কোন কৃষক প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহন করেনি, তবে তাদের অধিকাংশই পরোক্ষভাবে তাঁকে সহায়তা করেছে। সিলেটের ধর্মীয় নেতা মির্জা মোহাম্মদ রেজা বেগ ফিরিংগী হুকুমত ধ্বংস করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্যে জেহাদ ঘোষনা করেছিলেন। তাই সমস্ত বিদ্রোহের উৎস হচ্ছে ধর্মীয় অনুভূতি এবং লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের হৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা।

অনেকে আবার এসব বিদ্রোহকে এ দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়নের লক্ষ্যে হিন্দু সন্ন্যাসী এবং মুসলমান ফকিরদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা হিসেবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। এর কারণ হলো তৎকালীন

(৯৩) ডেলাস ফন স্প্রেগুেল —ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ।

www.pathagar.com

কোম্পানীর কাগজপত্রে এবং ফকীর সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের কথার উল্লেখ রয়েছে। হান্টার সাহেব একস্থানে মন্তব্য করেছেন যে সন্ন্যাসী এবং ফকীর নামধারী এক দল দুর্বৃত্ত দল বেঁধে সারা দেশ ব্যাপী চুরি-ডাকাতি, লুটতরাজ করে ফিরছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা ধর্ম প্রচারক অর্থাৎ তীর্থ পথিক, কিন্তু আসলে তারা দস্যু তস্কর ব্যতীত কিছুই নহে" (৯৪)।

এই সূত্র ধরে শ্রী রতন লাল চক্রাবর্তী তার "ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ" নামক প্রবন্ধে লিখেছেন "ফকীর এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ ছিল খুবই স্বাভাবিক এবং ভ্রাতৃত্ব বোধ তাদের ঐক্যের ভিত্তি – মূল প্রতিষ্ঠা করে" (৯৫)। কিন্তু ফকীরদের সংগ্রাম ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা পুনঃ রুদ্ধার করা। সন্ন্যাসীরা কখনো ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি বা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের কোন কল্পনা ও তাদের ছিলনা। বরং তাদের সংগ্রাম ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের শাসন যাতে আবার কায়েম না হয় সে জন্যে তারা ইংরেজদের সহায়তা করেছিল। সাহিত্য সম্রাট বংকিম চন্দ্র বার বার উল্লেখ করেন সন্ন্যাসী দর যুদ্ধ ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, মুসলমান রাজা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। কাপ্তেন টমাস ইংরেজ তাই তাঁর দলের সংগে তাদের কোন বিরোধ নেই। বংকিম চন্দ্র তার আনন্দ মঠ বইতে কাপ্তেন টমাস এবং জনৈক সন্ন্যাসীনীর মধ্যে যে কথোপকথনের অবতারনা করেছেন তা হলো –

"কাপ্তেন টমাস বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। কাপ্তেন সাহেব দেশীভাষা বিলক্ষন জানিতেন, বলিলেন- তুমি কে? সন্ন্যাসী বলিল "আমি সন্ন্যাসী"। কাপ্তেন বলিলেন তুমি

rebel সন্ন্যাসী, সে কি?

কাপ্তেন ঃ হামি তোমায় গুলি করিয়া মারিব।

সন্ন্যাসী ঃ মার।

---

(৯৪) মুহামমদ আবুতালিব—মজনুশাহ।

(৯৫) রতন লাল চক্রবর্তী —ফকীর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।

www.pathagar.com

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতে ছিলেন যে গুলি করিবেন কিনা; এমন সময় বিদ্যুৎ বেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাহার উপর পড়িয়া তাহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী বক্ষাবরন খুলিয়া ফেলিল, কাপ্তেন সাহেব দেখিলেন, অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী মূর্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি স্ত্রী লোক কাহাকেও আঘাত করিনা। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু মোছলমানে মারামারি হইতেছে, তোমরা মাঝখানে কেন? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।" মনে রাখা দরকার যে ১৭৭২ সালের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে।

মুসলিম শাসন উৎখাত করে ইংরেজদের শাসন কায়েম করাই যে সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য ছিল তার প্রমান মিলে বংকিম চন্দ্রের মানস পুত্র সন্তানদের মুখ নিঃসৃত বানী হতে—"যবনেরা বিতাড়িত হইয়াছে এবং সন্তানদের আদর্শ সিদ্ধ হইয়াছে··· ... ··· ইংরেজ আমলে আর সন্তানদের সংগ্রামের প্রয়োজন নাই।" সন্তান সেনা প্রধান সত্যানন্দের প্রশ্নের উত্তর বংকিম চন্দ্র তার আরাধ্য মহা পুরুষের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন "তোমার কাজ সিদ্ধ হইয়াছে মুসলমান। রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এমন কোন কাজ নাই।"

সত্য—মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়নি—এখন কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি—হিন্দু রাজ্য এখনও স্থাপিত হইবেনা। —তুমি থাকিলে অনর্থক নর হত্যা হইবে, অতএব চল। শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্ম পীড়ায় কাতর হইলেন বলিলেন "হে প্রভু। যদি হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হইবেনা' তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে? তিনি— "না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে। ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিস্কলংকে ধর্মাচরন করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান, ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরন কর।"

সত্যানন্দ বলিলেন ঃ হে। মহাত্মন! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এই সময়ে ইংরেজদের রাজ্যই দেশের

www.pathagar.com

পক্ষে মংগল হয় তবে আমাদিগকে কেন এই নৃশংস যুদ্ধ কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষ বলিলেন "ইংরেজ এক্ষনে বনিক,. অর্থ সংগ্রহেই মন. রাজ্য শাসনের ভার লইতে চাহেনা। এই সন্তান বিদ্রোহের কারনে তাহারা রাজ্য শাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে। কেননা রাজ্য শাসন ব্যতীত অর্থ সংগ্রহ হইবেনা। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষনে আইস-জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।" মহাপুরুষ। শত্রু কে ?শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা। আর ইংরেজের সংগে যুদ্ধে জয়ী হয় এমন শক্তি কাহারও নাই।"

বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় যে তখন বৃটিশের বিরোধীতার পরিবর্তে চরম তোষন নীতির পথ বেছে নিয়েছিল তার সন্ধান মিলে সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র পুস্তক থেকে। ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার ২-৭-১৮৫৮ খৃঃ হিন্দুদের রাজভক্তি শিরোনামে এক সম্পাদিকীয়টি হুবহু নীচে তুলে ধরা হলো ঃ

"শ্রীযুক্ত কেদার নাথ বাবু বিদ্যোৎসাহী নব যুবক ব্যক্তি। তিনি "হিন্দু জাতির রাজভক্তি" নামক একখানি অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। যেহেতু যথার্থ পক্ষে এই পুস্তক নিজ নামের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। রাজভক্ত প্রজাগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পর তাহাদিগের অন্তরে স্বরূপ রাজভক্তি উদ্দীপিত হইবে সন্দেহ কি ? অনুরোধ করি রাজভক্ত প্রজাগণ ঐ পুস্তক ক্রয় করতঃ আপনারা রাজভক্তি বিষয়ে সদুপদেশ গ্রহন করুন এবং গ্রন্থ কর্তাকে সমুচিত উৎসাহ দিন। অধিকন্তু উক্ত গ্রন্থ সমগ্ররূপে প্রচারিত হইলে পর প্রজাগণের প্রতি ও সবিশেষ রাজানুগ্রহ প্রকাশ পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" (৯৬)।

---

(৯৬) সাময়িক পত্রে বাংলার সামাজিক চিত্র

www.pathagar.com

আবু তালিব সাহেব তাঁর ফকীর নেতা মজনু শাহ বইতে অত্যন্ত মোলায়েম ভাবে মন্তব্য করেছেন "সরকারী বিবৃতি গুলিতে ফকীর ও সন্ন্যাসী নাম গুলি এমন হালকা এবং আলগাভাবে গ্রহন করা হয়েছে যে তার সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা করাও মুশকিল। অথচ এই আন্দোলন প্রধানতঃ মুসলিম ফকীরদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল এবং একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি নিয়েই তারা অগ্রসর হয়েছিল (৯৭)। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মজনুর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কোন হিন্দুর নাম নেই।

ইংরেজ কোম্পানীর দলিল দস্তাবেজে ফকীর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে এক করে দেখার পেছনে একটি দুরভিসন্ধি রয়েছে যদিও হিন্দু সন্ন্যাসী-গন কোন ক্রমেই ইংরেজদের বিরোধীতা করে নাই।

হিন্দু তান্ত্রিক মতে নর বলি, রাহাজানি, ধর্ষন, অপহরণ প্রভৃতি পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত। এ সমস্ত তান্ত্রিক সাধুরা দলবদ্ধ-ভাবে চলাফেরা করতো এবং সব রকমের অমানবিক কার্যাবলীর দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করতো। সাহিত্য সম্রাট বংকিম চন্দ্রের 'কপাল কুণ্ডলা' নামক উপন্যাসে এ সমস্ত তান্ত্রিক কাপালিক সন্ন্যাসীদের কার্যক্রমের কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। ঠগী নামক একদল লোক নিজদেরকে কালী মাতার সন্তান বলে মনে করত। তারা সাথে রাখতো ১২ ইঞ্চি পরিমানের একটি মন্ত্রপুত রুমাল। সাধুর বেশে তারা নিরীহ পথচারীদের সাথে মিশত এবং সুযোগ বুঝে গলায় ফাঁস পড়িয়ে তাকে হত্যা করে তার যথাসর্বস্ব অপহরন করতো। কর্ণেল শ্লীমান নামক জনৈক ইংরেজ ঠগীদেরকে নির্মূল করে ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারও বলেছেন—"বিহার ও মধ্য প্রদেশ হইতে আগত একদল নাগা সন্ন্যাসী উত্তর বংগে লুট তরাজ করিয়া ফিরিত" (৯৮)

রংপুর জেলার গেজিটিয়ারে ভবানী পাঠক নামক একজন ডাকাত সর্দারের উল্লেখ রয়েছে। সে ছিল একজন ভোজপুরী ব্রাহ্মন। কোন

(৯৭) মুহামমদ আবুতালিব—মজনুশাহ

(৯৮) ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস —৩য় খণ্ড।

www.pathagar.com

ব্যবসায়ীর তামাকের নৌকা লুট করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল। এর পর সে ব্যবসায়ীর পণ্য বোঝাই নৌকা মনে করে ভুল করে কোম্পানীর সৈন্যদের জন্য পাঠানো রসদবাহী নৌকা আক্রমন করে এবং ক্যাপ্টেন ব্রেনানের গুলিতে নিহত হয়।

ইংরেজ কোম্পানীকে অনেক সময় তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। মুসলমান ফকীরদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে তান্ত্রিক কাপালিক সন্ন্যাসীদের সংগে তাদেরকে এক করে দেখানো হয়ছে। তবে স্বাধীনতাকামী ফকীর মজনু শাহ এবং তান্ত্রিক কাপালিক ভবানী পাঠককে এক পাল্লায় ওজন করা চলেনা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুসলিম বিরোধী নীতিঃ

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশের উপর তাদের আধিপত্য সুসংহত এবং ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্যে যে কর্মসূচী গ্রহন করে তা ছিল পুরোপুরি মুসলিম বিরোধী। বক্সারের যুদ্ধে মুসলিম শক্তির চুড়ান্ত পরাজয় এবং মুসলমানদের উদ্যোগে পরিচালিত ছোট খাটো বিদ্রোহ গুলি অবদমিত হলেও তারা বুঝতে পেরেছিল যে মুসলমানদেরকে বশীভূত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। একদিন যারা রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিল তারা সহজে তাদের শত্রুর আনুগত্য করবেনা। এ সম্পর্কে ক্লাইভ ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট যে চিঠি দিয়েছিলেন তা হলো "মুসলমানদের প্রতি যতই সদয় ব্যবহার করা হোক না কেন তারা আমাদের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহন করবেনা। তারা তাদের নিজস্ব আশা আকাংখা, ভয় ভীতি দ্বারা পরিরালিত হবে।" (৯৯)। ১৮১৩ খৃঃ স্যার জন ম্যালকম বলেছিলেন "কিছুকাল পূর্বে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার কারনে মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে তা তাদের স্মরনে রয়েছে। তাই হিন্দুরা আমাদের

(৯৯) ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক—The British Policy & Muslims in Bengal (1757—1857)

www.pathagar.com

প্রতি যতটা অনুগত হবে মুসলমানদের নিকট হতে ততটা আনুগত্য আশা করা যায় না।" হিন্দুদেরকে খুশী রাখতে পারলে মুসলমানদের বিরোধীতার কারণে কোম্পানীর স্বার্থ বিঘ্নিত হবে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন "ভারত বর্ষে আমাদের নিরাপত্তা হিন্দুদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। কর্ণেল টমাস মনরো মন্তব্য করেছিলেন মুসলমানদের বিরোধীতার মোকাবিলায় হিন্দুদের সহযোগীতার কারনে কোম্পানীর শাসন টিকে থাকবে" (১০০)। তাই কোম্পানীর শাসনের মূলনীতি ছিল মুসলমানদের মেরুদণ্ড ভেংগে দেয়া এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করে তোলা।

এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে তারা যে দু'টো উদ্যোগ গ্রহন করে তা হলো লর্ড কর্ণওয়ালীশ কর্তৃক ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া এবং লর্ড ম্যাকলে কর্তৃক ১৮৩৭ খৃঃ ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করা।

মুসলিম শাসনামলে সরকার সরাসরি প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করতো। এলাকার উৎপাদন শক্তি নির্ণয় করে খাজনা ধার্য করা হতো। তখন প্রজাদের কাছ থেকে সরাসরি খাজনা আদায় কারীদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। অভিজাত মুসলমানদের অধিকাংশই ছিলেন বহিরাগত। এদেশবাসীদের সাথে তাদের তেমন মেলা মেশা ছিলনা। তাই তাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের ভার অনুগত, ধূর্ত এবং কুটবুদ্ধি সম্পন্ন হিন্দুদের উপর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পর প্রথমে পাঁচ শালা এবং পরে দশ শালা বন্দোবস্ত দেয়। তারা পরগনা নীলামে তুলতো এবং সর্বচ্চো ডাকে তা ইজারা দিতে। প্রজাদের কাছ থেকে যারা সরাসরি খাজনা আদায় করতো তারা এবং মহাজনেরাই ইজারা নিত। এসমস্ত ইজারাদারদের প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু। তারা

(১০০) ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক—The British Policy & Muslims in Bengal (1757—1857)

www.pathagar.com

কৃষকদের সাধ্যমত শোষন করত। পরে ১৭৯৩ খৃঃ লর্ড কর্ণ ওয়ালিশ এ সমস্ত ইজারাদাদের নিকট জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেন এবং তারা জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে। জেমস ও কিনেলীর ভাষায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে "নিম্নতম পর্যায়ের হিন্দু রাজস্ব আদায়-কারী, যারা ছিল একেবারেই গুরুত্ব হীন, তারা রাতারাতি ভূম্যাধিকারীতে পরিনত হয়। জমির মালিকানা স্বত্ব তাদের উপর বর্তায়। তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, যে সম্পদ মুসলিম শাসনামলে মুসলমান-দের পাওনা ছিল। "ফলে মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর দুর্যোগের ছায়া নেমে আসে। মেটকাফের মতে এসমস্ত নিবর্তন মূলক আইন দ্বারা ভূসম্পত্তির প্রকৃত মালিক মুসলমানদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে বিশেষ শ্রেনীর বাবুদেরকে দেয়া হয় যারা দুর্নীতি, ঘুষ এবং নানাবিধ অবৈধ উপায়ে প্রচুর ধন সম্পদ আহরন করে (১০১)।"

স্মরনাতীতকাল হতে এদেশে শিক্ষা বিস্তার এবং ধর্মীয় কাজে নিষ্কর জমিদারীর রীতি প্রচলিত ছিল। মুসলিম আমলে উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী, ধর্ম শাস্ত্র বিশারদ এবং ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে লাখেরাজ জমি দেয়া হতো। এ সমস্ত দান জায়গীর, আলতামথা, আয়মা এবং মদদমাশ ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। মুসলমানেরা এরকমের প্রায় ২১ প্রকারের লাখেরাজ জমি ভোগ করতো। মুসলমানদের এ সমস্ত লাখেরাজ জমির প্রায় সবগুলিই বাজে-য়াপ্ত করা হয়।

মুসলিম আমলে সেনা বাহিনীর অধিকাংশ লোকই ছিল মুসলমান রাজত্ব মুসলমানদের থেকে কোম্পানীর হাতে চলে যাবার ফলে সেনা বাহিনীতে যে সমস্ত মুসলমানেরা চাকুরী রত ছিল তাদের প্রায় সকলেই চাকুরীচ্যুত হয়। মীর জাফর ৮০ হাজার সৈন্যকে চাকুরীচ্যুত করেন এবং নবাব নজুমদ্দৌলাকে তার মর্যাদার প্রতীক হিসাবে যতটুকু বাহি-

(১০১) আজিজুর রহমান মল্লিক—The British Policy and Muslims of Bengal (1757—1857)

www.pathagar.com

নীর দরকার কেবলমাত্র ততটুকু রাখার অনুমতি দেয়া হয়। ফলে মুসলিম জন সংখ্যার এক বিপুল অংশ বেকারে পরিনত হয়।

কোম্পানীর তাবেদার শ্রেণী সৃষ্টির লক্ষ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বিতীয় যে পদক্ষেপটি গ্রহন করে তা হলো সরকারী ভাষা হিসাবে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীর প্রবর্তন।

মুসলিম আমলে সরকারী ভাষা ছিল ফার্সী। অফিস, আদালত এবং রাজদরবারে ফার্সী ভাষা চালু ছিল। লর্ড ম্যাকালে এদেশে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন করেন। ম্যাকলের এ উদ্যোগের বিরুদ্ধে অনেক ইংরেজ প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তাদের যুক্তি ছিল সুসভ্য ইংরেজ জাতির ইংরেজী ভাষা এদেশের বর্বর এবং অসভ্য অধিবাসীদের জন্যে উপযোগী নয়। দানিয়েল আরগভ তার "Moderates and the extremists in the India National Movement" নামক পুস্তকে বলেন : "Macaulay predicted that as a result of western influence English educated Indians would become 'Indian in blood & colour but English in opinions, in morals and intellect. (১০২) অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়গণ পাশ্চাত্যের ভাব ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে চিন্তায় চেতনায় এবং বিচার বিবেচনা ও প্রজ্ঞায় ইংরেজদের অনুকরণ করবে, কিন্তু তাদের ধমনীতে প্রবাহিত রক্ত এবং দেহবর্ণ ভারতীয়ই থাকবে। এ সমস্ত ইংরেজী শিক্ষিত জনগণই ভারতে বৃটিশ স্বার্থের পাহারাদারী করবে!

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ফার্সী ভাষার পরিবর্তে সরাকরী ভাষা হিসাবে ইংরেজী ভাষা চালু করা হয়। এদেশের অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ফার্সী প্রচলিত ছিল। বিজাতীয় শত্রুর ভাষা হিসাবে ইংরেজী ভাষার প্রতি তারা বিদ্বেষ পরায়ন ছিল। দেশীয় আলেমগণ ইংরেজী

(১০২) Daniel Argov—Moderates and Extremists in theIndian National Movement

www.pathagar.com

ভাষাকে কাফেরের ভাষা বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। ফলে মুসলমানেরা ইংরেজী ভাষা শিখতে দ্বিধাগ্রস্থ ছিল। যদি ধীরে ধীরে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তে ইংরেজী ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে চালু করা হতো তবে হয়তো মুসলমানেরা এতটা ক্ষতিগ্রস্থ হতো না। কিন্তু রাতারাতি ফার্সী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা চালু করার ফলে বিপুল সংখ্যক চাকুরীজীবি মুসলমান চাকুরীচ্যুত হয়ে বেকার হয়ে পড়ে।

কিন্তু ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন অপর সম্প্রদায়ের জন্যে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। মুসলমানদের জন্যে তখন এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলনা যেখানে তারা ইংরেজী শিখতে পারতো। কিন্তু হিন্দু যুবকদের জন্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল। সেখানে হতে তারা ইংরেজী শিখে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ লাভ করতে থাকল। ১৮৪৪খৃঃ সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় যে সরকারী চাকুরীতে ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণ অগ্রাধিকার পাবে। ফলে মুসলমানদের জন্যে সরকারী চাকুরীর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪৫—৫২ সাল পর্যন্ত সরকারী চাকুরী প্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে তালিকা প্রণীত হয়েছিল তাতে কোন মুসলমানের নাম ছিলনা। ১৮৫৩ - ৫৫ সালের জন্যে প্রণীত তালিকাতেও মুসলমানের নাম অনুপস্থিত। ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৮৫০—৫১ সালে প্রাক্তন ছাত্রদের নামের যে তালিকা তৈয়ার করে তাতে কোন মুসলমানের নাম নেই। ১৮৫১ - ৫২ সালে প্রণীত তালিকায় ৭৭ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিল মুসলমান। একই সালে হুগলী কলেজ কর্তৃক প্রণীত তালিকাতে ও কোন মুসলমানের নামের উল্লেখ নেই। ১৮৫৬—৫৭ সালে বিচার বিভাগ, রাজস্ব বিভাগে ৫০ টাকা বেতনে ৩৩৬ জনকে চাকুরীতে নেয়া হয়। তার মধ্যে ছিল ৫৪ জন মুসলমান, ৯জন খৃষ্টান আর বাকী সকলেই হিন্দু। অন্যান্য চাকুরীতে ও মুসলমানদের অবস্থা একই রকমের ছিল। ১৮৫৩ খৃঃ ৪৯ জন সাব এ্যাসিসটেন্ট সার্জন নিয়োগ করা হয়। এর মধ্যে মাত্র ৫জন ছিল মুসলমান শিক্ষা বিভাগে মাদ্রাসায় আরবী এবং ফার্সী শিক্ষা দানের জন্যে শুধু মুসলমান নিয়োগ করা হতো। অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্যে কোন মুসলমানকে নিয়োগ করা হতো না। ম্যাজিস্ট্রেট হতে

www.pathagar.com

আরম্ভ করে কেরানী বা পিয়নের পদের জন্যে, যত সামান্য বেতনই হোকনা কেন তার জন্যে হিন্দুরা লালায়িত থাকত। কোন পরিবারের একজন কোন প্রকারে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ লাভ করতে পারলে অন্যান্যদের জন্যে ও সে চাকুরীর বন্দোবস্ত করতে পারত।

এ সমস্ত ব্যবস্থার ফলে অভিজাত মুসলিম পরিবারের জীবিকা উপর্জনের সমস্ত উৎস শুকিয়ে যায়। মধ্যবিত্ত হিন্দুদের দ্বারা তারা সকল রকমের সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্র হতে বিতাড়িত হতে থাকে। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের প্রতি কি রকমের শত্রুতামূলক আচরণ করা হচ্ছিল হাণ্টার সাহেবের "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান" গ্রন্থে তার একটি উদাহরণ রয়েছে।

কলিকাতা হতে প্রকাশিত একটি ফার্সী পত্রিকা দূরবীনের বরাত দিয়ে তিনি লিখেছেন—"উচ্চ স্তরের বা নিম্ন স্তরের সমস্ত চাকুরী ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের হাত হতে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সরকার সকল শ্রেণীর প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য, তথাপি এমন সময় এসেছে যখন মুসলমানদের নাম আর সরকারী চাকুরীয়াদের তালিকায় প্রকাশিত হচ্ছে না। কেবল তারাই চাকুরীর জায়গায় অপাংক্তেয় সাব্যস্ত হয়েছে। সম্প্রতি সুন্দরবন কমিশনার অফিসে কতিপয় চাকুরীতে লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, কিন্তু অফিসারটি সরকারী গেজেটে কর্মখালীর যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তাতে বলা হয় যে এ সমস্ত পদগুলোতে শুধু হিন্দুদের নিয়োগ করা হবে। মোট কথা মুসলমানদের এখন এতদূর নীচে ঠেলে দেয়া হয়েছে যে সরকারী চাকুরীর জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্বে ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি মারফত এটা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে তাদের জন্য কোন চাকুরী খালী নেই। তাদের অসহায় অবস্থায় প্রতি কারো দৃষ্টি নেই এবং এমনকি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতেও নারাজ (১০৩)।"

---

(১০৩) W. W. Hunter —The Indian Mussalman.

www.pathagar.com

কোম্পানীর শাসনামলে যে শুধু উচ্চবিত্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে ছিল তা নয়। নিম্ন বিত্ত মুসলমানেরাও কোম্পানীর প্রশাসনিক নীতির দ্বারা মর্মান্তিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমির মালিকানা স্বত্ব জমিদারদের দেয়া হয়েছিল। মুঘল আমলে সরকারের সাথে চাষীদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর ফলে চাষীদের সাথে সরকারের আর কোন যোগাযোগ রইল না। জমিদারগনকে চাষীদের মালিক—মোক্তার বানিয়ে দেয়া হলো। তারা অধীনস্থ প্রজাদেরকে বৈধ-অবৈধ নানা প্রকার কর ভারে জর্জরিত করতে লাগল। প্রজাগন জমিদারদের অবৈধ দাবীর নিকট নতি স্বীকার না করলে জমিদারগন খেয়াল খুশিমত তাদের উৎখাত করতে পারত। জমিদারদের দাবী মেটাবার জন্যে প্রজাদেরকে মহাজনদের নিকট হতে টাকা কর্জ করতে হতো। এ ঋনের জন্যে তাদের ৫০% হতে ৬০% হারে সুদ দিতে হতো। মহাজনদের সকলেই ছিল হিন্দু। আর প্রজাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। প্রজাদের কথা স্মরন করে একদিন হেস্টিংস বলেছিলেন, তাদের দুর্দশায় ব্যথা অনুভব করা ছাড়া তার আর কিছু করার নেই। কোন পথে প্রজাদের দুর্দশা লাঘব হবে তা বলতে তিনি অক্ষম।

এ ছাড়া ইংরেজরা এ দেশে নীল চাষের প্রবর্তন করে। নীলের চাষ প্রজাদের জন্য মস্ত বড় এক অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। ১৮০৫ সালে বাংলাদেশে ৬৪,৮০৩ মন নীল উৎপন্ন হয়েছিল। ১৮৪৩ সালে এর পরিমান দ্বিগুন বৃদ্ধি পায়। বংগ দেশে মুসলিম প্রধান জেলাগুলোতে, যথা—ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, রাজশাহী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং যশোহরে ইংরেজ কুঠিয়ালদের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে নীল চাষ করা হতো। ইংরেজ কুঠিয়ালগন নীলের জন্যে যে দাম দিতে তা প্রতি বিঘা নীল চাষের জন্য যে খরচ পড়ত তার চাইতে ৭/—টাকা কম ছিল। এ সাত টাকা ছিল জমির খাজনার সাত গুন। ইংরেজ কুঠিয়ালগন চাষীদেরকে নীল চাষে বাধ্য করতো।

www.pathagar.com

চাষীদের দারিদ্র্য এবং অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কুঠিয়ালগন তাদের নিজ স্বার্থ বিরোধী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করত। তাদের হালের বলদ এবং লাংগল-জোয়াল বন্ধক রেখে তারা নীল চাষের জন্যে টাকা লগ্নী করত। কেউ নীল বুনতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে কয়েদ করা হতো, বেত মারা হতো, এমনকি ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হতো। কেউ নীল চাষের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে অস্বীকার করলে তার নামে জাল দলীল তৈয়ার হতো এবং চাষীর রোপিত ধান, আঁখ উপড়ে ফেলা হতো। অনেক সময় জমিদারগন প্রজার জমি জোর করে দখল করে নীল কুঠিয়ালদের হাওলা করত। কুঠিয়ালদের হিন্দু আমলারা সর্বদা প্রজাদের সর্বস্ব অপহরনের সুযোগ খুঁজত।

কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে চাষীদের অভিযোগের কোন জায়গা ছিলনা। থানার দারোগা, কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট সকলের সাথে কুঠিয়ালদের যোগাযোগ থাকতো। কেউ ইংরেজ কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহনে সাহস পেতনা। কুঠিয়ালরা ছিল আইনের নাগালের বাইরে। একবার কুঠিয়ালরা একটি পুরোগ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। তখন গনী নামক এক দফাদার শোরগোল তোলে। এ অপরাধে তাকে চার মাস ধরে এক অন্ধকার কোঠায় আটক রাখা হয়। ১৮৬০ সালে নীল কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দেয়ার সময় এশলে ইডেন বলে ছিলেন "ইংলন্ডে এমন কোন নীলের বাক্স পৌঁছায়না যার মধ্যস্থিত নীলে এদেশের লোকের রক্ত মিশ্রিত না থাকে আর এ রক্ত ছিল মুসলিম চাষী সম্প্রদায়ের রক্ত" (১০৪)।

নিম্নবিত্ত মুসলিম জনসাধারনের মধ্যে তাঁতীরা ছিল একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায়। তাঁত শিল্প ছিল এদেশের ঐতিহ্য বাহী একটি শিল্প। প্রত্যেক জেলায় তাঁত শিল্পের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। এদেশের তাঁত শিল্প এতই সমৃদ্ধশালী ছিল যে এখানে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হওয়া সত্বেও সুরাট হতে তুলা আমদানী করতে হত। দেশে তৈরী মোটা কাপড় দেশী লোকেরা ব্যবহার করত এবং ঢাকার তৈরী

(১০৪) The Brilioh Policy and the Muslims of Bengal (1757-1857)

www.pathagar.com

সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হত। উইলিয়ম বোলেটর এর ভাষায় কোম্পানীর আমলেরা প্রথম দিকে তাঁতীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিল। ইংরেজ ব্যবসায়ী তাদের আশ্রিত হিন্দু বেনিয়া এবং দেশীয় গোমস্তাগণ প্রত্যেক তাঁতীকে নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় সরবরাহে বাধ্য করত। কেউ অস্বীকার করলে তার কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হতো এবং চাবুক পেটা করা হতো। কোম্পানী তাঁতীদেরকে যে দাম দিত তা বাজার দরের চাইতে ১৫% হতে ৪০% পর্যন্ত কম থাকত।

তাঁতীগণ সব চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় যখন কোম্পানীর ডাইরেকটরগণ নির্দেশ দেন যে তাঁতীরা শুধু কাঁচামাল এবং রেশম সরবরাহ করবে। তারা নিজেদের তাঁতে কোন কাপড় বুণতে পারবে না। তারা রেশন উৎপাদনকারীদেরকে নিজদের তাঁত বন্ধ করে কোম্পানীর কারখানায় কাপড় বুনতে বাধ্য করে। ফলে এদেশের কাপড় রপ্তানীর পরিমান কমে যায়। ১৮১৭-১৮ সালে ঢাকা থেকে ১,৫২,৪৯৭ পাউণ্ড মূল্যের কাপড় রপ্তানী হয়েছিল। এ রপ্তানীর পরিমাণ ১৮৩৪—৩৫ সালে দাঁড়ায় মাত্র ৩৮,২১২ পাউন্ডে। কোম্পানীর চাপের মুখে মসলিন কাপড়ের বুনন একেবারে বন্ধ হয়ে যায় এবং বংগদেশের বস্ত্র শিল্পের সমৃদ্ধি লোপ পায়।

কোম্পানীর শাসনামলে মুসলমানেরা এতদূর দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে এ সময়ে একটি দৈনিকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের যে নামের তালিকা প্রকাশিত হয়, তাতে বংগদেশের কোন মুসলমানের নাম ছিলনা। এ তালিকায় শুধু দিল্লীর বাদশাহর নাম স্থান পেয়েছিল। বুকানন সাহেবের রির্পোট হতে দেখা যায় যে প্রতিটি জেলায় শুধু মুসলমানেরাই ছিল দারিদ্র্য পীড়িত।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করেই ইংরেজ কোম্পানী ক্ষান্ত হয়নি। বাংলা সাহিত্য মুসলমান নবাব এবং বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি হয়ে ছিল এবং সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তাই বাংলা ভাষায় তৎকালে

www.pathagar.com

প্রচলিত শব্দের বহুলাংশ ছিল আরবী এবং ফার্সী থেকে সংগৃহীত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বাইবেলের বাংলানুবাদ বের করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তা'ছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলা শেখানোর প্রয়োজন ছিল। কোম্পানীর ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখানোর জন্যে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। উইলিয়াম কেরী হন এর প্রধান এবং তাঁর অধীনে আটজন পণ্ডিত নিয়োজিত হন। এ সমস্ত পণ্ডিতদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার এবং রাম রাম বসুর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাহাদের সহায়তায় কেরী বাংলা গদ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করতে থাকেন। এর পূর্বে নাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেড "গ্রামার অব দি বেংগলি লেংগুয়েজ" নামে একটি ব্যাকরণ বই প্রনয়ণ করেন। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার, রাম রাম বসু প্রমুখ সংস্কৃত পণ্ডিতগণ আরবী ও ফার্সী শব্দগুলো অশুদ্ধ বিবেচনায় তদস্থলে সংস্কৃত শব্দ যোজনা করতে থাকেন। এরূপভাবে বাংলা ভাষায় শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত শব্দ বহুল ভাষায় পরিনত করা হয় এবং বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার দুহিতা হিসাবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সফল হয়।

ফরায়েজী আন্দোলন

ইংরেজদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে মুসলমানেরা হেরে যায়। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজদের কোপানলে পড়ে তাদের ভাগ্যাকাশ দুর্যোগের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সফলতার আশা ছেড়ে দিয়ে যে কতিপয় মুসলিম নেতা নিজদের সমাজ এবং ধর্মীয় সংস্কারে মনযোগ দেন তাঁদের মধ্যে হাজী শরীয়ত উল্লা এবং তীতুমীর অন্যতম।

ফরায়েজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়ত উল্লাহ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বন্দর খোলা নামক স্থানে এক সাধারণ পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি মক্কায় গমন করেন এবং শাফেই

www.pathagar.com

মাজহাবের প্রধান সেখ তাজির আল সম্বল আল মক্কীর সংস্পর্শে আসেন এবং ধর্ম শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অতঃপর ১৮০২ খৃঃ তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

শরীয়ত উল্লার মতবাদের সাথে আরবের ওহাবী মতবাদের অনেকটা মিল ছিল। তিনি শুক্রবারের জুম'য়ার নামাজ এবং দুই ঈদের নামাজ আদায়ের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে শুধু দারুল ইসলামে জুম'য়ার নামাজ এবং ঈদের নামাজ আদায় করা চলে। দারুল হরবে জুম'য়ার নামাজ এবং ঈদের নামাজ আদায় করা নাজায়েজ। ভারতবর্ষকে তিনি দারুল হরব বলে ফতোয়া দেন। তিনি পীর-মুরিদী প্রথার বিরোধী ছিলেন। কারণ এ প্রথায় মুরীদকে শর্তহীনভাবে পীরের আনুগত্য করতে হয়। তিনি এর পরিবর্তে ওস্তাদ-সাগরেদ প্রথার প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁর সাগরেদদের মধ্যে সাম্যের নীতির উপর বিশেষভাবে জোর দেন এবং পীর পূজা এবং পীরের প্রতি শর্তহীন ও অকুণ্ঠ আনুগত্যের বিরোধীতা করেন। তিনি পীরের হাতে হাত রেখে বায়েত গ্রহনের বিরোধী এবং তওবা করার সমর্থক ছিলেন।

উঁচু-নীচু, আশরাফ-আতরাফ ইত্যাদি ভেদ নীতি পরিহার করে সাম্যের নীতি প্রবর্তনের ফলে বিপুল সংখ্যক নিম্নশ্রেনীর মুসলমান তাঁর দলভুক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। এতে জমিদারগণ ভীত হয়ে পড়ে।

মুসলমাদদের মধ্যে যারা ফরায়েজী মতবাদের বিরোধীতা করত, শরীয়ত উল্লার অনুসারীগণ তাদেরকে শত্রু হিসাবে বিবেচনা করত। ফলে ১৮৩১ খৃঃ তাঁর অনুসারী এবং বিরোধীদের মধ্যে এক দাংগা বাঁধে যার ফলে শরীয়ত উল্লাহকে ঢাকা জেলার নয়াবাড়ী গ্রাম পরিত্যাগ করে নিজ জন্ম ভূমিতে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়েই চলে।

হাজী শরীয়ত উল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধন করা এবং দীর্ঘ দিন যাবত হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকার ফলে ইসলাম ধর্মে যে পৌত্তলিক ধ্যানধারনা, রীতিনীতি অনুপ্রবেশ করেছিল তা বিদূরিত করা। তাঁর কোন রাজনৈতিক অভিলাষ ছিল না।

www.pathagar.com

শরীয়ত উল্লাহর এন্তেকালের পর তাঁর ছেলে মুহম্মদ মহসীন ওরফে দুদুমিঞা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি কিছুটা রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন ছিলেন। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহন করেন। তাঁর অনুসারীগণ তাঁকে আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে গণ্য করত। তিনি সমগ্র পূর্ব বাংলাকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক বিভাগে একজন করে খলিফা নিযুক্ত করেন। খলিফাদের কাজ ছিল ফরায়েজীদের ঐক্যবদ্ধ রাখা, ফরায়েজী মতবাদ প্রচার করা এবং যারা মতবাদ কবুল করত তাদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করা। এ সমস্ত খলিফাদের উপর ছিলেন স্বয়ং দুদু মিয়া। তিনি পীর হিসাবেও গণ্য হতেন যা নাকি ছিল শরীয়ত উল্লাহর মতবাদ বিরোধী। সমস্ত দেশ ব্যাপী তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং তাদের স্বীয় নিয়ন্ত্রনে রাখেন।

দুদু মিয়ার আমলে ফরায়েজী কর্মকাণ্ড শুধু ধর্মীয় বিষয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও সম্প্রসারিত করা হয়। জমিদারগণ যদি কোন ফরায়েজীর নিকট থেকে অবৈধভাবে কর আদায়ের চেষ্টা করতো তবে ফরায়েজীরা সংঘবদ্ধভাবে তা প্রতিহত করতে চেষ্টা করতো। অনেক সময় জমিদারদের পাইক পেয়াদাগণ প্রজাদের মারধর করতো এবং তাদের বিষয় সম্পত্তি বিনষ্ট করতো। তখন নির্যাতীত প্রজাগণ দুদু মিয়ার আশ্রয় নিত। ফলে জমিদারগণ ও নীল কুঠিয়ালগণ দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। দুদু মিয়ার অনুসারীদের উপর জমিদানগণ অকথ্য নির্যাতন চালাতে শুরু করে। তাঁরা দুদু মিয়ার মুরীদদের দু'জনের দাঁড়ি একত্রে বেঁধে নাকে মরিচের গুঁড়ো পূরে দিত। এ রকমের নির্যাতনের বৈশিষ্ট্য হলো এর কোন চিহ্ন থাকতো না। কিন্তু এ সমস্ত নির্যাতন নিপীড়নও বিপুল সংখ্যক প্রজাদেরকে তাঁর দলভুক্ত হতে বিরত রাখতে পারেনি। হিন্দু জমিদারগণ দুর্গা পূজার সময়ে দুর্গার মুর্তি সাজাবার জন্য মুসলমানদের উপর কর ধার্য করতো। এ ছাড়াও বিভিন্ন পূজা পার্বনের সময় মুসলমান প্রজাদের পূজার খরচ বাবদ কর দিতে হতো। ভীরু প্রজাগণ এ সমস্ত করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার সাহস পেতনা।

www.pathagar.com

তাই তারা এতকাল যাবত এ সমস্ত কর দিয়ে আসছিল। দুদু মিয়া ঘোষণা করেন এ দুনিয়ার মালিক আল্লাহ। ভূমির মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না এবং কেউ এর উপর কর ধার্য করতে পারে না। তিনি কৃষকদেরকে খাস মহলের জমিতে বসতি স্থাপন করতে নির্দেশ দেন। কারন সেখানে রাজস্ব ছাড়া আর কোন প্রকারের কর দিতে হতো না।

দুদুমিয়ার কার্যকলাপে জমিদারগণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ১৮৪১, ১৮৪৪ এবং ১৮৪৬ সালে অনেক মিথ্যা মামলা দায়ের করে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়াতে তিনি সকল মামলা হতে খালাস পান। দুদু মিয়া এ সময়ে এত শক্তিশালী হয়ে পড়েন যে নিভৃত পল্লীতে পর্যন্ত তার নির্দেশ প্রতিপালিত হতো। যে নামে নির্দেশ দেয়া হতো তা হলো "নাম না জানা আহমদ।"

তিনি জমিদার, সুদখোর মহাজন এবং নীল কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে প্রজাদের পক্ষ হয়ে সংগ্রাম করতে থাকেন। ১৮৪৬ খৃঃ পাঁচ চর ফ্যাক্টরীর কুঠিয়াল ডানলপের কুঠি আক্রমন করে তা পুড়িয়ে দেন এবং এতে তার ব্রাহ্মন গোমস্তা খুন হয়ে যায়। ফরিদপুরের দায়রা জজ দুদু মিয়া এবং তার ৬২ জন সহযোগীকে সাজা দিলেও সদর আদালত আপীলে তাদের খালাস দেয়া হয়।

ফরিদপুরের জেলা পুলিশ কর্মকর্তা দাম্পিয়েরের প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে দুদু মিয়া ৮০,০০০ লোক জমা করতে সক্ষম ছিলেন। এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটানো। কিন্তু তার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বিরুদ্ধে লুট-তরাজ ইত্যাদি সহিংস কার্যক্রমের অভিযোগ এনে সরকারকে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তাই তাঁকে আলীপুর জেলে রাজবন্দী হিসাবে আটক রাখাহয়।

www.pathagar.com

ইংরেজ শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার কোন প্রকারের প্রচেষ্টা দুদু মিয়া চালিয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাঁর সংগ্রাম জালেম জমিদার, সুদখোর মহাজন এবং নীল কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধেই সীমিত ছিল।

হাজী শরীয়ত উল্লাহ কর্তৃক জাগানো ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ঢেউতে যখন সারা পূর্ব বাংলা দুলছিল তখন পশ্চিম বাংলায়ও তীতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। বারাসাত জেলার অন্তর্গত নারিকেল বাড়িয়ার কয়েক মাইল দক্ষিন পশ্চিম কোনে চাঁদপুর গ্রামে তীতুমীরের জন্ম হয়। ঘটনাক্রমে তিনি দিল্লীর রাজকীয় পরিবারের সংস্পর্শে আসেন, এবং তাঁদের সংগে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। হজ্জ পালনের শেষে দেশে ফিরেন এবং হায়দারপুরে বসবাস শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তিনি কবর পূজা, পীর পূজার বিরোধীতা করতে থাকেন। তার অনুসারী-দেরকে দাড়ি রাখতে এবং বিশেষ ধরনের পোশাক পরতে উপদেশ দেন। মোদ্দা কথা ইসলামের মধ্যে যে সমস্ত অনৈসলামিক নীতি অনুপ্রবেশ করেছিল তিনি তা বিদূরনের প্রয়াস পান। হিন্দুরা তো বটেই এমনকি যে সমস্ত মুসলমানেরা তাঁর সংস্কার মূলক কর্মসূচী সমর্থন করত না তাদের সাথে মেলামেশা এবং খানাপিনা না করতে তিনি তাঁর সাগরেদদেরকে উপদেশ দিতেন। তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যমুনা ও ইছামতি নদীর মধ্যবর্তী দৈর্ঘে ১৮ হতে ২০ এবং প্রস্থে ১২-১৪ মাইল স্থানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠেন।

তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তিতে হিন্দু জমিদারগণ ভীত হয়ে পড়ে। তারা গুনিয়ার জমিদার রাম-নারায়ন, কুরগাছির জমিদারের নায়েব গৌর প্রসাদ চৌধুরী এবং পুরোয়ার জমিদার কিষেন দেব তীতুমীরের অনুসারীদের উপর নির্যাতন চালাতে থাকেন এবং অনেকের উপর জরি-মানা ধার্য করেন। রামনারায়ন তীতুমীরের জনৈক সাগরেদের দাঁড়ি

www.pathagar.com

উপড়ে ফেলে। পরোয়ার জমিদার কিষেনদের দাঁড়ির উপর ২'৫০টাকা ধার্য করেন। পুরোয়াতে এ কর আদায় করা সম্ভব হলেও সররাজপুরে এ রকমের কর আদায় করতে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন। সেখানে জমিদারের কয়েকজন কর্মচারীকে মারধোর করা হয় এবং একজনকে আটক রাখা হয়। জমিদারদের সশস্ত্র পাইকগণ গ্রামে প্রবেশ করলে পর দাংগা বাঁধে এবং জমিদারের লাঠিয়ালরা একটি মসজিদ পুড়িয়ে দেয়। প্রজারা তৎক্ষনাৎ এমর্মে থানায় এজহার দেয়। কিন্তু জমিদার ঘটনার ১৮ দিন পরে থানায় এ মর্মে এজহার দেয় যে মুসলমান প্রজাগণ মসজিদ পুড়িয়ে দিয়ে তাঁর নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। থানার হিন্দু দারোগা জমিদারের পক্ষাবলম্বন করে এবং মুসলমান প্রজাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট দেয়। এ মামলায় যারা মুসলমানদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল জমিদার তাদের নিকট থেকে অবৈধ কর আদায় করতে থাকে। কিছু লোক যারা এ মোকদ্দমায় মুসলমানদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল, জমিদার তাদের নিকট থেকে বাকী খাজনা বাবদ ৩৮ টাকা আদায় করেন যদিও তারা এ জমিদারের প্রজা ছিলনা। প্রজাগণ জমিদারের বিরুদ্ধে নালিশ করে কোন প্রকারের প্রতিকার পেতে ব্যর্থ হয়। তীতুমীর গোলাম মাসুম নামে তার এক সাগরেদকে কলিকাতা পাঠান জমিদারের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাবার আশায়, কিন্তু তিনি ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। তাই তারা বেপরোয়া হয়ে নিজেরাই তার প্রতিবিধানের সংকল্প গ্রহণ করেন। গোলাম মাসুম কলিকাতা হতে ফেরার পর তীতুমীর এবং তার অনুসারীরা মুইজুদ্দিন নামক এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে সমবেত হন। সেখানে মিসকিন শাহ নামে এক ফকিরও এসে যোগ দেন। ফলে মুইজুদ্দিনের বাড়ী তীতুর সদর দফতরে পরিণত হয়।

অতঃপর তীতুমীরের অনুসারীরা পুরোয়া বাজারে একটি গরু জবেহ করে এবং রক্ত মন্দিরের গায়ে লেপে দেয়। তারা আরো ঘোষণা করে যে বৃটিশ শাসনের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। যে মুসলমানদের নিকট থেকে বৃটিশ শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল এখন হতে সে মুসল-

www.pathagar.com

মানেরাই দেশের বৈধ শাসক। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে সাময়িক কায়দায় তারা একটি বাহিনীও গড়ে তোলে।

পুরোয়াতে তারা যা করেছিল লাউ ঘাটাতে তা করতে গেলে হরদেব রায়ের নেতৃত্বে হিন্দুরা তাদের বাধা দেয়। ফলে যে সংঘর্ষ বাঁধে তাতে হরদেব রায় নিহত ও অনেকে আহত হয়। তাদের কার্যক্রমের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তারা বিভিন্ন স্থানে গরু জবেহ করতে যাকে এবং যে দারোগা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল তাকে খুঁজতে থাকে।

কিষেণ দেব রায় তীতুমীরের বিরুদ্ধে বসিরহাট থানায় সাহায্য চান। তিনি বারাসাত আদালতেও একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি বরগুনিয়া নীল কারখানার গোমস্তা কর্তৃক তাঁর নায়েবকে লিখিত পত্রও থানায় পাঠান। এ পত্রে লিখা ছিল যে তীতুর অনুসারীরা "মউত কা খানা খেয়ে নিয়েছে" অর্থাৎ মৃত্যুর শপথ নিয়ে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্যে সকল রকমের প্রস্তুতি গ্রহন করেছে। এ ঘটনাকে যেন উপেক্ষা করা না হয়, সে বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে থানায় পত্র লেখা হয়। পার্শ্ববর্তী থানা থেকে ১০ জন বরকন্দাজ বসিরহাট থানার সহায়তার জন্যে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়। বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার দাংগাকারীদের গ্রেপ্তারের জন্যে বের হয়। তার সাথে ২০ জন সিপাহিসহ ১২৫ জন লোকের এক বাহিনী ছিল। তাঁরা নারিকেল বাড়িয়াতে পৌঁছে দেখেন যে সেখানে তীতুমীরের অনুসারীরা এক বাঁশের কেল্লা তৈয়ার করেছে এবং ৫০০/৬০০ লোক ঢাল, তলোয়ার, নেজা, বল্লম নিয়ে তাদের মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। গোলাম মাসুম ঘোড়ায় চড়ে তার বাহিনীর তদারক করছেন। এখানে যে সংঘর্ষ বাধে তাতে জমাদার, হাবিলদার, ১০ জন সিপাহি এবং ৩ জন বরকন্দাজ নিহত হয় এবং আলেকজান্ডার যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করেন। প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে তীতুমীরের বাহিনী বড়গুনিয়ার নীল ফ্যাক্টরী ধ্বংস করেন। এরপর কৃষ্ণ নগরের ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশও ইংরেজসহ ৩০০ লোকের এক বাহিনী নিয়ে তীতুমীরকে সায়েস্তা

www.pathagar.com

করতে যান। কিন্তু বিরোধী দল কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কয়েকটি মৃত দেহ ফেলে রেখে তিনিও পলায়ন করেন। এতে তাঁর নাজিরও নিহত হয়। অতঃপর দেশীয় সৈন্যের এক পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, দেহ রক্ষী বাহিনী এবং দু'টি কামান নিয়ে মেজর স্কট তীতুমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। এ অভিযানে অগ্রগামী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন আলেক জান্ডার। এক খন্ড যুদ্ধে একজন ইউরোপীয় সৈন্য নিহত হয়। পদাতিক বাহিনী এসে পৌঁছলে পর তীতুমীরের বাহিনীর উপর পূর্ণোদ্যমে আক্রমন চালানো হয়। কামান হতে কয়েক বার গোলা বর্ষনের ফলে বাঁশের কেল্লা ভেঙ্গে পড়ে এবং স্বাধীনতার প্রতীক পতাকা ভূলুন্ঠিত হয়। এ তীতুমীর সহ প্রায় ৫০ জন নিহন হন এবং তীতুর ৬৫০ জন অনুচরকে বন্দী করা হয়। তাদের বাড়ী ঘর লুট করা হয়। গোলাম মাসুমকে মৃত্যু দণ্ড দেয়া হয়। ১২৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়। বিচার চলাকালীন সময়ে ৪জন মারা যায় এবং ৫৩ জনকে অভিযোগোদায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

তীতুমীরের আন্দোলন শুরু হয়েছিল ধর্মীয় সংস্কার মূলক আন্দোলন রূপে। তিনি মুসলমান প্রজাদের উপর হিন্দু জমিদারদের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। হিন্দু জমিদার ইংরেজ কোম্পানীর ছত্র ছায়ায় মুসলমানদের উপর জুলুম চালাত। তীতুমীর কোম্পানীর কাছে প্রতিকার চেয়ে ব্যর্থ হন। তাই বাধ্য হয়ে তিনি কোম্পানী বিরোধী ভূমিকা গ্রহন করেন এবং তাঁর ধর্মীয় আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্য্যবসিত হয়।

ওহাবী আন্দোলনের

বংগ দেশে হাজী শরীয়ত উল্লাহ এবং তীতুমীর যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী সমাজের সংস্কার। পক্ষান্তরে সৈয়দ আহমদ বেরলভী পাঞ্জাবের শিখ শাসনের বিরুদ্ধে সারা ভারত ব্যাপী এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হায়ছিলেন।

www.pathagar.com

সৈয়দ আহামদ ১৭৮৬ খৃঃ রায় বেরলীতে জন্ম গ্রহন করেন। বাল্যাবস্থায় তাঁর লেখা পড়ার চাইতে 'বেশী ঝোঁক ছিল খেলার সংগী সাথীদের সাথে জেহাদের মহড়া দিয়ে বেড়ানো। ২২ বৎসর বয়সে তিনি শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর পুত্র শাহ্ আবদুল আজিজের মুরিদ হন। ১৮১৬ সালে তিনি তাঁর পীর আবদুল আজিজের নির্দেশে আকবরাবাদী মসজিদকে তাঁর আস্তানা হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন এবং সেখান থেকে লোকদেরকে হেদায়েতের পথে দাওয়াত দিতে থাকেন। শাহ্ আবদুল আজিজের দু'জন নিকট তম আত্মীয় শাহ্ মোহাম্মদ ইসমাইল এবং মোহাম্মদ আবদুল হাই তাঁর হাতে বায়েত হন। এতে তাঁর মর্যাদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অতঃপর তিনি তিশতিয়া, কাদেরিয়া. নক্সাবন্দিয়া এবং মুজাদ্দেদিয়া তরীকায় জনসাধারনকে মুরিদ করতে থাকেন এবং তাঁর মুরিদদের শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে যোগদানের জন্যে উজ্জীবিত করতে থাকেন। তিনি মনে করতেন যে ইংরেজগন বিধর্মী হলেও তাদের বিরুদ্ধ জেহাদের প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ তাদের শাসনাধীনে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু শিখ রাজত্বে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। তার রাজ্যে জামায়াতে নামাজ আদায় করা ও আজান দেয়া নিষিদ্ধ ছিল। কেউ গরু জবেহ করলে পর তাকে প্রাণ দন্ড দেয়া হত। মুসলিম মহিলাদেরকে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করে শিখদের সাথে বিয়ে দেয়া হত। তিনি মুসলমানদের যাবতীয় ধর্মীয় অধিকার কেড়ে নিয়ে ছিলেন। মুসলমানদের উপর নির্যাতনের কারনে রণজিত সিং হিন্দুদের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন (১০৫)। তাই তাঁর মতে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা মুসলমানদের জন্যে ফরজ ছিল।

শিখদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে জেহাদে উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে তিনি সারা ভারতময় আন্দোলন গড়ে তুলেন এবং মুসলমানদের বিপুল সমর্থন লাভ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদ ও হুগলী হয়ে ১৮২১

(১০৫) ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক—The British Policy and the Muslims in Bengal (1757—1857)

www.pathagar.com

সালের শেষের দিকে কলকাতায় পৌঁছলে তাঁকে রাজকীয় সম্বর্দ্ধনা দেয়া হয়। তাঁর কলকাতায় অবস্থানকালে লোকের এত ভীড় হতো যে তাঁর হাতে হাতে রেখে বায়েত গ্রহন করা সম্ভব ছিলনা। তিনি ৭/৮ খানা চাদর জনসাধারনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। যে চাদরের কোন অংশ ছুঁতে পারত সেই তার মুরীদ বলে গন্য হত। তিন মাস কলকাতায় অবস্থানের পর তিনি মক্কায় হজ্জ করতে যান সেখানেও অনেক তাঁর মুরীদ হন। মক্কা থেকে ফিরে তিনি উত্তর ভারত এবং কলকাতা সফর করেন এবং জনসাধারনকে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। পাটনায় সৈয়দ আহমদের সদর দফতর স্থাপিত হয় এবং জেহাদ প্রচারের দায়িত্ব এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলী নামক দুই ভাইকে দেয়া হয়। সেখান থেকে তাঁর খলিফাগন বংগদেশ এবং বিহারে জেহাদের কথা প্রচার করতে থাকেন। এতদুদ্দেশ্যে জৈনপুরের মাওলানা হযরত কেরামত আলী সাহেব নোয়াখালী, ঢাকা, চাটগাঁও, মোমেনশাহী, ফরিদপুর এবং বরিশাল সফর করেন। ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ এবং বগুড়াতে এনায়েত আলী প্রচার কার্য্য চালাতে থাকেন। সনসাময়িক কালের কলকাতা রিভিউতে বলা হয়েছে "এতদঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে জেহাদের ভাবধারা উজ্জীবিত করতে কিছু সময় ব্যয় হয়। কিন্তু যখন জেহাদের ধারনা তাদের বোধগম্য হয় তখন যেন বাংগালী মুসলমানদের প্রানে ইসলামী জোশের জোয়ার আসে।"

শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনার জন্যে সৈয়দ আহমদ বেরলভী ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলকে বেছে নেন। প্রথম দিকে তিনি কিছুটা সফলতা লাভ করলে পরেও সে অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা, পাঠানদের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সৈয়দ আহমদ কর্তৃক ইসলামী বিধি নিষেধ কড়াকড়ি ভাবে আরোপের ফলে স্থানীয় জনসাধারনের মধ্যে তাঁর জন প্রিয়তা হ্রাস পায়। ফলে ১৮৩১ খৃঃ বালাকোটের যুদ্ধে তিনি এবং তাঁর প্রধান অনুচর শাহ ইসমাইল শাহাদত বরণ করেন।

www.pathagar.com

সৈয়দ আহমদের শাহাদতের পরেও ওহাবীগন নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েনি বা আন্দোলনে ভাঁটা পড়েনি। বালাকোটের বিপর্যয়ের পরে মোজাহিদগন মুহাম্মদ কাসেমের নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশের সিত্তানায় তাঁদের সদর দফতর স্থাপন করে। এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলী বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচার কার্য চালিয়ে অসংখ্য মোজাহেদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। এ বিষয়ে হান্টার সাহব তাঁর ইন্ডিয়ান মুসলমান বইতে লিখেছেন বাংলার মুসলমানেরা আবার এক বিচিত্র রুপ ধারন করেছে। আমাদের সীমান্তে বিদ্রোহীদের উৎপাত চলেছে বহুদিন যাবত। তারা একেক দল ধর্মান্ধকে পাঠিয়েছে, যারা আমাদের শিবির অক্রমন করেছে, গ্রাম পুড়িয়েছে, আমাদের প্রজাদের হত্যা করেছে এবং আমাদের সেনাবাহিনীকে তিন তিনটি ব্যয় বহুল যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। আমাদের সীমান্তের ওপারে মাসের পর মাস ধরে গড়ে উঠা শত্রুবসতির লোক সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক মোকদ্দমার বিচার থেকেই প্রমানিত হয় যে আমাদের প্রদেশ সমূহের সর্বত্র বিস্তারিত হয়েছে এক ষড়যন্ত্রের জাল। পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত পর্বত রাজীর সংগে গংগা অববাহিকার জলা ভূমি অঞ্চলের যোগ সুত্র স্থাপিত হয়েছে রাজদ্রোহীদের নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশের মাধ্যমে। সুসংগঠিত প্রচেষ্টায় তারা বঙ্গীপ অঞ্চল থেকে অর্থ ও লোক সংগ্রহ করে এবং দু' হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্রোহী শিবিরে তা চালান করে দেয় আমাদেরই তৈরী করা রাস্তা দিয়ে। তীক্ষ্ম বুদ্ধি এবং বিপুল সম্পদের অধিকারী বহু লোক এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। সুকৌশলে অর্থ পাচারের এমন এক পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করছে যাতে রাজদ্রোহের চরম বিপদ সংকুল অভিযান রুপান্তরিত হয়েছে, নিরাপদ ব্যাংক ব্যবসার আদান প্রদানে।'' (১০৬)।

---

(১০৬) W. W. Hunter —The Indian Mussalman.
(এম আনিসুর রহমান কর্তৃক অনুদিত)

www.pathagar.com

হান্টার সাহেবের উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সিত্তানা শিবিরে মোজাহিদ বাহিনীর লোক বল এবং অর্থ বলের প্রধান উৎস ছিল বাংলাদেশ।

সৈয়দ আহম্মদ বেরলভীর জেহাদ ছিল শিখদের বিরুদ্ধে। তাঁর শাহাদাতের পরেও মোজাহিদগণ শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ অব্যাহত রেখে ছিল। এতে কখনও তারা সফলতা লাভকরেছে আবার কখনো ব্যর্থ হয়েছে। পাঞ্জাবের শাসন কর্তা রণজিত সিংহের মৃত্যুর পর শিখ রাজ পরিবারে গৃহ বিবাদ শুরু হয় এবং সে সুযোগে ইংরেজরা পাঞ্জাব দখল করে নেয়। তখন মোজাহিদগনের সাথে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়। এ সংগ্রামে কোন কোন সময়ে বৃটিশদেরকে চরম ভাবে নাজেহাল হতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোজাহিদগন এ দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে সক্ষম হয়নি। তবে এ কথা নিদ্বিধায় বলা চলে যে শহীদ সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ভারতে ইসলামের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল তার পুরোধা ছিল বাংলাদেশের মুসলমানগন।

সিপাহী বিপ্লব

১৮৫৭ সাল। ভারতীয় উপমহাদেশে তখন অনেকেরই বিশেষ করে মুসলমানদের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি আস্থা ছিল। ভবিষ্যদ্বানীটি ছিল এদেশে কোম্পানীর শাসন শত বৎসরের বেশী স্থায়ী হবেনা।

কোম্পানী এ দেশে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য বিশেষ ভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এ দেশে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্যে তারা বাইবেলের বাংলানুবাদ করায়। এর জন্য তারা হিন্দু পন্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করে। হিন্দু পন্ডিতগণ এ সুযোগে আরবী এবং ফার্সী শব্দ বহুল বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার রুপদানের প্রয়াস পায়। এত কাল যাবত যে সমস্ত আরবী ও ফার্সী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রচলিত ছিল তা বিদূরিত করে তাঁরা তার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা হতে শব্দ আমদানী করেন। অপর

www.pathagar.com

দিকে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদের অপকৃষ্টতা প্রমাণের জন্যে কোম্পানী বহু টাকা ব্যয়ে ম্যাক্সমুলারকে দিয়ে বেদের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করে। তা'দের ধারনা ছিল যে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু যুবকগন হিন্দু ধর্মের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহন করবে। তাদের এ উদ্দেশ্য কিছুটা সফলও হয়েছিল। অনেক নব্য শিক্ষিত হিন্দু যুবক নিজেদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহন করেছিল। তাই এদেশের লোকের ধারনা জন্মে ছিল যে তাদেরকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করাই কোম্পানীর উদ্দেশ্য।

এ দিকে কোম্পানী সিপাহীদের ব্যবহারের জন্যে এনফিল্ড রাইফেলের প্রচলন করে। এ রাইফেলের টোটা দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে হতো। এ সময়ে গুজব রটে যে এ টোটায় শুয়র এবং গরুর চর্বি মিশ্রিত আছে। তাই মুসলমান এবং সাধারন হিন্দু সিপাহীদের মধ্যে অসন্তুষ্টির ভাব দেখা দেয়।

মুসলমান সিপাহীরা বিশ্বাস করত যে এ দেশে কোম্পানীর শাসন শত বৎসর কালের বেশী স্থায়ী হবেনা। এর পর সারা ভারতে আবার মুসলিম শাসন প্রতিষ্টিত হবে। এ বিশ্বাস বুকে ধারণ করে তারা কোম্পানীর আজ্ঞাবহ নামে মাত্র দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে প্রকৃত সম্রাট ঘোষনা করে কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মীরাট, দিল্লী এবং লাক্ষ্ণৌতে এ বিদ্রোহ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। অবশ্য কোম্পানী প্রভুভক্ত শিখ, পাঞ্জাবের অধিবাসী, দেশীয় বরদ রাজ্যের রাজা এবং পদলেহী জমিদারদের সহায়তায় এ বিপ্লব ব্যর্থ করে দেয়।

বাংলাদেশের মুসলিম সিপাহীরাও একে জেহাদ মনে করে এতে অংশ গ্রহন করে। সিপাহী বিপ্লবের বর্ণনা প্রসংগে আসকার ইবনে শাইখ তাঁর "কালো রাত তারার ফুল" নামক বইতে লিখেছেন "চটগ্রামে ছিল ৩৪ নম্বর রেজিমেন্টের দল। ১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর রাত্রিকালে তাহারা কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্তেজনা প্রকাশ করেন। সিপাহীদের বুঝাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করেন তাহাদের

www.pathagar.com

ইংরেজ অধিনায়ক কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। বরং কোন কোন সিপাহী সেই অধিনায়ককে গুলি করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু অন্যেরা ইহাতে বাধা দেয় এবং অধিনায়ককে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিরাপদ স্থান চলিয়া যাইতে অনুরোধ করে। অধিনায়ক উপায়ান্তর না দেখিয়া ইউরোপীয়দিগকে সংবাদ দিবার জন্য তাহাদের গৃহে গমন করেন। তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই কেহ কেহ সিপাহীদের মেজাজ মর্জির সংবাদ পাইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এইবার সিপাহীদের অধিনায়ক এবং বাদবাকী ইউরোপীয়গন ছদ্মবেশে সাধু-সন্ন্যাসী সাজিয়া এবং কবীর প্রমুখ সাধুদের দুই এক লাইন দোহা অশুদ্ধ ভাবে গাহিয়া গাহিয়া জংগলময় পথ দিয়া পলায়ন করিলেন। তাহাদের পথ প্রদর্শক হইল কালেকটর সাহেবের বেহারগন।

এই দিকে উত্তেজিত সিপাহীরা খাজাঞ্চি খানার প্রায় তিন লক্ষ টাকা হস্তগত করিয়া জেলখানায় কয়েদীদের মুক্ত করিয়া, সেনানিবাস ভস্মীভূত করিয়া অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিল। কোম্পানী সরকারের তিনটি হাতি ও দুইটি ঘোড়ার উপর নিজেদের জিনিষপত্র বোঝাই করিয়া চট্টগ্রামের সিপাহীদল ত্রিপুরা অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহাদের পরিচালক নির্বাচিত হইলেন একজন হাবিলদার নাম রজব আলী খান। চট্টগ্রামের সিপাহীদল কোন ইউরোপীয়কে আক্রমন করে নাই, কাহাকেও হত্যাকরে নাই। শুধু মাত্র জেলখানার একজন বরকন্দাজ তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া নিহত হয়। সুতরাং ধারনা করা চলে যে দেশকে স্বাধীন করার মহান এক অনুভূতিতে তাহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার পথে চলিতে তাঁহাদের এই আশা আরও দৃঢ় হইতেছিল যে, ত্রিপুরার মহারাজ মানিক্য বাহাদুর স্বাধীনতা ব্রতী সিপাহীদলকে আশ্রয় দিবেন, নেতৃত্ব দিবেন। কিন্তু যে একটি সামান্য ভুল তাঁহারা করিয়াছিলেন তাহা এই কোম্পানীর নিজ হাতে সৃষ্টি করা মানিক্য বা অন্য কোন বাহাদুর সহসা প্রভু সেবা ব্রত ত্যাগ করেন না। তাই, চট্টগ্রামের কমিশনার সাহেব যখন ত্রিপুরার মহারাজকে উত্তেজিত সিপাহীদের গতিরোধ বা ধ্বংস সাধন করিতে

www.pathagar.com

অনুরোধ জানাইলেন, তখনই এক পরম ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ত্রিপুরার মানিক্য বাহাদুর। সিপাহী বৃন্দ সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া কোম্পানীর রাজ্য পরিত্যাগের বাসনায় ''স্বাধীন' ত্রিপুরার মাটিতে পা রাখিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ত্রিপুরার মহারাজা যে কোম্পানীর হিত কামনায় ব্রতী হইয়াছেন। সিপাহীদের আগমন সংবাদ পাইয়া মানিক্য বাহাদুর বহু সংখ্যক অস্ত্রধারী লোক তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সব অস্ত্রধারীরা ২রা ডিসেম্বর সিপাহীদের গতিরোধ করিল।

মর্মাহত সিপাহীবৃন্দ আর অগ্রসর হইলেন না। পূর্ণর্বার কোম্পানীর রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া কুমিল্লার অদূরবর্তী লালমাই পাহাড়ের দিকে যাইতে লাগিলেন। এই পার্বত্য স্থান অতিক্রমের সময় তাঁহাদের কষ্টের এক শেষ হইল। ত্রিপুরা-রাজ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত জমিদার গনের নিয়োজিত অস্ত্রধারীদের হাতে সিপাহীদল বারবার নিপীড়িত হইতে লাগিল। হাতি তিনটি তাহাদের অধিকার চ্যুত হইল, মুক্ত কয়েদীদের অনেকেই ধৃত হইল। সিপাহীদের দশ হাজার টাকা হস্তভ্রষ্ট হইয়া গেল। উপায়ান্তর না দেখিয়া রজব আলী খাঁ তাঁহার সিপাহীদলকে নিয়া মনিপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেন শ্রীহাট্টে। ১৫ই ডিসেম্বর শ্রীহট্টে এতদ্দেশীয় পদাতিক দলের অধিনায়ক মেজর বাইঙ্কে সিপাহীদের মোকাবিলা করিতে আদেশ দিলেন শ্রীহট্টের প্রধান রাজকর্মচারী এলেন সাহেব। মেজর বাইঙ তদানুসারে নিজ সৈন্যদল নিয়া প্রতি-রোধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। শ্রীহট্ট হইতে ৮০ মাইল দূরে প্রতাপ গড় নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে সিপাহীরা শীঘ্রই লাতু নামক স্থানে উপনীত হইবে। লাতু প্রতাপগড় হইতে শ্রীহট্টের দিকে প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। তদানুযায়ী মেজর বাইঙ চলিলেন লাতুর দিকে। লাতুর দিকে। লাতুতে মুখোমুখি হইল চট্টগ্রামের স্বাধীনতা ব্রতী সিপাহীর দল এবং কোম্পানীভুক্ত শ্রীহট্টের সিপাহীদল। কোম্পানীভুক্ত সিপাহীদল সংগীন উঁচু করিয়া ধরিল। অগত্যা আরম্ভ

www.pathagar.com

হইল যুদ্ধ। মেজর বাইও নিহত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও অবদমিত হইলনা শ্রীহট্টের দল প্রবল পরাক্রমে তাহারা চট্টগ্রামের সিপাহীদের আক্রমণ করিয়া চলিল। জয়ের কোন আশা নাই দেখিয়া স্বাধীনতা ব্রতী সিপাহীরা লাতু ও মনিপুরের মধ্যবর্তী দুর্গম অরণ্যে আত্ম গোপন করিলেন। অনেক কষ্টের পর প্রবেশ করিলেন তাঁহারা মনিপুরে রাজ্যে।

১৮৫৮ সালের ,৯ই জানুয়ারী শ্রীহট্টের সিপাহীগণ আবার আক্রমণ করিল। এইসব আশ্রয়প্রার্থী স্বাধীনতাকামী সিপাহীগণকে দমনে মনিপুর রাজের সায় ছিল নিশ্চয়ই। এইবার শ্রীহট্টের সীপাহীদের অধিনায়ক জমাদার জগধীর সিংহ। দুই ঘন্টা ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। মুষ্টিমেয় স্বাধীনতাকামীর সম্মুখে ঘনাইয়া আসিল পরাজয়ের গ্লানি বা অন্ধকার রাত্রি। আবার তাহাদের আশ্রয় গ্রহন করিতে হইল পার্বত্য প্রদেশের ঘন জংগলে। এই সিপাহীবৃন্দ কোথাও কোন লুঠতরাজ করেন নাই, আশ্রয় গ্রহন করেন নাই কোন হীন কার্যের। তাহারা কামনা করিয়াছিলেন : এই দেশ স্বাধীন হোক। প্রয়োজনে সেই স্বাধীনতার জন্য নিজদের জীবনদানে প্রস্তুত হইয়া তাঁহারা পথে নামিয়াছিলেন। আশা ছিল এই মহৎ কাজে তাঁহাদের নেতৃত্ব দান করিবেন ত্রিপুরার মহারাজা, মনিপুরের মহারাজা।

নেতৃত্বের আশায় তাঁহারা পথে প্রান্তরে পাহাড় জংগলে অশেষ দুঃখ কষ্টই ভোগ করিলেন শুধু। আগাইয়া আসিতে দেখিলেন না কোন "সম্ভ্রান্ত" "প্রাতঃস্মরনীয়" রাজ পুরুষকে। শেষে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন দেশের স্বাধীনতা ব্রতী কয়েকজন বীর সিপাহী চির দিনের জন্য।" (১০৭)।

"ঢাকা শহরে ১৮৫৭ সালের মার্চ মাস থেকেই সাধারণ মানুষ আশংকা প্রকাশ করেছিল বিদ্রোহের। ইংরেজদের বলা হতো গোরা সিপাহী আর দেশীয় সিপাহিদের বলা হতো কালো সিপাহী। হৃদয় নাথের ঢাকা নামক বইতে উল্লেখ আছে যে, "কালো সিপাহীরা ছিল

(১০৭) আশকার ইবনে সাইখ—কালো রাত তারার ফুল

www.pathagar.com

শক্ত সামর্থ, অমায়িক এবং এজন্যে শহরের মুসলমান অধিবাসীদের নিকট তারা ছিল খুব জনপ্রিয় (১০৮)।"

সিপাহীরা থাকত তখন লালবাগ কিল্লায়। আমীর হাবিবুল্লাহ নামক জনৈক পাঠান সুবেদার ছিলেন। আসন্ন ঝড়ের আলামত তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনিও প্রয়োজনবোধে মুসলমানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে শাহাদত কবুলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

২১শে ডিসেম্বর তিনি স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তার মোহরানা এবং কিনে এনেছিলেন নিজের কাফনের কাপড়। স্ত্রী তাঁর এরকম আচরণের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন কালো সিপাহীদের সাথে গোরা সিপাহীদের সংঘর্ষের সম্ভাবনার কথা। সুবেদারের পাশের বাসায় থাকতেন ব্যবসায়ী গনি মিয়ার (পরবর্তীকালে নবাব স্যার আবদুল গনি) এক আত্মীয়া। সুবেদারের স্ত্রীকে বিষন্ন দেখে গনি মিয়ার আত্মীয়া কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সুবেদারের স্ত্রীও তাঁর স্বামীর আশংকার কথা প্রকাশ করে দিলেন। আত্মীয়াটি অতিরঞ্জিত করে সংবাদটি গনি মিয়াকে পরিবেশন করলেন। গনি মিয়া এ খবর কমিশনারকে জানিয়ে দিলেন। হয়তো এ সংবাদ পেয়েই ইংরেজগণ লালবাগ কেল্লায় হামলা চালিয়েছিল।

২১শে নভেম্বর গোয়েন্দা সূত্রে চাঁটগায়ের সিপাহীদের বিদ্রোহের খবর ঢাকায় পৌঁছলে লেঃ লুইস সামরিক ও বেসামরিক লোকদের একটি বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্ত নিলেন যে ঢাকার দেশী সিপাহিদের নিরস্ত্র করতে হবে।

২২শে নভেম্বর সকাল পাঁচটায় জড়ো হতে বলা হয়েছিল স্বেচ্ছা-সেবকদের। কিছু সিভিলিয়ান এবং কুড়িজন স্বেচ্ছাসেবক মিলিত হয়েছিল ভোরের আলো ফোটার আগেই। লেঃ লুইস, লেঃ ইধবিয়ান, লেঃ ডডওয়েল, ম্যাকফারসন প্রমুখ অগ্রসর হয়েছিলেন লালবাগ কেল্লার দিকে। একই সময়ে লেঃ রীন্ড, ফরবেস, হ্যারিস, স্বেচ্ছাসেবী নলেন, পোগোজ, স্যামুয়েল জনসন ও জন আরমান রওয়ানা হলেন সরকারী কোষাগারের দিকে সিপাহীদেরকে নিরস্ত্র করার জন্যে।

---

(১০৮) মোন্তাসীর মামুন—হৃদয় নামের ঢাকা

www.pathagar.com

নৌ সেনারা লালবাগ পৌঁছে দেখলো সিপাহীরাও প্রস্তুত। প্রহরীরা গুলি ছুঁড়ল। ইংরেজ পক্ষের একজন মারা গেল। অন্যান্য সিপাহীরাও আরম্ভ করেছিল গুলি ছোঁড়া। নৌ সেনারা অগ্রসর হয়েছিল কেল্লার দক্ষিন দিকের ভাংগা ফটক দিয়ে। এ ফটক রক্ষার জন্যে দুর্গের ভিতর পরী বিবির কবরের সামনে বসানো হয়েছিল কামান। নৌসেনারা ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র উড়ে এসেছিল এক ঝাঁক গুলি। লেঃ লুইস সৈন্যদের নিয়ে বাঁ দিকে দুর্গ প্রাচীরের উপরে উঠে বেয়নেট চার্জ করে পিছু হটিয়ে দিলেন সিপাহীদের। সিপাহীরা আশ্রয় নিল নিজদের আস্তানায় কিন্তু ইংরেজ সৈন্যরা খুঁচিয়ে বের করেছিল তাদেরকে। এভাবে ঢাকায় আজাদী সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সিপাহী বিপ্লবের পর ঢাকার মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছিল তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায় প্রত্যক্ষ দর্শী নারিন্দার পীর সাহেব হযরত শাহ আহসান উল্লাহর পরবর্তীকালের মুখনিঃসৃত বাণী হতে।

১৯২১ সালে মূলতঃ গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন চলছিল। মাওলানা মুহাম্মদ আলী তখন অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তিনি কার্যোপলক্ষে ঢাকায় আসেন এবং হযরত কেবলার সাথে দেখা করে তাঁকে অনুরোধ করেন যাতে করে মুসলমানেরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। মাওলানা মুহাম্মদ আলী হযরত কেবলার নিকট আরজ করেন তিনি যেন তাঁর মুরীদগণের প্রতি খেলাফত ও অসযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্যে ফরমান জারী করেন। ১৩৯৩ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় দেওয়ান নুরুল আনোয়ার চৌধুরী রুশাদী প্রণীত "হযরত কেবলা" বইকে ভিত্তি করে তাঁর সম্পর্কে নিবন্ধ লিখেন। তাতে তিনি লিখেন "১২৯২১ খৃষ্টাব্দে দেশে অসহযোগ আন্দোলনের এক ঢেউ বহিয়া যায়। মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী প্রমুখ ও আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। একটি

www.pathagar.com

কনফারেন্স উপলক্ষে তাঁহারা ঢাকায় আগমন করেন। তাঁহারা হযরত কেবলা (রাঃ) সংগে সাক্ষাৎ করিয়া বাংলা ও আসামের মুসলমানদের বিশেষ করিয়া তাঁহার মুরিদানকে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য একটি হুকুম নামা জারী করার জন্যে আবেদন জানান। হযরত কেবলা (রাঃ) মৃদু হাসিয়া বলেন বাবা আমি নিজ চক্ষে সিপাহী বিদ্রোহ দেখিয়াছি (১৮৫৭)। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুগন আমাদের সাথে প্রতিজ্ঞা ভংগ করিয়া আমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সেই ভয়াবহ দৃশ্য এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই। স্বাধীনতার জন্য মুসলমানেরা দলে দলে কামান ও বন্দুকের সম্মুখীন হইয়াছে। হজার হাজার ওলেমা হাদী রাহবরকে শূলে চড়ানো হইয়াছে। তাহাদের বাড়ী ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। অপর পক্ষে হিন্দুগন দলে দলে ইংরেজ গভর্ণরমেন্টের চাকুরীতে ভর্তি হইয়াছে। আমরা পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ ও (১৮৫৭) সনের সিপাহী বিদ্রোহের ধাক্কা এখনও সামলাইতে পারি নাই। এখন যদি আমরা হিন্দুদের সাথে যোগদান করি, তাহাদের (গান্ধী প্রমুখ) লিডার শীপ মান্য করিয়া চলি এবং আমাদের মক্তব, মাদ্রাসা ও স্কুল কলেজ বন্ধ করিয়া দেই তাহা হইলে আমরা ১৮৫৭ সালের মত আরও পঞ্চাশ বৎসর হিন্দুগণের পিছনে পড়িয়া যাইব। আপনারা এখন মুসলমান সমাজের কর্ণধার, গান্ধীর মত পোষন করিয়া স্বীয় অসহায় সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইবেন না। এই আন্দোলনের প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, আপনাদের ইংগীতেই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান আলীগড়ের এম, এ, ও, কলেজ ও উহার সংগে সংগে কলিকাতা মাদ্রাসা (বাংলার মুসলমানদের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ও কুমিল্লার হোসেনিয়া মাদ্রাসা (পূর্ব বাংলার ও আসামের এক মাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান) ধর্ম ঘট করে। কিন্তু খবরের কাগজের কোন পৃষ্ঠায় বেনারস হিন্দু কলেজ কিংবা সংস্কৃত কলেজের ধর্ম ঘটের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই সংস্কৃত কলেজই আমাদের বাংলা ভাষা হইতে ইসলামিক শব্দ তুলিয়া সংস্কৃত

www.pathagar.com

ও পৌত্তলিক শব্দ যোজন করিয়া মুসলমানদের প্রিয় বাংলা ভাষাকে অনৈসলামিক করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। এই জনপূর্ণ জাহাংগীর নগরের বুকে শত সহস্র মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণকে প্রায় জামে মসজিদে এবং বৃহৎ বটগাছে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল। ভয়ে ও আতংকে মুসলমানগণ এই শহর ত্যাগ করিয়াছিল বিধায় আজ ঢাকা জনশূন্য বিয়াবানে ও অরন্যে পরিণত হইয়াছে। মুসলমানগণের মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষাসমূহ এখনও এই অরন্যের মধ্যে বিরাজমান আছে। আমি এখন ১২১ বৎসর পাড়ি দিয়া চলিয়াছি। আমার অভিজ্ঞতা হইতে অনুরোধ এই যে, কংগ্রেস হইতে এখনই আপনারা চলিয়া আসুন ও হিন্দুগণের বিশেষতঃ মিঃ গান্ধীর লিডারসীপ ত্যাগ করুন ও নিজের পায়ের উপরে দাঁড়ান এবং খাজা স্যার সলিমুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগকে পরিপুষ্ট করেন। উত্তর কালে ইহাই হইবে আপনাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আলী ভ্রাতৃদ্বয় বিনয়ের সংগে বলিলেন 'হযরত কেবলা (রঃ) রাজনৈতিক অবস্থা দ্রুত পরিবর্তন শীল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় আর বর্তমান সময়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এখন এই সুযোগে আমরা হিন্দু মুসলমানগণ একত্রে এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিদেশী ইংরেজ শাসকগনকে গর্দান ধরিয়া আমাদের মাতৃভূমি হইতে চিরতরে বাহির করিয়া দিতে হইবে। নিশ্চয়ই আমরা তাহা পারিব। "হযরত কেবলা (রাঃ) বলিলেন' "বাবা আমি দেখিতেছি যে ঐদিন আর অনেক দিন দূরে নয় যে দিন আপনারাও কংগ্রেস হইতে হিন্দুগণের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া সরিয়া পড়িবেন। দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা আপনাদিগকে সুবুদ্ধি দান করুন ও সীরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম রাখুন (১০৯)"। হযরত কেবলার দোয়া ব্যর্থ হয়নি। এর পরে কোহাটে হিন্দু মুসলমানে দাংগা বাঁধে। মওলানা শওকত আলী দাংগার কারণ অনুসন্ধান করে হিন্দুদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেন, আর গান্ধী দাংগার দায়

(১০৯) দেওয়ান নুরুল আনোয়ার চৌধুরী, হযরত শাহ্ আহ্সান উল্লা (রঃ) প্রকাশিত ৩১ শে জ্যৈষ্ঠ দৈনিক সংগ্রাম।

www.pathagar.com

দায়িত্ব মুসলমানদের ঘাড়ে চাপান। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। নূরুল আনোয়ার চৌধুরী সাহেব আরও জনান যে "পরে গৌহাটি কংগ্রেস কনফারেন্স হইতে হযরত কেবলার বক্তব্য সঠিক প্রমানিত হয়। আলী ভ্রাতৃদ্বয় কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়েন এবং মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমির দাবী উত্থাপন করেন (১১০)।"

মুসলমানগণ যখন জাতীয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যে মরণ পণ সংগ্রামে লিপ্ত তখন প্রতিবেশী বর্ণ হিন্দুদের মুসলিম বিরোধী এবং বৃটিশ প্রীতি কার্যক্রম সম্পর্কে হযরত শাহ আহসান উল্লাহর (রঃ) বক্তব্য হতে পুরোপুরী না হলে ও কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ণ হিন্দুদের মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় হিন্দু সাহিত্যিকদের লেখনীতে। সে সময়ের বহুল প্রচলিত সংবাদ পত্রের নাম "সংবাদ প্রভাকর"। এর সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র ছিল এ পত্রিকা। এ পত্রিকায় ২০-৬-১৮৫৭ তারিখে সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে নিবন্ধ প্রকাশিত হয় তা হলো "কয়েক দল অধার্মিক অবাধ্য—অকৃতজ্ঞ হিতাহিত বিবেচনা বিহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্মিকতা পূর্বক রাজ বিদ্রোহ হওয়াতে রাজ্য বাসি শান্ত স্বভাব, অধণ সধন প্রজামাত্রেই জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন "এই দণ্ডেই হিন্দুস্থানে পূর্ববৎ শান্তি স্থাপিত হউক, রাজ্যের সমুদয় বিঘ্ন বিনাশ হউক। হে বিঘ্নহর—তুমি সমুদয় বিঘ্ন হর—সকল উপদ্রব নিবারণ কর—প্রজাবৎসল সুধার্মিক, সুবিচারক ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এর জয় পতাকা চিরকাল সমভাবে উড্ডডীয়মান কর। অত্যাচারি—অপকারি বিদ্রোহকারী দুর্জনদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর। যাহারা গোপনে অথবা প্রকাশ্য ভাবে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগনকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা দিগকে দণ্ড দান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপন আপন অপরাধ বৃক্ষের ফলভোগ করুক।

---

(১১০) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার চৌধুরী, হযরত শাহ্ আহসান উল্লাহ (রঃ) প্রকাশিত ৩১ জৈষ্ঠ দৈনিক সংগ্রাম।

www.pathagar.com

লোকের সংখ্যা নিরূপন করিতে পারিনা, আমাদিগের সাথে যখন যাহার সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি প্রসংগ মাত্রেই এই প্রকার উক্তি করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ বংগদেশের সমস্ত প্রজা নিতান্ত প্রভুভক্ত, ইহারা নিরন্তরকে বল শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরীর প্রতুল প্রত্যাশা করে তাহাতে রাজপুরুষদের রাজলক্ষী ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী হয়েন, একাগ্রচিত্তে তাহারি অতিলাষ করে, স্বপ্নে ও কখনো অমংগল চিন্তা করেনা, কারণ বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অধীনতায় অধুনা দুর্বল, ভীরু বাংগালী ব্যুহ যেরূপ সুখ সচ্ছন্দতা সম্ভোগ পূর্বক সানন্দে বাস করিতেছে, কস্মিনকালেও তদ্রূপ হয় নাই, রাম রাজ্য আর কাহাকে বলে? এই রাজ্যইতো রাম রাজ্যের ন্যায় সুখের রাজ্য হইয়াছে। আমরা যথার্থ রূপ স্বাধীনতা সহযোগে পদ, মান, বিদ্যা এবং ধর্ম কর্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখি হইয়াছি; কোন বিষয়েই ক্লেশের লেশমাত্র জানিতে পারি না, জননীর নিকট পুত্রেরা লালিত হইয়া যদ্রূপ উৎসাহের ও সাহসে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্তকরনকে কৃতার্থ করেন আমরা ও অবিকল সেইরূপ পৃথিবীশ্বরী ইংলণ্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্বমতে চরিতার্থ হইতেছি।

.....

যবনাধিকারে আমরা সর্ব বিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই নাই। সর্বদাই অত্যাচারের ঘটনা হইত। মহরমের সময় সকল হিন্দুকে গলায় বদি অথাৎ যাবনিক ধর্ম সূচক একটা সূত্রে বাঁধিয়া দর্গায় যাইতে হইত, গমি অথ্যাৎ নীরব থাকিয়া "হাসন" "হোসেনের" মৃত্যুর জন্য শোক চিহ্ন প্রকাশ করিতে হইত। কাছা খুলিয়া কুর্নিশ করিয়া "মোর্চ্ছে" নামক গান গাহিতে হইত। তাহা না করিলে শোনিতের সমুদ্র প্রবাহিত হইত। এক্ষনে ইংরেজাধিকারে সেই মনস্তাপ একে কালেই নিবারিত হইয়াছে, আমরা অনায়াসেই চর্চ্চ নামক খৃষ্টীয় ভজনা মন্দিরের সম্মুখেই গভীর স্বরে ঢাক-ঢোল, কাড়া, কাঁসা, নহবৎ, সানাই, তুরী, ভেরী বাদ্য করিতেছি, ছাড়াং শব্দে বলিদান করিতেছি, নৃত্য করিতেছি, প্রজাপালক রাজা তাহাতে বিরক্ত না হইয়া উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। লার্ড সাহেবের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া কোন কোন পল্লীর

www.pathagar.com

হিন্দুরা ঢাক, ঢোল, কাঁসর ঘণ্টার বাদ্য করিয়া প্রতিমা বিসর্জন করিতে যাইতেছেন, তাহাতে রাজ পক্ষীয় প্রহরি প্রভৃতি কেহই 'টু' শব্দটি করে না। নবাবী সময়ে আদব কায়দা করিতে করিতে কর্মচারিদিগের প্রানান্ত হইত, গাড়ী, পাল্কি চড়া দূরে থাকুক হুজুর দিগের চক্ষে পড়িলে হুজুর মত সং সাজিয়া প্রান হাতে করিয়া থাকিতে হইত (১১১)।" .... একই তারিখে উচ্ছাসের আতিশয্যে সম্পাদকীয় স্তম্ভে গুপ্ত মহাশয়ের একটি কবিতাও স্থান পায়। কবিতাটি হলো—

জয় জয় জগদীশ জগতের সার।
লহ লহ লহ নাথ প্রনাম আমার॥
করি এই নিবেদন দীন দয়াময়।
বাঞ্ছাফল পূর্ণকর হয়ে বাঞ্ছাময়॥
চিরকাল হয় যেন ব্রিটিশের জয়।
ব্রটিশের রাজলক্ষ্মী স্থির যেন রয়॥
এমন সুখের রাজ্য আর নাহি হয়।
শাস্ত্র মতে এই রাজ্য রাম রাজ্য কয় (১১২)।

সংবাদ প্রভাকরে ২৯—৬—১৮৫৭ তারিখে যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় তা হলো "অবোধ যবনেরা উপস্থিত বিদ্রোহের সময়ে গভর্ণমেণ্টের সাহার্য্যর কোন প্রকার অনুষ্ঠান না করাতে তাহাদিগের রাজ ভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীদাচারন প্রচার হইয়াছে এবং বিজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ জানিয়াছেন, দয়াবান সুবিচারক বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সকল প্রকার ধর্মাবলম্বী প্রজাদিগের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া সুশৃঙ্খল নিয়ম সহকারে রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেছেন, সকল প্রজাকেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সমান স্বাধীনতা দিয়াছেন, হিন্দু জাতির বিদ্যানুশীলন নিমিত্ত যেরূপ স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন যবনদিগের নিমিত্তও সেইরূপ সদুপায় হইয়াছে, বিশেষতঃ বর্তমান প্রচলিত নিয়মানু-

(১১১) সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র
(১১২) ঐ

www.pathagar.com

সারে গভর্ণমেণ্টের স্থাপিত সমুদয় বিদ্যালয়ে যবনেরা হিন্দুদিগের সহিত একত্রে উপবেশন পূর্বক অনুশীলন করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, রাজকীয় বিশ্বাসযোগ্য উচ্চ আসনেও যবনেরা হিন্দুদিগের সহিত একত্রে উপবেশন পূর্বক বিচার কার্য্য নির্বাহ করিতেছে। তাহারা রাজকৃত এই রূপ সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াও বর্তমান সময়ে রাজানুকলতা স্বভাব কিছুই প্রকাশ করিলেন না। হায়! কি অকৃতজ্ঞ। আমরা শ্রবন করত সাতিশয় অনুতাপিত হইলাম, যে অবোধ অকৃতজ্ঞ যবনেরাই দলবদ্ধ হইয়া কলিকাতার অদূরবর্তি আগর পাড়ায় মিশনারী বিদ্যালয়ের প্রতি অত্যাচার পূর্বক ইংরেজী পুস্তকাদি নষ্ট করনে উদ্যত হইয়াছিল, হিন্দুরা দলবদ্ধ হইয়া তাহারদিগের বিরুদ্ধাচারণ করাতেই কিছুই করিতে পারে নাই, এবং সাহস পূর্বক বলিয়াছে যে এদেশে ইংরেজদিগের আধিপত্য লোপ হইয়াছে, এইক্ষনে সকল বিদ্যালয়েই কোরান ব্যবহৃত হইবেক। হায় দুরাত্মাদিগের কি সাহস! তাহারা রাজার নিকট সকল প্রকার উপকার পাইয়া কি উপস্থিত সময়ে এইরূপ প্রত্যুপকার করনে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহারা যদ্যপি বিবেচনারূপ মুকুরে আপনাদিগের এই অন্যায় ব্যবহারের মুখাবেলোকন করে তবে কি লজ্জিত হইবেক না? যবনের মধ্যে যে সকল বিবেচক লোক আছেন তাহারা আমারদিগের এই লেখাতে ক্রোধ করিবেন না, অবশ্য দুঃখিত হইবেন, তাঁহারা আমাদিগের এই লেখাতে লক্ষ্যস্থল নহেন, তাহারদিগের সংখ্যা অধিক নহে, সুতরাং তাঁহারা এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন না।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের যে সকল স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়াছে তত্তাবত স্থানেই যবনেরা অস্ত্রধারণ পূর্বক নিরাশ্রয় সাহেব, বিবি, বালক, বালিকা এবং প্রজাদিগের প্রতি হৃদয় বিদীর্ণকর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে, সাহেবের মধ্যে অনেকে আপনাপন বহুকালের যবন ভৃত্যের দ্বারা হত হইয়াছেন। অধুনা যবন প্রজাদিগের প্রতি গভর্ণমেণ্টের এমত অবিশ্বাস জন্মিয়াছে যে এই নগরে যে স্থানে অধিক যবনের বাস সেই স্থানেই অধিক রাজ প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে নাগর্য্য বলণ্টিয়ার সেনাগণ অতি সর্তক ভাবে মাদ্রাসা-কালেজ রক্ষা করিতেছেন, যবনদিগের অন্তঃকরণে

www.pathagar.com

কি কারণ গভর্ণমেণ্টের প্রতি বিরূপভাবের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা আমরা কিছুই নিরূপন করিতে পারিলাম না" (১১৩)।

নিকলসনের নেতৃত্বে শিখ ও পাঞ্জাবী সৈন্য দল দিল্লীর যুদ্ধে জয় লাভ করেছিল। ইংরেজদের এ বিজয়ে বাংগালী বর্ণ হিন্দু সমাজ কিরূপ উল্লসিত হয়েছিল তা তদানীন্তন বিশিষ্ট কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। 'দিল্লীর যুদ্ধ জয়ের পর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত দিল্লীর যুদ্ধ শীর্ষক কবিতায় লিখেন ঃ —

"ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়।"

তারপরে পরে "এলাহাবাদের যুদ্ধ" শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখেছেন ঃ

"প্রয়াগেতে ছিল যত সিপায়ের দল।
একেবারে সকলেতে হল হত বল॥
অধিকার করে ছিল তরণীর সেতু।
হয়েছে তাদের তায় মরনের হেতু।
ঝুসিঘাটে ঘুষি খেয়ে মারা যায় প্রাণে।
ছার খার হইয়াছে অনলের বানে॥
এখন গোরার মুখে এই মাত্র কথা।
প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা যাও যথা তথা(১১৪)"।

সাংবাদিক বিশ্বেশ্বর চৌধুরী বলেন—"আগরার যুদ্ধ" শীর্ষক কবিতাটি লিখে ঈশ্বর চন্দ্র সিপাহী বিদ্রোহ বা ভারতীয়দের গণভিত্তিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের উপরই আলোকপাত করেছেন। মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করতে গিয়ে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে ভারতকে বৃটিশ কবল মুক্ত করার জন্য মুখ্যতঃ মুসলমানেরাই সংগ্রাম চালিয়ে-ছিল।

---

(১১৩) সাময়িক পত্রে বাংলার সামাজ চিত্র।
(১১৪) টেকনাফ থেকে খাইবার—বিশ্বেশ্বর চৌধুরী।

www.pathagar.com

আগরার যুদ্ধ :

"আগরায় নগরায় মারিয়াছে কাঠি।
বীর দাপে দাপিয়াছে কাঁপিয়াছে মাটি"॥
চক্রযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছে যারা"।
ভয় পেয়ে কোনখানে জাগিয়াছে তারা॥
হেল্লা করে কেল্লা লুটে দিল্লীর ভিতরে।
জেল্লা মেরে বেড়াইত অহংকার ভরে॥
এখন সে কেল্লা কোথা হেল্লা কোথা আর?
জেল্লা মেরে কেবা দেয় দাঁড়ির বাহার?
ছেড়ে পাল্লা বলে আল্লা পড়েছি বিপাকে।
কাছা খোল্লা যত মোল্লা তোবা তাল্লা ডাকে (১১৫)।"

ভারতের আজাদী সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে পর বাংগালী বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় কি রকম উৎফুল্ল হয়েছিল তার নমুনাই ঈশ্বর গুপ্তের "যুদ্ধ ও শান্তি" কবিতায় পাওয়া যায়।

যুদ্ধ ও শান্তি :

পুনঃর্বার হইয়াছে দিল্লী অধিকার।
"বাদশাহ বেগম" দোহে ভোগে কারাগার॥
অকারণে ক্রিয়া দোষে করে অত্যাচার।
মরিল দু'জন তার প্রানের কুমার
....
একেবারে ঝাড়ে বংশে হল ছারখার
শিশু সবে মারা যাবে বিহনে আহার॥

....
বৃটিশের জয় জয় বল সবে ভাইরে।
এসো সবে নেচে কুঁদে বিভু গান গাইরে (১১৬)॥

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখার্জী সিপাহী বিপ্লবসম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন "সিপাহী বিদ্রোহ কেবল মাত্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীদের কর্ম মাত্র। দেশের প্রজাবর্গের সহিত তাহার কোন যোগ

(১১৫) টেকনাফ থেকে খাইবার—বিশ্বেশ্বর চৌধুরী।
(১১৬) ঐ

www.pathagar.com

নাই। প্রজাকুল ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ও কৃতজ্ঞ এবং তাহাদের রাজভক্তি অবিচল রহিয়াছে (১১৭)।।"

হিন্দু প্যাট্রিয়টের সম্পাদকের মত যে মোটের উপর সেদিনের হিন্দু বাংলার মত ছিল তার একটি ভালো প্রমাণ বিদ্যাসাগর এবং দেবেন্দ্র নাথের মতো সচেতন হিন্দু বাংগালীরাও সেদিন সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কোনরূপ কৌতূহল দেখাননি।

হিন্দু পুনরুত্থান ঃ

মুঘল আমলের শেষের দিক হতে বিশেষ করে আওরংগজেবের আমলে হিন্দু সম্প্রদায়ের উগ্র ধর্মীয় জাগরণ শুরু হয়। তারা এদেশে মুসলিম শাসন উৎখাত করে হিন্দু রাজ্য কায়েমের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এ আন্দোলনের অন্যতম নায়ক মারাঠা দলপতি শিবাজী। শিবাজীকে অবশ্য সম্রাট আওরংগজেব 'পার্বত্য মূষিক' বলে উপহাস করতেন। কিন্তু ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, "শিবাজী প্রমাণ করেন যে হিন্দু ধর্মের মহীরুহ একেবারে মরে যায় নাই। শত শত বৎসর বিজেতাদের অধীনে দাসত্বের কারণে নির্যাতীত নিপীড়িত হবার পরেও তা আবার নতুন করে ডাল-পালা ছড়াতে পল্লবিত হয়ে ফুলে ফলে সুশোভিত হতে পারে তার প্রমাণ শিবাজী (১১৮)"। আওরংগজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সম্রাটগণ হীনবল হয়ে পড়ে এবং হিন্দু মারাঠা শক্তি ধীরে ধীরে এত শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায় যে পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়।

এর পরে হিন্দুদের সহায়তায় ইংরেজগণ মুসলিম শাসন উৎখাতে সক্ষম হলে পরে তারা তাদের অনুগ্রহভাজন হয়ে অর্থনৈতিক. রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর আধি-

(১১৭) বাংলার জাগরণ—

(১১৮) Sir Shibaji & his times—Sir. J. Nath Sarker,

www.pathagar.com

পত্য বিস্তার করে। শুধু মুসলমানদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি তারা জংগী ধর্মীয় সংগঠনও কায়েম করে। উনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে হিন্দু সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত এবং হিন্দু ধর্মের হেফাজতের জন্যে। কলিকাতাতে রাধা কান্তদেব ধর্ম সভা স্থাপন করেন (১১৯)। গোড়া হিন্দুবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কাশি প্রসাদ ঘোষ আর একটি ধর্ম সভা স্থাপন করেন। এ সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ঐতিহ্য, সামাজিক প্রথা এবং ধর্মীয় রীতিনীতির সংরক্ষন ও চালু করা (১২০)।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশের শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাদের প্রতি বিশেষভাবে অনুগত একটি জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্যোক্তা ছিলেন লর্ড কর্ণ ওয়ালীশ। লর্ড মেকলের উদ্দেশ্য ছিল যে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে আর একটি তাবেদার শ্রেণীর সৃষ্টি করা, যারা চিন্তায় চেতনায় এদেশের লোক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইংরেজদের অনুকরণ করবে এবং প্রভুদের স্বার্থের খবরদারী করবে। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এ দু'জন ইংরেজ পুরুষের পরিকল্পনা সার্থক হয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদারগণ তাদের স্বার্থের হেফাজতের জন্যে ১৮৫১ খৃঃ বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থা কায়েম করেন। ১৮৫৭ খৃঃ এ সংস্থাটি ইংলন্ড তাদের স্বার্থের তদারকের জন্যে মাহিনা করা একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। "হিন্দু পাট্রিয়ট" নামে একটি সাপ্তাহিক এ সংস্থার মুখ পাত্র হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। যদিও জমিদারের স্বার্থ রক্ষার জন্যে প্রত্রিকাটির জন্ম হয়েছিল। তবু তা সমস্ত বংগদেশ বাসীর কথা তুলে ধরার দাবী করত। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য

---

(১১৯) Dr. Padma Shah—Indian National Congress and Muslims Since 1928

(১২০) ঐ

www.pathagar.com

সংখ্যা ছিল সীমিত। যারা পঞ্চাশ টাকা বাৎসরিক চাঁদা দিতে পারত তারাই এর সদস্য হতে পারত (১২১)। সংস্থাটি ছিল কলিকাতার বিত্তশালী জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে। রাজা ঈষান চন্দ্র সিংহ, হরিশ চন্দ্র মুখার্জী, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ এ সংস্থার নেতৃত্ব দিতেন। ধারণা করা হত যে নেতা হিসাবে হিন্দু সমাজে রাম মোহন রায়ের পরেই এদের স্থান। রাজা প্রতাপ সিংহ এবং রাজা রাধাকান্ত দেবকেও নেতৃস্থানীয় বলে গণ্য করা হত।

সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলা হয়ে থাকে। তিনি ১৮৪৮ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং ডোভটেন কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। কলেজ শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ১৮৬৮ খৃঃ ইংলন্ডে গমন করেন এবং সেখানে আই, সি, এস, পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ১৮৭১ খৃঃ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রথম তাকে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আসামে নিয়োগ করা হয়। দু'বৎসর পরে তাঁকে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়। ১৮৭৪ খৃঃ তিনি তার পদচ্যুতির বিরুদ্ধে আপীল করার জন্যে ইংলন্ডে গমন করেন। তাঁর আপীল খারিজ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সিভিল সার্ভিসের পদ থেকে দুর্নীতির দায়ে বরখাস্ত হয়েছেন, তাই তাঁকে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে দেয়া হয়নি। ১৮৭৬ খৃঃ চাকুরীচ্যুত হয়ে ছাত্রদের মধ্যে তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। তিনি ১৮৭৬ খৃঃ আলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে "ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন" নামে এক সংস্থা গঠন করেন। সংস্থার অপরাপর নেতা ছিলেন সুরেন্দ্র মোহন ব্যানার্জী, আনন্দ মোহন বোস এবং দ্বারকানাথ গাংগুলী প্রমুখ। এ সময়ে বৃটিশ সরকার ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার বয়স ২১ বৎসর হতে কমিয়ে ১৯ বৎসরে করে এবং একমাত্র ইংলন্ডেই পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(১২১) Mehotra—The Emergence of Indian National Emergence Congress.

www.pathagar.com

করে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের ধারনা জন্মে যে ভারতীয়গণ যাতে বেশী সংখ্যায় ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্যেই এ রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার দেয়ার বয়স যাতে ২২ বৎসরে রাখা হয় এবং ভারত ও ইংলণ্ড উভয় স্থানেই যাতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, সে জন্য ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন লণ্ডনে পার্লামেণ্টের নিকট আবেদন জানাবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। এছাড়া ইংরেজী শিক্ষিত ভারত বাসীর আশা-আকাঙ্খা বৃটিশ জনগণকে অবহিত করার জন্যে তারা ইংলণ্ডে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং "ন্যাশনাল ফাণ্ড মুভমেণ্ট" নামক অপর একটি সংস্থা গঠন করে এ উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহন করে। সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী "দি বেংগলী" নামক একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে তিনি "হিন্দু প্যাটিয়টে" মাঝে মধ্যে প্রবন্ধ ছাপাতেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ছিল এদেরকে চিরস্থায়ী ভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে এদেশের শিক্ষিত সমাজের জন্যে বৃটিশ নাগরিকদের অনুরূপ সুবিধা আদায় করা। সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর মতে 'বৃটিশের আগমনের পূর্বে' এদেশের জনগণ অশ্রুর সায়রে ভাসছিল এবং বিধাতার নিকট করুণ ফরিয়াদ জানাচ্ছিল। অচিরেই বিধাতা তাদের ক্রন্দনে সাড়া দেন এবং স্বর্গীয় দূত হিসাবে শান্তি এবং আনন্দের বার্তা নিয়ে বৃটিশের আগমন ঘটে যার ফলে প্রগতি এবং সভ্যতার পথ ধরে দেশ অগ্রসর হতে থাকে" (১২২)। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় হিন্দুদের বর্ধিত হারে নিয়োগের দাবী ছাড়া এর আর কোন কর্মসূচী ছিলনা।

জাষ্টিস্ নোরিশ নামক হাই কোর্টের জনৈক বিচারক কোনও মামলা নিষ্পত্তির জন্যে বিরোধীয় শিব লিংগকে কোর্টে আনার আদেশ দেন। এ আদেশ হিন্দু ধর্মের জন্য অবমাননাকর মনে করে হিন্দু সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী তাঁর বেংগলী

---

(১২২) Daniel Argov —Moderates and Extemists in the Indian National Congress.

www.pathagar.com

পত্রিকায় মন্তব্য করেন "এদেশের ধর্মীয় অনুভূতি সম্পর্কে অজ্ঞ এবং জনগণের অধিকার সম্পর্কে উদাসীন একজন অপরিপক্ক এবং অনভিজ্ঞ বিচারকের আদেশ হিন্দু ধর্মের জন্য অবমাননাকর।" এ রকম মন্তব্যের জন্য তাঁকে আদালত অবমানার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে দু'মাসের জন্য কারাদণ্ড দেয়া হয়। এর ফলে দেশব্যাপী হিন্দু শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রবল প্রতিবেদের ঝড় বয়ে যায়। এমন কি আলীগড়ের একজন সমাবেশে স্যার সৈয়দ আহমদও সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর কারাদণ্ডকে জাতীয় দুর্যোগ বলে অভিহিত করেন এ জনসভায় মিঃ ব্যানার্জীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং ভাইসরয়ের নিকট তাঁকে মাফ করার জন্যে টেলিগ্রাম করা হয়।

ইংরেজরা এদেশে শুধু চাকুরী করত না। তাদের জমিদারী ছিল। তারা নীল কুঠি স্থাপন করে নীলের ব্যবসা করত। তারা চা বাগানেরও মালিক ছিল। এদেশের জনসাধারনের সাথে ইংরেজগন পশুর মত ব্যবহার করত। তারা খুন-জখম করলেও তাদের সাজা হত না।, ফুলার নামে আগ্রার এক ব্যারিষ্টার তার কোচ-ম্যানকে বেত্রাঘাত করে হত্যা করে। অথচ ম্যাজিস্ট্রেট তার শাস্তি-স্বরূপ মাত্র ত্রিশ টাকা জরিমানা করেন। বহরমপুরে ম্যাজিস্ট্রেট থাকা-কালীন ১৮৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বংকিমচন্দ্র বহরমপুর ক্যান্টনমেন্টের কমানডিং অফিসার কর্ণেল ডাফিন কর্তৃক অপ্রত্যাশিতভাবে প্রহৃত হন। আসামের চীফ কমিশনার মিঃ কটন সাহেবই প্ল্যান্টারদের বলেছিলেন "একদল অমানুষ দানব" (১২৩)। কিন্তু দেশীয় বিচারকদের ইউরোপীয়ানদের বিচার করার ক্ষমতা ছিল না। ইংরেজ বিচারক ছাড়া আর কেহ তাদের বিচার করতে পারত না, আর শ্বেতাংগ বিচারকগণ স্বগোত্রীয়দের অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে নারাজ ছিলেন।

উদার মতাবলম্বী লর্ড রিপন ১৮৮৩ খৃঃ ইলবার্ট বিলে দেশীয় এবং শ্বেতাংগ বিচারকদের সমান ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব করেন যার ফলে দেশীয় বিচারকগণ ইউরোপীয়দের বিচার করার ক্ষমতা পাবার

(১২৩) আবদুল মওদুদ—মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও সংস্কৃতির রূপান্তর।

www.pathagar.com

কথা। কিন্তু ইউরোপীয়ান এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে ইলবার্ট বিল পরিত্যাগ করা হয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে দেশে ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষে অনেক লোক প্রাণ হারাল। অথচ এ ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় সরকার তেমন কোন সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসল না। সরকার অস্ত্র আইন নামে একটি আইন (আর্মস এ্যাক্ট) পাশ করে। এ আইন এদেশের মানুষের জন্য অস্ত্র ব্যবহারের এখতিয়ার অত্যন্ত সীমিত করেছিল। ইলবার্ট বিল নাকচ হয়ে যাবার ফলে জনসাধারণের উপর ইংরেজদের জুলুম স্বীকৃতি পায়। এ সমস্ত কারণে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধুমায়িত হতে থাকে এবং তা সুচতুর ইংরেজ শাসকদের নজর এড়াল না।

তাই লর্ড ডাফ্‌রিন এদেশের লোকের মনমানসিকতার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য এবং তা যথোপযুক্তভাবে মোকাবেলার জন্যে একটি সংস্থা কায়েমের জন্যে চেষ্টিত হন। পূর্বেই বলা হয়েছে এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ নিজেদেরকে জনসাধারণের কাতারে মনে করত না। তাদেরকে অবশ্য ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আকৃষ্ট করেছিল। তাদের ইংরেজী শিক্ষার কারণে এবং মনমানসিকতা ইংরেজ ভাবাপন্ন হবার দরুন তারা নিজেদের জন্য ইংলণ্ড বাসীদের রাজনৈতিক অধিকার এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধার প্রত্যাশী ছিল। তারা প্রশাসনে ইংরেজদের অনুরূপ অধিকার প্রত্যাশা করত। দেশের আপামর জনসাধারণের অধিকারের কথা তাদের চিন্তা বা চেতনায় ছিলনা।

লর্ড ডাফ্‌রিন এদেশের হিন্দু ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের সাহায্যে বৃটিশ শাসন সুদৃঢ় এবং দীর্ঘ স্থায়ী করার উদ্যোগ নেন। এ বিষয়ে তাঁকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন এলেন অক্টোবিয়ান হিউম নামে এক ইংরেজ সিভিলিয়ান। তিনি এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস" নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েমের উদ্যোগ গ্রহন করেন। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল এদেশের লোকের মন-

www.pathagar.com

মানসিকতা আঁচ করা এবং কি করে তার প্রতিবিধান করা যায় তার পথ বাতলানো। একে বলা হত এদেশের লোকের ধূমায়িত অসন্তোষ নির্গমনের নিরাপদ পথ (Safty Valve) বা "ঘা" চোষক-পদী।"

এলেন অক্টোভিয়ান হিউম প্রথম লর্ড ডাফ্‌রিনের নিকট প্রস্তাব করেন যে প্রস্তাবিত কংগ্রেস সভাপতি হবেন বোম্বের গভর্ণর লর্ড রিকে। কিন্তু লর্ড ডাফ্‌রিন তাতে একথা বলে আপত্তি তোলেন যে আবেদনকারী এবং যাঁর নিকট আবেদন করা হবে একই ব্যক্তি হতে পারেনা (১২৪)।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বেতে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী। তিনি ছিলেন একজন বাংগালী খৃষ্টান এবং পেশায় ব্যারিষ্টার। তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণের উপসংহারে বলেন. "কংগ্রেসের একান্ত কামনা ভারতে বৃটিশ শাসন চিরস্থায়ী হোক এবং কংগ্রেসের চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রশাসনিক বিষয়ে অংশিদারিত্ব" (১২৫)।

চাকুরী থেকে বরখাস্ত এবং আদালতে শাস্তি হবার কারণে হিউম সুরেন্দ্র ব্যানার্জীকে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রন জানাননি।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের প্রস্তাবাবলী হতে এটা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে বৃটেনের প্রতি আনুগত্যের শপথ এবং দাসসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে কংগ্রেসের যাত্রা শুরু। এর উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের তোয়াজের মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য অধিকতর সুযোগ সুবিধা আদায় করা।

---

(১২৪) Mehotra—Emergence of Indian National Congress.

(১২৫) Daniel Argov—Moderates and Extremists in National Congress.

www.pathagar.com

কংগ্রেস সম্পর্কে মেহতা মন্তব্য করেছেন "প্রতি বৎসর খৃষ্টানদের ক্রিষ্টমাস উৎসবের সময় ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে কয়েকশত বুদ্ধিজীবি কোনও এক শহরে অর্ধ সপ্তাহের জন্য মিলিত হয়ে সম্মেলন করত এবং সংযত ভাষায় প্রস্তাব পাশ করে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত".(১২৬)।

১৮৮৬ সালে কলিকাতাতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এর সংগঠকগণ বুঝতে পারেন যে, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীকে বাদ দিলে বংগদেশের প্রতিনিধিগণ প্রতিবাদ করবেন তাই মিঃ ব্যানার্জী ও তাঁর অনুসারীদেরকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দাদা ভাই নওরোজী নামক পার্সী সম্প্রদায়ের একজন নেতা। এ সম্মেলনে তিনি প্রশ্নাকারে বলেন "হিন্দু রাজত্বের গৌরবময় যুগেও কি কেউ কল্পনা করতে পারত যে, ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে আগত প্রতিনিধিদের নিয়ে কংগ্রেসের মত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা সম্ভব ? এটা শুধু বৃটিশ ভারতে বৃটিশ শাসনামলেই সম্ভব হয়েছে" (১২৭)। কিন্তু মনে রাখা দরকার হিন্দু যুগে ভারতের কোন অস্তিত্ব ছিলনা। তখন উত্তর ভারত আর্যাবর্ত এবং দক্ষিন ভারত দাক্ষিনাত্য নামে পরিচিত ছিল। আর্যাবর্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। একই অধিবেশনে তিনি ঘোষনা করেন "এমন কি কংগ্রেস সদস্যদের অস্থি মজ্জা পর্যন্ত বৃটিশের প্রতি অনুগত।" কংগ্রেস সদস্যরা বৃটিশের প্রতি তাদের আস্থা প্রকাশের জন্য এতই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে, এ অধিবেশনে দাদা ভাই নওরোজী প্রশ্ন করেন "কংগ্রেস কি বিদ্রোহ এবং রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চারণ ভূমি ? তখন সকল সদস্যই সমস্বরে বলে উঠে "নিশ্চয়ই নয়,— নিশ্চয়ই নয়"। আবার যখন তিনি প্রশ্ন করেন" "কংগ্রেস বৃটিশ শাসনের সুদৃঢ় ভিত্তির প্রয়োজনে একটি স্তম্ভ নয় ?" তখন সকলেই এক যোগে সমস্বরে

---

(১২৬) Mehotra—Emergence of Indian National Congress

(১২৭) Deinal Argov Moderts and Exfremists in Indian National Congress.

www.pathagar.com

চিৎকার করে "নিশ্চয়ই' (১২৮)। দাদা ভাই নওরোজী কলকাতার অধিবেশনে কংগ্রসকে ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে দাবী করেছিলেন কিন্তু ভিংগার রাজা উদয় প্রতাপ সিংহ একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করে বিলি করেছিলেন যাতে বলা হয়েছিল যে "তথাকথিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় জনগণের মুখপাত্র হতে পারেনা। কারন তা অধিকাংশ জমিদার, কৃষক শ্রেণী এবং মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে না।" উক্ত পত্রিকায় আরও বলা হয় "যারা বাকি ইংরেজদের ভাবধারায় অনুপ্রানিত ইংরেজ প্রতিষ্ঠানের অনুকরণ করতে সচেষ্ট এবং জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন, কংগ্রেস তাদেরই একটি সংস্থা এবং কংগ্রেসের কার্যকলাপ অব্যাহত থাকলে পর বিপ্লব এবং ধবংস অনিবার্য"।

কংগ্রেসের প্রতি গোড়া থেকেই মুসলমানদের একটি অনীহা ছিল। ডঃ পদ্মশাহ বলেন "দৃশ্যতঃ কংগ্রেস একটি নির্ভেজাল হিন্দু প্রতিষ্ঠ ন হবার কারণে মুসলমান জনসাধারণ আতংক গ্রস্থ হয়ে পড়ে' (১২৯)। স্যার সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী একবার মন্তব্য করেছিলেন "আমাদের সমালোচকগণ কংগ্রেসকে একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে গন্য করে। কংগ্রেস বিরোধী সংবাদ পত্রগুলো ও এ ধরনের কথা প্রচার করে থাকে মুসলমানদের সহযোগীতা লাভের উদ্দেশ্যে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অনেক সময়ে আমরা মুসলিম প্রতিনিধিদের যাতায়াত ভাড়া বহন করে থাকি এবং তাদেরকে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও দিয়ে থাকি।" (১৩০)

---

(১২৮) Dainel Argov-Moderates and Exfremists In Indiar National Congress

(১২৯) Dr. Padma Shah—Indian National Congress and the Muslims Since 1928

(১৩০) ঐ

www.pathagar.com

১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে যখন কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন চলছিল তখন স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ লক্ষ্ণৌতে তাঁর স্বধর্মাবলম্বীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন "যে ভবিষ্যতে যদি হিন্দু শাসনের জোয়ালে আবদ্ধ হয়ে আর্তনাদ করার ইচ্ছা থাকে তবে যেন তারা কংগ্রেসে যোগ দেয়" (১৩১)।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৮৭ খৃঃ মাদ্রাজে কংগ্রেস অধিবেশন বসে। মুসলমানদেরকে দলে ভিড়াবার জন্যে তখন বদরুদ্দীন তায়েবজী নামে এক মুসলমানকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু এ সভাতে লালা লাজপত রায় নামক জনৈক পাঞ্জাবের অধিবাসী ও প্রথম বারের মত যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন গোড়া হিন্দু এবং চরম মুসলিম বিদ্বেষী। প্রথমে তিনি স্বামী দয়া নন্দ স্বরস্বতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজের সদস্য হন। আর্য সমাজ প্রচার করত ভারতবর্ষ হিন্দুদের আবাস স্থল। মুসলমানেরা এখানে বহিরাগত। তারা যদি হিন্দুদের আচার বিধি পালন না করে তবে ভারতে তাদের বসবাস করতে দেয়া উচিত নয়। বৈদিক ধর্মের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল আর্য সামাজের উদ্দেশ্য। ১৮৮৫ খৃঃ। লাজপত রায় এবং হংসরাজ নামে তাঁর অপর এক সহযোগী দয়া নন্দ "এ্যাংলো বৈদিক কলেজ" নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আর্য সমাজের মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। লালা লাজপতের মতে কংগ্রেসের পক্ষে মুসলমানদের সহযোগীতা কামনা করা শুধু নিরর্থকই নয়, হিন্দুদের জন্য বিপজ্জনক ও বটে। তিনি একথাও মনে করতেন যে ভবিষ্যতে ভারতে হিন্দু প্রভুত্ব স্থাপনের পথে মুসলমানরা প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। মুসলমানদের সহায়তার জন্যে মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তান, তুরুস্ক সদা প্রস্তুত। হিন্দুরা ভারতে সংখ্যা গরিষ্ঠ হলেও মুসলিম উম্মার মধ্যে বিরাজমান ঐক্যের কারনে হিন্দুরা মুসলমানদের মোকাবেলায় অপারগ, কারন হিন্দু সম্প্রদায়

(১৩১) Dr. Padma Shah—Indian National Congress and the Muslims Since 1928.

www.pathagar.com

সামাজিক এবং ধর্মীয় ভাবে বিভক্ত। তিনি উর্দুর বিরোধীতা এবং হিন্দীর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর মতে হিন্দি ভাষা হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে জাতীয় কংগ্রেসের হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ে ভারতবাসীদের ঐক্যের মুখোশ পরিত্যাগ করে শুধু মাত্র হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো উচিত (১৩২)। এক সময় তিনি একথাও বলেছিলেন যে আজ যদি ইংরেজগন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে, তবে মুসলমানদের কবল থেকে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্যে এডেনে পৌঁছবার পূর্বেই তাদেরকে ফেরত আসার আমন্ত্রণ জানাতে হবে। ১৮৮৮ সালে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজদের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য এতে জর্জ ইউলকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৮৮৯ খৃঃ লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল এজেন্সিকে বৃটিশ কমিটি অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে রূপান্তরিত করা হয়। উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণকে এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। এর অপরাপর সদস্য ছিলেন ডব্লিউ সিকেল, দাদা ভাই নওরোজী, ইনটর্ন চার্ল্স ব্র্যাডল। উইলিয়ম ডিগবিকে এর সচিব নিযুক্ত করা হয়। আর বেতন নির্ধারিত হয় সর্ব সাকুল্যে বৎসরে ৯০,০০০ পাউন্ড। বৃটিশ কমিটি অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস "ইন্ডিয়া" নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করে পার্লামেন্টের সদস্যদের নিকট বিনা মূল্যে বিতরন করতে থাকে। ১৮৮৯ খৃঃ বোম্বেতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনে ওয়েডারবার্ণ সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর ভাষণে লর্ড রিপনকে যে উষ্ণ বিদায়ী সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়ে ছিল তা স্মরন করিয়ে দিয়ে বলেন যে উক্ত সম্বর্দ্ধনা দৃষ্টে মনে হয় যে ভারতীয়দের নিকট বৃটিশ শাসন জনপ্রিয়। তখন কংগ্রেস সদস্যগণ তার মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে দীর্ঘক্ষন যাবত আনন্দ ধ্বনি করতে থাকে। এ সময়ে সুরেন্দ্র নাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেংগলী পত্রিকায় এক সম্পাদকীয়তে লেখা হয় যে "আমরা হোমরুল বা পার্লামেন্টারী পদ্ধতির শাসন চাইনা।

(১৩২) Dainel Argov — Moderates and Extremists in the Indian National Congress.

www.pathagar.com

আমাদের বিনীত প্রার্থনা দেশের প্রশাসন যন্ত্রের সাথে আমরা সীমিতভাবে জড়িত থাকতে চাই (১৩৩)।' ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের ষষ্ঠ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্যে হার্বার্ট গ্ল্যাডষ্টোনকে আমন্ত্রন জানানো হয়। তিনি অস্বীকৃতি জানালে ডব্লিউ স্যামকে আমন্ত্রন করা হয়। তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করলে পর ফিরোজ শাহ মেহতাকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এত চেষ্টা সত্বেও বৃটিশ কতৃপক্ষের নিকট হতে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে কংগ্রেস হতাশায় নিমজ্জিত হয়। হতাশাগ্রস্থ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রেমন্ড ব্রাথ ওয়াইট নামক সাংবাদিকের সংগে এক সাক্ষাৎকারে বলেন "বৃটিশ সাম্রাজ্যে যদি কোন ফাটল ধরে তবে অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের চাইতে আমাদের হিন্দু সমাজের বেশী ক্ষতি হবে। বেসরকারী পার্লামেন্ট জাতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্ব বৃটিশদের প্রতি আনুগত্য জিইয়ে রাখার জন্য। আমরা আমাদের শাসকদের সংস্পর্শে আসতে চাই, তাদেরকে স্থানচ্যুত করতে চাইনা। আমরা চাই আপনারা অর্থাৎ ইংরেজরা এখানে অবস্থান করুন। আপনাদের ছাড়া আমরা অচল। যখন কোন নির্বোধ ইংরেজ হাইড্ পার্কে এক জনসমাবেশে বলে যে আমরা তাদেরকে তাড়াতে চাই তখন সে মিথ্যা বলে। আপনাদের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি রয়েছে। আমরা চাই আমাদের অতীত গৌরব আর আপনাদের বর্তমান গৌরবের সংগিশ্রন। আমরা আপনাদের নিকট থেকে যা কামনা করি তা কেবল আপনাদের সহানুভূতি, সহানুভূতি, সহানুভূতি (১৩৪)।"

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী পুনাতে কংগ্রেসের একাদশ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর ভাষনে বলেন "ইংলেণ্ডের নিকট থেকে আমরা উৎসাহ এবং সহানুভূতি কামনা করি। রাজ-

---

(১৩৩) Daniel Argov The Moderates and the Extremists in the National Congress

(১৩৪) ঐ

www.pathagar.com

নীতির ক্ষেত্রে ইংলণ্ড আমাদের পথ প্রদর্শক। আদর্শের ক্ষেত্রে ইংলণ্ড আমাদের গুরু" (১৩৫)।

১৮৯৫ খৃঃ পুনাতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বৈশিষ্ট্য হল যে এখান হতে মধ্যপন্থী সদস্যদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা শুরু হয়। ১৮৮৬ সালে দাদা ভাই নওরোজী কংগ্রেসের কার্য কলাপ শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ভারত বহু ধর্মাবলম্বীর দেশ। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর সমাজ ও সমস্যা ভিন্ন। তাঁর মতে ধর্মীয় এবং সমাজ সংস্কারের কর্মসূচী হাতে নিলে কংগ্রেসের সকল ধর্মাবলম্বীর প্রতিনিধিত্বের দাবী অচল হয়ে পড়বে। এ যাবত কংগ্রেস ধর্ম নিরপেক্ষ বলে দাবী করলেও কংগ্রেস সদস্যগণ সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছিলেন। কংগ্রেসের জনৈক সদস্য মত প্রকাশ করেছিলেন 'ভারতের সামাজিক প্রথার মধ্যে যে জুলুম নিপীড়ন-নিহিত আছে তা যে কোন স্বৈরচারীর নির্যাতনকে হার মানায়। অবশ্য এ কথা বর্ণাশ্রয়ী হিন্দুসমাজের জন্য প্রযোজ্য। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালিয়ে থাকে। তাই প্রতি বছর ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশন শেষে একই স্থানে ন্যাশনাল সোসিয়েল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হত। ন্যাশনাল কংগ্রেস রাজনৈতিক সমস্যাবলী আলোচনা করত আর ন্যাশনাল সোসিয়াল কনফারেন্স হিন্দু সমাজের সমস্যাবলী নিয়ে আলাপ করত। পুনা কনফারেন্সে বাল গংগাধর তিলক ন্যাশনাল কংগ্রেস কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল সোসিয়াল কনফারেন্সের অধিবেশন একই জায়গায় হবার ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। তিনি হিন্দু ধর্মের বর্ণাশ্রমের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর মতে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ন্যাশনাল কংগ্রেসের মনোভংগী হিন্দুদের ঐক্যের পথে অন্তরায়। তিনি হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় জনগনকে

---

(১৩৫) Daniel Argov—The Moderates and the Extremists in the National Congress.

www.pathagar.com

ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন। বাল গংগাধর তিলক 'কেশরী' এবং "মারাঠা" নামক দু'টি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। ১৮৯৭ খৃঃ তিলক কেশরী পত্রিকায় এক নিবন্ধে শিবাজী কর্তৃক অফাজাল হত্যা সমর্থন করেন। শিবাজী আফজাল খাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। আফজাল খাঁ তঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দেন। শিবাজী তাঁর নিকটবর্তী হলে পর তিনি শিবাজীকে আলিংগণ করার জন্য এগিয়ে যান। তখন শিবাজী বস্ত্রের ভিতর লুকানো "বাঘনখ" অস্ত্রের দ্বারা তাঁকে আক্রমন করেন। ফলে তিনি গুরুতর রূপে আহত হন এবং পরে শাহাদত বরণ করেন। বাল গংগাধর তিলক এ যুক্তি দেখিয়ে শিবাজীকে সমর্থন করেন যে কারো ঘরে যদি চোর প্রবেশ করে এবং চোরকে তাড়াবার শক্তি যদি তার না থাকে তবে সে যদি বাইর থেকে দরজায় শিকল লাগিয়ে ঘরে আগুন দিয়ে চোরকে পুড়িয়ে মারে তবে তাতে দোষের কিছু নেই। তিলক নাকি একদিন স্বপ্নে দেখেন যে শিবাজী তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁকে নপুংশক বলে সম্বোধন করে গো-নিধনকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে উৎসাহিত করেছেন। খৃষ্টান এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই গরুর গোস্ত খায়। তাই তিলক মুসলিম এবং খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আহবান জানান। তিনি গনপতি এবং শিবাজী উৎসব চালু করেন। ১৮৯৫-৯৬ সালে মাদ্রাজে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। ডব্লিউ, সি, র‍্যান্ড এবং লেফট্যানেন্ট সি, ই, আর্মষ্ট প্লেগ নির্মুল অভিযানের জন্য পুনায় গমন করেন। বাল গংগাধর তিলকের লেখায় উদ্দীপ্ত হয়ে দামোদর চোপকার তাদেরকে হত্যা করে। চোপকর আদালতে গুপ্ত সন্ত্রাসবাদীদের দল রয়েছে বলে প্রকাশ করে এবং বলে "ঢাল, তলোয়ার হাতে লও এবং অগনিত শত্রুর শিরচ্ছেদ কর।" জাতীয় যুদ্ধে আমরা প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। যারা নাকি আমাদের ধর্মের শত্রু তাদের শোনিতে ধরণী সিক্ত কর।" সিংসাত্মক কার্য-কলাপে উস্কানী দেওয়ার জন্য তিলককে আঠারো মাসের জেল দেয়া হয়।

www.pathagar.com

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমরাওতি এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সন্ত্রাসবাদী কার্য কলাপের নিন্দা করা হয় এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি যথারীতি আনুগত্যের শপথ গ্রহন করা হয়। ১৮৯৮—১৯০২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের তেমন প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায়নি। এ সময়ে লাল লাজপত রায় এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন যে কংগ্রেসের সম্মেলন বাৎসরিক উৎসব ছাড়া আর কিছু নয়। কংগ্রেসের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিতিনিধিত্বের দাবীরও তিনি সমালোচনা করেন। তিনি বলেন হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টান ভিন্ন ভিন্ন জাতি। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদেরকে এক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে আওতায় আনার প্রচেষ্টা শুধু বৃথাই নয় বরং এতে হিন্দু জাতীয় ঐক্যের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। কংগ্রেস একমাত্র হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি অপর এক প্রবন্ধে মত প্রকাশ করেন যে ভারতীয় ঐক্য একমাত্র হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ভারতে হিন্দু শক্তির পুণর্জাগরণ প্রয়াসী এইসব নেতৃবৃন্দের ভাবধারা হিন্দু সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির উপর যে প্রভাব বিস্তার করে পরবর্তী সময়ও তা অপনীত হয়নি। ফলে দেখা যায় হিন্দু বিপ্লবীরা যখন ইংরেজ রাজ শক্তির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন ও অপরিকল্পিত ভাবে সন্ত্রাসমূলক কার্যে ব্রতী হয় তখনও বন্দেমাতরম এবং কালীমাতার চরনকে আশ্রয় করিয়াই তাহারা অগ্রসর হয়। ফলে এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন আন্দোলনে মুসলমানদের অংশ গ্রহন অসম্ভব হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ চট্র গ্রামের বিপ্লবীদের কার্যকলাপের কথা উল্লখ করা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে সমসাময়িক কোন কোন সুধী লিখেছেন, "চট্রগ্রামের যুব বিদ্রোহ আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ভূখন্ড ভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তা বাদী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রেরণা দিয়াছে। এই বিদ্রোহের ভাবাদর্শ ও প্রেরনা আমাদের ভবিষ্যতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার কাজেও সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে" ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন বা তদানীন্তন কোন সন্ত্রাসমূলক কার্য্যের মূল প্রেরনা ছিল হিন্দু পুনর্জাগরণ প্রয়াস। এগুলো বাংগালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ

www.pathagar.com

আন্দোলনের রূপ নেয়নি। বংকিম চন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' নামক সাম্প্রদায়িক উপন্যাস খানা ছিল বিপ্লবীদের বাইবেল স্বরূপ। পূর্নেন্দু দস্তিদার তাঁর "স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম" পুস্তকে বলেন—"তাছাড়া তখন ধর্মাভাব বিশেষ প্রবল ছিল। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রধানতঃ হিন্দ মধ্যবিত্ত ছাত্রদেরই প্রথম দলে আনা হত। ছাত্র ও যুবকদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্যে নিয়মিত ব্যায়াম, গীতা পাঠ, রাম কৃষ্ণ বিবেকানন্দের বই ও বংকিম চন্দ্রের আনন্দ মঠ ইত্যাদি পড়ার ব্যবস্থা করা হত।"

বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা মোজাফফর আহ্মদ "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি" পুস্তকে লিখেছেন— "বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ছিল। কিন্তু তা হিন্দু উত্থানের আন্দোলনও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজত্বের পুণঃ প্রতিষ্ঠা।"

অস্ত্রাগার লুন্ঠনের নেতা সূর্য্যসেনের আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর এক কালের সহযোগী শ্রীমতি কুন্দ প্রভা সেন গুপ্তা 'কারা স্মৃতি' নামক পুস্তকে বলেন যে দেশসেবা শিক্ষা নেবার উদ্দেশ্যে সূর্যাসেনের সংগে দেখা করলে তিনি তাঁকে বলেন "পূজো করতে হবে বুকের রক্ত দিয়ে।" তিনি আরও লিখেছেন "আমি পিছু পিছু চললাম, কিছুদুর এগিয়ে একটি মন্দিরের কাছে দু'জন পৌঁছলাম। দরজা খোলাই ছিল। মাষ্টার দা আর আমি ভিতরে ঢুকলাম। তারপরে তিনি টর্চ জ্বালালেন। দেখলাম ভীষনানন এক কালী মূর্ত্তি। মাষ্টার দা একহাতে লম্বা একখানা ডেগার বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, মায়ের সামনে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা কর। ওখানে বেল পাতা আছে। বুকের মাঝ খানে চামড়া টেনে ধরে একটু খানি কাটার সংগে সংগে কয়েক ফোঁটা রক্ত বের হল। তা বেল পাতায় করে মাষ্টারদার কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বেশ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—মায়ের চরনে দিয়ে বল, "জীবনে বিশ্বাসঘাতকতা করবনা, দেশের কাজ ছাড়ব না।" আমি অসংকোচে মায়ের চরনে রক্ত আর মাথা রেখে ঐ প্রতিজ্ঞা করলাম।"

www.pathagar.com

সাইফুদ্দিনে আহমদ সিদ্দিকী তাঁর নিবন্ধ "সাম্প্রদায়িক দোষ দুষ্ট সন্ত্রাসবাদী সূর্যাসেন" এ লিখেছেন যে, সূর্যাসেন সদরঘাটে যে জিমন্যাস্টিক ক্লাবটি প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে কোন মুসলমানের প্রবেশাধিকার ছিলনা। এ জন্যে মুসলমান যুবকেরা মাদারবাড়ী ক্লাব নামে তাদের নিজস্ব ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে। পাহাড়তলী অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময়ে যে ড্রাইভারকে পিস্তলের মুখে তাদেরকে জালদীঘি ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড থেকে পাহাড়তলী নিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং লুণ্ঠন কার্য্য শেষ হবার পর যার চোখে মুখে এসিড দিয়ে বিকলাংগ করা হয়েছিল তার নাম ছিল আহমদ – একজন মুসলমান। আহমদ ড্রাইভারের বক্তব্য অনুযায়ী যেহেতু সে ছিল মুসলমান এবং লুণ্ঠন কারীদেরকে সে চিনিয়ে দিতে পারত, সে জন্যই তার চোখে মুখে এসিড ঢালা হয়েছিল। শ্রী নলিনী কিসোর গুহতার "বিপ্লব বাদ" বইতে লিখেছেন "স্বদেশী আন্দোলনে সাধারণ ভাবে মুসলমানেরা শুধু যোগ না দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই – বিরুদ্ধতাও করিতে লাগিল।" শ্রীমতি সেনগুপ্তা মুসলমানদের ভূমিকা সম্বন্ধে বলেছেন "যে কারণেই হোক বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহনে তারা অনেক পিছিয়ে ছিলেন।"

পিছিয়ে থাকার কারণটি কি ছিল তা কমরেড মুজাফফর আহমদের বই থেকেই পাওয়া যায় যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর এই সমস্ত মন্তব্য থেকে মুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হয় যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বা তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মুসলমানরা কোন অংশ গ্রহণ করেনি বা অংশ গ্রহণ করার মত সুযোগ তাদের ছিল না। সেটা ছিল একান্তই হিন্দু পূর্ণজাগরণ প্রয়াসীদের কর্মকান্ড এবং সাম্প্রদায়িকতা হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের ভাইস্রয় হয়ে আসেন। তিনি ১৯০৪ খৃঃ বংগ ভংগের পরিকল্পনা পেশ করেন। বোম্বের অধিবেশনে বংগ ভংগের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহন করার ফলে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস হিন্দু কায়েমী স্বার্থের ই সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

উপ মহাদেশে মুসলিম জাগরন ঃ

সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার পর উপ-মহাদেশের মুসলমানদের উপর দুর্যোগের অমানিসা নেমে আসে। স্যার আলফ্রেড লায়েলের মতে "মুসলমানদের প্রতি ইংরেজগন রুদ্রমূর্তি ধারন করে এবং তাদেরকে চরম শত্রু এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গন্য করতে থাকে। বিপ্লবের ব্যর্থতা হিন্দুদের চাইতে মুসলমানদের জন্যে অনেক বেশী সর্বনাশের কারন হয়ে দাঁড়ায়। শত শত বর্ষব্যাপী যে মুসলমান জাতি হিন্দুদের চাইতে উৎকৃষ্টতর বলে গন্য হয়ে আসছিল, তাদের মর্যাদার শেষ চিহ্নটুকুও অবলুপ্ত হয়। বিদেশী শাসকগন তাদের প্রতি একেবার আস্থাহীন হয়ে পড়ে। বেসামরিক এবং সামরিক চাকুরীতে এতকাল তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। উচ্চ নীচ সমস্ত পদ হতেই তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়।"

ডঃ পদ্ম শাহ বলেন "ভারতে তাদের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ইংরেজরা মুসলমানদের প্রতি দমন নীতি গ্রহন করে। বিপ্লবের সময় মুসলমানরাই শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছিল। তাই বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে পরে ইংরেজরা মুসলমানদের প্রতি এমন নির্যাতন চালায় যাতে তারা ভারতে তাদের গৌরবময় অতীত ভুলে যায়। সামগ্রিক ভাবে তারা মুসলমানদেরকে দুবৃত্ত বলে ধরে নেয় এবং হিন্দুদেরকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিতে থাকে" (১৩৬)।

লর্ড এলেনবরা এক সময়ে বলেছিলেন যে "আমি এ বিষয়ে কিছুতেই চক্ষু বন্ধ রাখতে পারিনা যে ঐ জাতীটা (মুসলমানরা) মূলগত ভাবেই আমাদের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। এ জন্যে আমাদের সঠিক নীতি হবে হিন্দুদের মনোতুষ্টি করা (১৩৭)।

---

(১৩৬) Dr. Padma Shah—Indian National Congress and the Muslims Since 1928

(১৩৭) আবদুল মওদুদ—মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও সংস্কৃতির রূপান্তর

www.pathagar.com

মুসলমানদের প্রতি এরকমের শত্রুতা মূলক আচরনের জন্য তারা ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা, শাসন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকে। ফলে মুসলিম অভিজাত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। তারা যেন হতাশার অতলান্তে তলিয়ে যেতে থাকে। শিক্ষিত এবং অভিজাত সম্প্রদায় ধ্বংসের ফলে তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে সুসংগঠিত করার মত কেউ থাকেনা।

সরকারী ভাষা হিসাবে ফারসী ভাষাকে হটিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে দুর্বোধ্য সংস্কৃত বহুল বাংলা এবং ইংরেজী ভাষা চালু করা হয়। এ সময়ে হিন্দু সংস্কৃত পন্ডিতদের সহায়তায় যে বাংলা ভাষা চালু করা হয় তার একটি নমুনা শ্রী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার মহাশয়ের "প্রবোধ চন্দ্রিকা" হতে উদ্ধৃত করা হল "কোকিল কলালা তাবলে যে মলয়া নিলসে উচ্ছলচ্ছি করাত্যাচ্ছ নির্ঝারন্ত কনাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে" (১৩৮)।

পূর্বে বলা হয়েছে যে মুসলমানরা ইংরেজ এবং তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে নিজদেরকে দূরে রেখেছিল। অপরদিকে হিন্দুরা ইংরেজদের সাথে সহযোগীতা করে তাদের কাছ থেকে যথা সম্ভব ফায়দা লুটার তালেই ছিলনা শুধু, তারা সংঘবদ্ধ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু ধর্মের প্রভূত্ব স্থাপনে সচেষ্ট হলো এবং ইংরেজদের থেকে বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিল।

আদালতে ফারসী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা চালু হবার পরও মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মনযোগ দেয় নাই। এমন সময় নিয়ম করা হয় যে আদালতে আইন জীবি হতে হলে ইংরেজীতে পাশ করতে হবে। তখন ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত "দুরবীন" পত্রিকার সম্পাদক আবদুর রউফের উদ্যোগে ১৮৫৬ খৃঃ আঞ্জুমানে ইসলামিয়া নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। এ সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান দেরকে সংগঠিত করা, ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুন রক্ষা করা এবং

(১৩৮) গোলাম আহমদ মতুর্জা ইতিহাসের ইতিহাস।

www.pathagar.com

সম্মিলিত ভাবে ইংরেজদের নিকট মুসলমানদের তরফ থেকে দাবী দাওয়া পেশ করা। আঞ্জুমানে ইসলামিয়া ইংরেজ সরকারের নিকট দাবী জানায় যে যেহেতু মুসলমান উকিল মুহুরীগন ইংরেজী জানে না, তাই তাদেরকে মাতৃভাষায় দরখাস্ত পেশ করার অনুমতি দেয়া হোক। আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার গুরুত্ব এ জন্যে যে এটাই মুসলমানদের প্রথম সংগঠন যার উদ্দেশ্য ছিল নিজ সম্প্রদায়ের তরফ থেকে ইংরেজদের নিকট আবেদন নিবেদন পেশ করা।

সিপাহী বিপ্লবের পর মুসলমানদের মধ্যে কতিপয় নেতার অবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে নওয়াব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আমীর আলী এবং স্যার সৈয়দ আহমদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় জন্ম গ্রহন করেন। তিনি প্রথমে কলিকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং তথায় ইংরেজীকেও পাঠ্য বিষয় হিসাবে গ্রহন করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্টট হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের মধ্যে সর্ব প্রথম তিনি প্রথম বংগীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় থেকে তিনি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিন "ক্যালকাটা মোহামেডান লিটারেরী এসোসিয়েশন" স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি ইংরেজী শিক্ষার অনুকুলে জনমত সৃষ্টি করে এবং মুসলমান ছাত্রদের কে অধিকতর বৃত্তি ও ভাতা দেবার জন্যে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ১৮৬৩ সালের ৬ই অকেটাবর সমিতির ষষ্ঠ মাসিক সভায় স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর ভাষন দেন। নওয়াব আবদুল লতিফ ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টির প্রয়াস পান এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি জৌনপুরের হযরত মাওলানা কেরামত আলীকে (রঃ) তার সংসদে বক্তৃতা দেয়ার জন্যে আহবান জানান। মাওলানা কেরামত আলী বৃটিশ ভারতকে 'দারুল ইসলাম' বলে ঘোষনা করেন। তিনি আরও ঘোষনা করেন যে, বৃটিশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জেহাদ ঘোষনা করা শুধু যে বেআইনী তা নয়, ধর্ম বিরোধীও বটে। এ ভাষন

www.pathagar.com

ছাপানো হয় এবং এর পাঁচ শত অনুলিপি সারা উপ-মহাদেশে বিলি করা হয়। এর পর হযরত কেরামত আলী গ্রামে গ্রামে ব্যাপক ভাবে ভ্রমণ করেন এবং তাঁর বানী প্রচার করেন। সেকালে হিন্দুদের ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্যে হিন্দু কলেজ ছিল। কিন্তু মুসলমানদের জন্যে অনুরূপ কোন ব্যবস্থা ছিলনা। আবদুল লতিফ দাবী করেন যে মুসলমানদের জন্যে এরূপ একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে। এর পরেই কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে হাজী মহসীন ফাণ্ড অমুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে ব্যয়িত হত। সুন্নী মুসলমান ছাত্ররা এর থেকে কোন সাহায্য পেতনা। আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় মহসীন ফান্ডের দ্বার সকল মুসলিম ছাত্রদের জন্যে উন্মুক্ত হয়।

নওয়াব আবদুল লতিফ ছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্যে অপর এক প্রতিভাবান পুরুষ আপ্রান চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁর নাম স্যার সৈয়দ আমীর আলী। ১৮৪৯ খৃঃ হুগলী জেলায় চুঁচুড়ায় তার জন্ম। ইংরেজী ভাষার উপর তাঁর বিস্ময়কর দখল ছিল। তাঁর সময়ে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ইংরেজী জানা ভারতীয় রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৮৭৬ খঃ তিনি 'লিংকনস-ইন' থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কলকাতা হাই কোর্টে যোগদান করেন। ১৮৯০ সালে তিনি কলিকাতা হাই কোর্টে বিচার পতি নিযুক্ত হন। ১৯০৬ সালে তিনি প্রিভি কাউন্সিলর নিযুক্ত হন। ব্যারিষ্টারী পাশ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ১৮৭৭ সালে "ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে এ সমিতির নাম বদলিয়ে "সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন" রাখা হয়। ন্যায়সংগত ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতি সাধনই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক পুনর্জাগরনও এর লক্ষ্য ছিল।

www.pathagar.com

১৮৮০ সালে কলকাতায় জামাল উদ্দিন আফগানির সাথে নওয়াব আবদুল লতিফ ও স্যার আমীর আলীর সাক্ষাত হয়। তাঁরা উভয়ই জামাল উদ্দিনের প্যান ইসলামী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন। এতে হিন্দু প্রতিক্রিয়া যে কি হয়েছিল তা বিপিন চন্দ্র পালের উক্তি থেকে বুঝা যায়। তিনি বলেছিলেন "আবদুল লতিফ ও স্যার আমীর আলী প্রমুখ শিক্ষিত মুসলমানদের সংস্পর্শে আসিয়া জামাল উদ্দিন তাহাদের মধ্যে সর্ব নাশা প্যান ইসলামী বিষ সংক্রামিত করিয়া গিয়াছেন" (১৩৯)।

সৈয়দ আমীর আলীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৮৮৫ সালে ভারত সরকার মুসলমানদের কিছু কিছু দাবী মানিয়া লন। তাঁর রচিত "স্পিরিট অব ইসলাম" এবং "এ শর্ট হিষ্ট্রি অব সারাসেন" দেশে বিদেশে আলোড়নের সৃষ্টি করে।

এ উপ-মহাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে যে প্রাতঃ স্মরণীয় ব্যক্তির অবদান স্থায়ী ভাবে স্বাক্ষর রেখেছে তাঁর নাম স্যার সৈয়দ আহমদ। তিনি ১৮১৭ সালে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালীন প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করে তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মুন্সেফের চাকুরী গ্রহণ করেন। সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার পর মুসলমানদের উপর যে নির্যাতনের ঝড় নেমে আসে তাতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি মুসলমানদের উপর ইংরেজদের বিরূপ মনোভাব প্রশমনের জন্যে "রিসালাত-ই—আসহাবই বাগওয়াত-ই—হিন্দু" নামক একটি পুস্তক প্রনয়ন করেন। এতে তিনি প্রমান করতে চেষ্টা করেন যে ১৮৫৭ খৃঃ যুদ্ধের জন্যে শুধু মুসলমানেরাই দায়ী ছিলনা বরং ইংরেজদের অবিমৃষ্যকারিতাও এর জন্য দায়ী ছিল। মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের দৃষ্টি ভংগী ও আচরণ পরিবর্তনের জন্যে আবেদন জানিয়ে তিনি "দি লয়েল মোহামেডানস অব ইণ্ডিয়া"

---

(১৩৯) ডঃ সিরাজুল ইসলাম—পাকিস্তান—দেশ ও কৃষ্টি

www.pathagar.com

নামে ও একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। মুসলমানদের পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করার জন্যে তিনি "গাজীপুর ট্রান্সলেশন সোসাইটি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠানটির কাজ ছিল ইংরেজী থেকে উর্দুতে অনুবাদ করা। কিন্তু তাঁর 'এ চেষ্টা তেমন সফল না হওয়াতে তিনি ১৮৭৫ সাল আলীগড় 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এ কলেজ একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মেহোত্রা তার 'ইমারজেন্স অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' বইতে লিখেছেন যে সৈয়দ আহমদ মনে প্রাণে একজন খাঁটি ওহাবী ছিলেন। কিন্তু তিনি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে সংঘাতের পথ ধরে এগুলে মুসলমানরা ইংরেজদের সাথে এঁটে উঠতে পারবেনা। তাই তিনি সহযোগীতার নীতি অবলম্বন করে ইংরেজদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলাকৌশল মুসলমানদেরকে আয়ত্ব করতে উৎসাহিত করেন (১৪০)।

মিঃ মোহোত্রা যাই বলুননা কেন সৈয়দ আহমদ প্রথম জীবনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তিনি মনে করতেন ভারতে হিন্দু - মুসলমান মিলে একটি জাতি। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি বলেছিলেন যে 'ভারতের হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে আমি আমার দু'টি চোখের মতো মনে করি'। আলীগড় মুসলিম এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরেও তিনি 'বলেছিলেন কেউ যদি মনে করে হিন্দু ও মুসলমানদের পার্থক্য সৃষ্টির জন্যে এ কলেজের প্রতিষ্ঠা তবে আমি দুঃখিত হব। হিন্দু ও মুসলমানকে আমি পৃথক দৃষ্টিতে দেখিনা। তারা একে অপরের সহোদর সদৃশ। ১৮৮৩ খৃঃ তিনি পাটনাতে বলেছিলেন, "আমরা একই দেশে বসবাস করি। নিঃসন্দেহে আমরা একই জাতি। আমরা যদি ঐক্য বদ্ধ থাকতে পারি তবেই দেশের এবং উভয় সম্প্রদায়ের উন্নতি এবং সমৃদ্ধি হবে। আমাদের মধ্যে বিভেদ ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ উভয় সম্প্রদায়কে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে।" পাঞ্জাবে এক জনসভায়

(১৪০) Mehotra—Emergence of Indian National Congress.

www.pathagar.com

তিনি বলেছিলেন হিন্দুরা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। এটা ঠিক নয়। আমার মতে হিন্দু কোন ধর্মের নাম নয়। যারা ভারতে বসবাস করে তারাই হিন্দু বলে পরিচয় দিতে পারে। আমিও এদেশের বাসিন্দা হিসাবে নিজেকে হিন্দু বলে দাবী করতে পারি (১৪১)।" কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদ বোধ হয় ইতিহাসের ধারাকে পাল্টে দিতে চেয়েছিলেন। মহাপণ্ডিত আলবেরুনী মন্তব্য করেছিলেন, "হিন্দুরা বিশ্বাস করে তাদের দেশের মত আর কোন দেশ নেই, তাদের জাতির মত আর কোন জাতি নেই। তাদের ধর্মের মত আর কোন ধর্ম নেই। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মত আর কারো জ্ঞান-বিজ্ঞান নেই। তারা উগ্র, নির্বোধ, অহংকারী, আত্মাভিমানি, এবং মূর্খ। তারা যা জানে তা আর কাউকে জানতে দিতে চায়না। তারা তাদের জ্ঞান নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট গোপন রাখতে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করে, আর বিদেশী হলে তো কথাই নেই (১৪২)।" সৈয়দ সরিফুদ্দিন পীরজাদা বলেন "শত শত বৎসর একে অপরের সংস্পর্শে সহযোগীতার মধ্যে বসবাসের ফলে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ঘটলেও তা নাকি সম্রাট আকবরের সময়ে তুংগে পৌঁছেছিল এবং তিনি নাকি এ দু'ধর্মের সমন্বয় বিধান করতে চেয়েছিলেন। হিন্দু এবং মুসলমানদের মিলন সম্ভবপর হয়নি। তারা স্ব-স্ব-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলছিল (১৪৩)।" মিঃ এফ, কে, খান দুররানী বলেন "হিন্দু এবং মুসলমান দু'টি বিভিন্ন জাতি। তাদের পরস্পরের ঐতিহ্য, সামাজিক কাঠামো, নীতিবোধ এবং মানসিকতার বিভিন্নতা এতই প্রকট যে তারা কখনো এক জাতিতে পরিণত হয়নি। তারা দু'টি স্বতন্ত্র জাতি (১৪৪)।"

---

(১৪১) Dr. Padma Shah—Indian National Congress and Muslims Since 1928

(১৪২) ঐ

(১৪৩) Syed Sharifuddin Pirzada—Foundation of Pakistan

(১৪৪) F. R. Khan Durrani—The Making of Pakistan.

www.pathagar.com

ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন "১৮৫৭ সালের পর কখনো হিন্দু এবং মুসলমান উভয় মিলে নিজেদেরকে এক জাতি বলে মনে করেনি" (১৪৫)।"

স্যার সৈয়দ আহমদ প্রথমে হিন্দু ও মুসলমানদেরকে এক জাতি বলে মনে করতেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানের জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ১৮৬৭ সালে বেনারেসে উর্দু ভাষা এবং ফারসী হরফের পরিবর্তে হিন্দী ভাষা এবং দেবনাগরী হরফ প্রচলনের উদ্দেশ্যে হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক দাংগা বাঁধায়। তখন স্যার সৈয়দ আহমদ বিভাগীয় কমিশনার মিঃ সেক্সপিয়ারের নিকট মন্তব্য করেছিলেন যে ভবিষ্যতে এদেশের শিক্ষিত বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় হিন্দু মুসলিম ঐক্যকে অসম্ভব করে তুলবে। তখন মিঃ সেক্সপিয়ার তাঁকে বলেছিলেন, "আপনি এর পূর্বে কখনও শুধুমাত্র মুসলমানদের কথা আলোচনা করেন নাই। আপনি হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছেন। তবে আপনার মন্তব্য বেদনাদায়ক হলেও তা ধ্রুব সত্য (১৪৬)।"

এতদসত্বেও স্যার সৈয়দ আহমদ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়াস চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদান করা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন। মুসলমানেরাও কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে স্যার সৈয়দ আহমদ কংগ্রেসকে বাংগালী হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন। মুসলমানদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে বদরুদ্দিন তায়েবজীকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। তাঁর সভাপতিত্বে যখন কংগ্রেস সদস্যদের অধিবেশন চলছিল তখন স্যার সৈয়দ মুসলমানদের এক অধিবেশনে ঘোষণা করেন "বাংগালীদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলে পরে আমাদের জাতির সর্বনাশ ঘটবে। তোমরা যদি হিন্দুদের

(১৪৫) Dr. Padma Shah—The Indian National Congress and the Muslims Since 1928

(১৪৬) Syed Sharifuddin Pirzada—Foundation of Pakistan

www.pathagar.com

গোলামে পরিণত হতে চাও তবে কংগ্রেস যোগ দাও। "১৮৮৭ সালে তিনি মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স" নামে এক সম্মেলন করেন। এটাই ছিল মুসলমানদের প্রথম সম্মেলন।

খালেদ বিন সায়িদ বলেন "যে কংগ্রেস বাংগালী এবং মারাঠিদের হাতের মুঠায়, তাতে কেমন করে মুসলমানরা যোগ দিতে পারে?' (১৪৭)।"

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছিলেন কংগ্রেসকে হিন্দুদের একটি সংস্থা বলে বিবেচনা করা হতো। কে, কে, আজিজ বলেন "সমসাময়িক কালের সংঘটিত ঘটনাবলী ঐ ধারণার সমর্থন যুগিয়েছিল (১৪৮)।" স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতিফ এবং জাস্টিস সৈয়দ আমীর আলী ইংরেজদের মন থেকে মুসলিম বিদ্বেষ বিদূরণের প্রচেষ্টায় যে কিছুটা সফলতা লাভ করেছিলেন তার পিছনে দু'টি কারণ সক্রিয় ছিল।

বাংলার জননেতা শেরে-বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ১৯১৮ সালে বোম্বের মুসলিম লীগ অধিবেশনে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন "ভারতের মুসলমানদের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবনায় আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। দুনিয়ার যে কোন স্থানে কোনও মুসলিম রাষ্ট্রের পতনে ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা আরো শোচনীয় করে তুলবে (১৪৯)।"

রাসূলে খোদার একটি হাদীস রয়েছে যার মর্ম হলো 'দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান একটি মানব দেহের ন্যায়। দেহের কোন এক অংগে আঘাত পেলে যেমন তার ব্যথা অন্য অংগে ও অনুভূত হয়, তেমনি দুনিয়ার কোথাও মুসলিম মিল্লাতের ক্ষতি সমগ্র বিশ্ব মুসলিম উম্মাকে প্রভাবান্বিত করে।'

---

(১৪৭) Khalid bin Syed—Pakistan in the Formative Stage.

(১৪৮) K. K. Aziz—Britain Under Muslim India

(১৪৯) খালিদ বিন সাইদ—পাকিস্তান ইন দি ফরমেটিভ ষ্টেজ

www.pathagar.com

ইংরেজেরা মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল সে জন্য মুসলমানেরা তাদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ার জার ওসমানিয়া সাম্রাজ্য দখল করার মতলব আঁটেন। ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কারনে প্রদেশ গুলো ওসমানিয়া সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এমনি সময় শক্তির ভারসাম্য রক্ষার জন্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বৃটিশ তুরস্কের সাহায্যে এগিয়ে আসে। মিশরের খেদিব স্বাধীনতা ঘোষনা করতে চাইলে বৃটিশ মন্ত্রীসভা তাদের নৌবহরকে সুলতানের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যেতে নির্দশ দেয়, ফলে মিশরের খেদিব তুরস্কের অধীনতা মেনে নেন। ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের সাথে বৃটিশের সুসম্পর্ক থাকার কারণে এবং তাকে টিকে থাকতে সাহায্য করার কারণে ভারতীয় মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী নীতি কিছুটা প্রশমিত হয়।

সে সময়েও সৌম্যবীর্যে, জ্ঞান-গরিমায় ভারতীয় মুসলমানেরা ভারতের অন্যান্য জাতির চেয়ে দুনিয়াবাসীর নিকট শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত। ইংলণ্ডের সুধীজনের নিকট যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয় তা হলো ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতিটি কেন তাদের বশীভূত হচ্ছে না।

উনিশ শতকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো প্রশ্ন তুললেন "Indian Mussalmans, are they bound in faith to rebel against the queen" অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমান ধর্ম শাস্ত্রে এমন কথা লেখা আছে কি যে রানীর রাজত্বের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ করতেই হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ডব্লিউ, হান্টার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান" রচনা করেন। এ বইতে তিনি মুসলমানদের অসন্তোষের কারন এবং তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। বইটি ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর বইতে বলেন যে ইংরেজ শাসনের ফলে মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাঁদের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে তিনি বলেন "ভগ্ন প্রাসাদরাজির এক কোনায় বসে রাজ পরিবারের বংশধরেরা মজে

www.pathagar.com

যাওয়া হ্রদের দিকে স্বপ্নাতুর দৃষ্টি মেলে নিকৃষ্ট ধরনের মিষ্টান্ন চিবোচ্ছে আর নিজেদের দুঃখ দুর্গতির কাহিনী আলোচনা করছে। কোন রাজনীতিবিদ যদি বৃটিশ কমন্স সভায় আলোড়ন সৃষ্টি করতে চান তা হলে বাংলার যে কোন পুরানো মুসলিম পরিবারের সত্যিকার ইতিহাস বর্ণনা করা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হবে। তাঁর প্রথমে বর্ণনা করতে হবে পুরানো সেই মহামান্য রাজার কাহিনী যিনি তাঁর সেনা বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক হিসাবে বিরাট জনগনের ওপর শাসন চালিয়েছেন, সারা জীবন যিনি বিভিন্ন মনোরম প্রাসাদে রাজদরবারের যাবতীয় নিয়ম কানুনসহ জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং মৃত্যুর পর যাঁর সমাধি সৌধ ঘিরে গড়ে উঠেছে জাঁকালো মসজিদ। আর সে সমস্ত দেখা শোনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওয়াকফ। এর পর তাকে বর্ণনা করতে হবে বর্তমান সময়ের সেইসব নির্বোধ প্রায় রাজকীয় বংশধরদের কাহিনী, যারা তাঁদের বাগানে কোন ইংরেজ শিকারীদলের আগমনের কথা শোনা মাত্র গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে এবং আগন্তুক মেহমানের প্রতি সম্মান দেখাবার কথা বলে ভৃত্যরা তাদেরকে টেনে বের করে আনলে যারা এক ঘেঁয়ে নাকি সুরে বলে চলে যে ক'দিন আগেই মাত্র কয়েকশ টাকার জন্য তাদেরই প্রাসাদে একজন ব্যবসায়ীর প্রান নাশ করা হয়েছে (১৫০)।" হাণ্টার সাহেবের বই এর নাম করন "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান" হলে ও তিনি মূলতঃ তার আলোচনা মুসলিম বাংলার মধ্যেই সীমিত রেখেছেন। উক্ত বই এর অন্যত্র তিনি বলেছেন "সমস্ত পূর্ব বাংলায় কৃষকদের অধিকাংশই হচ্ছে মুসলমান। নদী বহুল ও জলাভূমিতে পূর্ণ ঐ সব জেলার আদিবাসীরা ভদ্র হিন্দু সমাজের কাছে কখনও গ্রহণ যোগ্য হয়নি। আর্যদের দক্ষিনমুখী অভিযান সমুদ্র উপকূলবর্তী বদ্বীপ এলাকার গভীরে তেমন প্রবেশ করেনি। ফলে ঐ এলাকার আদিবাসীদের উপর ব্রাহ্মন্যবাদের প্রভাব খুব বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কাজেই তারা হিন্দু প্রভাব বলয়ের বাইরে থেকে নিম্নতর শ্রেণী হিসাবে প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে মাছ ধরাও প্লাবিত জলাভূমিতে ধান

(১৫০) এম, আনিসুজ্জমান অনূদিত দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান।

www.pathagar.com

চাষাবাদের মত কষ্ট সাধ্য জীবিকায় নিয়োজিত থাকে। তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কঠোরতা নেই। তাদেরকে এতদূর অপবিত্র মনে করা হয় যে উচ্চ বর্ণের কোন ব্রাহ্মন তাদের মাঝে বসবাস করলে তাকে সমাজচ্যুত হতে হয় এবং পরবর্তী কয়েক পুরুষের মধ্যে তার বংশধরেরা আর ব্রাহ্মন বলে গন্য হয় না। আবার জাতে উঠতে হলে তাদেরকে পুনরায় উত্তরাঞ্চলে গিয়ে বসবাস করতে হয়, যে দিক থেকে তাদের পূর্ব পুরুষদের আগমন ঘটেছিল। কিন্তু মুসলমানেরা অনুরূপ বর্ণ বৈষম্যের আদৌ প্রশ্রয় দেয়নি। কখনও সামরিক শক্তি হিসাবে আবার কখন ও বদ্বীপ এলাকার জিলা গুলিতে কৃষি খামার গড়ার প্রকল্প নিয়ে তারা এই এলাকায় আসে। এমনকি যশোরের মত একটা পুরানা আবাদী জেলায়ও তারা এসেছিল কৃষি খামার গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে। ভারতের অভ্যন্তর ভাগের প্রাচীন বীর অভিযাত্রীদের যেমন বিরাটকায় পশু বধ করে দানবাকৃতির উপজাতীয়দের বশীভূত করে ঘনবনাঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে হয়েছে, তেমনি প্রাগ ঐতিহাসিক যুগের বদ্বীপ এলাকায় প্রথম বসতি স্থাপকদেরও এমন একটা অঞ্চলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে হয়েছে যে এলাকাটি ছিল সামুদ্রিক আগ্রাসনের শিকার।

মুসলমানরা এই ভূ-খণ্ডের দক্ষিনাঞ্চলে বিরাট এলাকা সংস্কার করে বসতি স্থাপন করে। তারাই পূর্ব বংগকে সর্ব প্রথম সমুদ্রের গ্রাস থেকে পৃথক করে বসবাসের উপযোগী করার সুখ্যাতি অর্জন করে। তাদের তৈরী বাঁধ ও পাকা রাস্তার ওপর দিয়েই পর্যটকরা এই এলাকায় আসা যাওয়া করে এবং জংগল পরিবৃত নিভৃত পল্লীর যেখানেই যাওয়া যাকনা কেন সেখানেই মুসলমানদের তৈরী মসজিদ দীঘি এবং সমাধি দৃষ্টিগোচর হয়। তারা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই তাদের ধর্ম বিস্তার করেছে, কিছুটা অস্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা, কিন্তু প্রধানতঃ মানব হৃদয়ের দু'টো সহজাত প্রবনতার ওপর বলিষ্ঠ আবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে। হিন্দুরা কখনই বদ্বীপ অঞ্চলের কৃষক অধিবাসীগণকে নিজেদের সম্প্রদায়ের অংশিভুত বলে স্বীকার করেনি।

www.pathagar.com

কিন্তু মুসলমানেরা ব্রাহ্মন ও নিম্ন বর্ণ নির্বিশেষে সবার সামনেই সমাজের প্রাথমিক সুবিধাগুলো তুলে ধরে। তাদের অদম্য ধর্ম প্রচারকরা প্রচার করেন, "সেই সর্ব শক্তিমান আল্লাহর সামনে তোমরা সবাই একইভাবে হাঁটু গেড়ে বস, যে আল্লাহর চোখে সব মানুষ সমান। সকল সৃষ্ট জীবই ধুলি সম নগন্য। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত রসুল। যুদ্ধ জয়ের পর পরই সৈনিকের রনহুংকার ধর্মগুরুর উপদেশা-মৃতে পরিণত হয়"। (১৫১)

হান্টার সাহেবের মতে বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদেরকে যে আকৃষ্ট করতে পারছেনা তার কারণ হলো এ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম ধর্মের কোন স্থান নেই। যে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে তাদের ধর্মকে দুরে রাখা হয়েছে সে শিক্ষা তাদের নিকট গ্রহণ যোগ্য নয়। তাই শুধু নয় কোম্পানীর আমলের পূর্বে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চালু রাখার জন্য মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায় যে ভূ-সম্পত্তি দান করেছিল তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। হুগলীর হাজী মোহাম্মদ মহসীন তাঁর বিরাট জমিদারী বিভিন্ন কল্যানমূলক কাজ এবং মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ওয়াকফ করে গিয়েছিলেন। এ জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল বার হাজার ষ্টার্লিং পাউন্ড। এ ছাড়া সরকার নিজেই এর দায়িত্ব গ্রহন করে ১,০৫,৭০০ পাউন্ড বকেয়া পাওনা আদায় করে। সমস্ত অর্থই সরকার মুসলমানদের কল্যানে ব্যয় না করে আত্মসাৎ করে।

বৃটিশ সরকার কাজী নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। ফলে বিয়ে-শাদী ও পারিবারিক প্রয়োজন ও অন্যান্য অপরিহার্য কাজকর্ম সম্পাদনে মুসলমানেরা কাজীর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। তিনি মত প্রকাশ করেন "পূর্ব বাংলার মুসলমানদের প্রতি বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে যে উপেক্ষা ও অপমানজনক ব্যবহার প্রদর্শিত হয়েছে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে তার স্পষ্ট প্রমাণ প্রতীয়মান হচ্ছে (১৫২)।" তিনি আরো বলেন বৃটিশ এর মুসলিম বিদ্বেষী নীতির ফলে "একশ সত্তর বছর আগে বাংলার কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তানের দরিদ্র হয়ে পড়াছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু বর্তমানে তার পক্ষে ধনী হওয়াটাই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে (১৫৩)।"

---

(১৫১) এম আনিসুজ্জামান অনুদিত দি ইণ্ডিয়ান মুসলিমান।
(১৫২) ঐ
(১৫৩) ঐ

www.pathagar.com

হাণ্টার সাহেবের গবেষনামূলক বই হতে বৃটিশ সরকারের মুসলমানদের প্রতি শত্রুতামূলক আচরনের অপকারিতা সম্পর্কে উপলব্ধি জন্মে। ফলে তারা তাদের প্রতি কিছুটা নমনীয় দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করে।

উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বংগ ভংগ রদ :

১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে আগমন করেন। বিবিধ কারণে তাঁর শাসন কাল বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। সে সময়ে বিভাগপূর্ব বাংলা, বিহার উড়িষ্যা ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে ছিল বংগদেশ বা বেংগল প্রেসিডেন্সি। এর আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮৫ লাখ। একটি কেন্দ্র থেকে এত বড় একটি বিশাল এলাকার আইন শৃংখলা রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯০৫ সালে বংগ বিভাগের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বেই এ প্রদেশ বিভক্তিকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয়েছিল। ১৮৫৩ সালে সার চার্লস গ্রান্ট প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে প্রদেশটিকে ভাগ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। লর্ড কার্জনের দায়িত্বভার গ্রহনের পূর্বে বংগ বিভাগের প্রস্তাবাবলী পেশ করা হয়। কিন্তু ভারত সচীবের দফতরে তা চাপা পড়েছিল। ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন ভারতীয় প্রদেশ গুলির সীমানা পুনঃ নির্ধারনের জন্যে ভারত সচীবকে লিখলে পর যখন বিভাগ সংক্রান্ত ফাইলটি তাঁর নিকট পৌঁছে, তখন তিনি বলেন "বিগত ৯৪ মাস ধরে দফতরের একটি প্রাণীও ফাইলটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেনি বা পেশ করার নির্দেশও দেয়া হয়নি। পৃথিবী যেমন সূর্যের চতুর্দিকে মন্থর গতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে ফাইলটি ও তেমনি দফতরের ভিতর বিভিন্ন স্থানে ঘুরছিল। ঘূর্ণণ শেষে চুড়ান্ত পর্যায়ে আমার নিকট পাঠানো হয়েছে (১৫৪)।"

(১৫৪) Ronaldsay —The Life of Carzan

www.pathagar.com

১৯০৩ সালে সরকারী গেজেটে বংগ-ভংগের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। আসাম এবং পূর্ব বাংলার ঢাকা, চাটগাঁ, রাজশাহী বিভাগ নিয়ে এ প্রদেশ গঠিত হয়। রাজশাহী বিভাগ হতে দার্জিলিং জেলা বাদ পড়ে কিন্তু বিহারের মালদহ জেলাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নতুন প্রদেশের নাম হয় 'পূর্ব বংগ এবং আসাম'। এর আয়তন হয় ১,০৬,৬৫০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা তিন কোটি দশ লাখ। এর মধ্যে ১ কোটি ৮০ লাখ মুসলমান, ১ কোটি ২০ লাখ হিন্দু এবং বাকী ১০ লাখ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। নূতন প্রদেশের রাজধানী নির্বাচিত হয় ঢাকা। ১৯০৩ সালে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হলেও বংগ বিভাগ কার্যকরী করা হয় ১৩ই অক্টোবর, ১৯০৫ সালে।

বংগভংগের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আনন্দের বান ডেকেছিল। নূতন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এতকালের শোষন পীড়নের অবসান হবে ভেবে তাদের মধ্যে নব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। ২২শে অক্টোবর ঢাকার মুসলমানেরা এক মহতী সভায় মিলিত হয়। বংগভংগের দরুন পরিবর্তিত শাসন আমলে কি সুযোগ সুবিধার অধিকারী হওয়া যাবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে বংগভংগের ফলে এতকাল যে সব উৎপীড়ন তারা হিন্দুদের নিকট থেকে সহ্য করেছে, সে সবের মূলোচ্ছেদ হবে। ১৯০৬ সালে বংগভংগের প্রথম বার্ষিকী উৎসবে মুসলমানেরা মিলিত হয়ে শোকরানা নামাজ আদায় করে এবং ভারত সচীব এটিকে "সেটেল্ড ফ্যাক্ট" ঘোষণা করায় তাঁকে অভিনন্দন জানায়। ১৯০৮ সালে মুসলিম লীগ একটি প্রস্তাব গ্রহন করে এই আশা প্রকাশ করে যে, বৃটিশ সরকার এই নিশ্চিত ব্যবস্থায় সুদৃঢ় থাকবেন (১৫৫)। বংগ ভংগ যেমন মুসলমানদেরকে বর্ণ হিন্দুদের শোষন পীড়নের জোয়াল থেকে মুক্তির সম্ভাবনা বয়ে আনে তেমনি বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করে। তারা বুঝতে পারে যে নূতন ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলের

(১৫৫) আবদুল মওদুদ—মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও সংস্কৃতির রূপান্তর

www.pathagar.com

মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়কে আগের মত আর শোষন করা যাবেনা। পূর্ববাংলার জনিদারদের প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। তারা স্থায়ী ভাবে কলকাতায় বসবাস করত এবং সেখানে বিলাস ব্যসনে জীবন কাটাত। তাদের উচ্ছৃংখল এবং বিলাসী জীবনের ব্যয় ভার বহন করতে হত পূর্ব বাংলার দরিদ্র মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়কে। সাধারণ ভাবে সকল বর্ণ হিন্দু এবং বিশেষ ভাবে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, আইনজীবি ও সংবাদিকরা বংগ বিভাগের বিরুদ্ধ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আইন জীবিদের ভয় ছিল ঢাকায় হাইকোর্ট স্থাপিত হলে তারা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের রক্ত চোষার সুযোগ হত বঞ্চিত হবে। আবদুর রসুল নামে জনৈক ব্যারিষ্টারও বংগ ভংগ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। পূর্ব বংগে উৎপাদিত পাট তৎকালে পৃথিবীর বস্তা ও চটের চাহিদা মেটাত। পাট জন্মাতো পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষকগণ আর পাট কলগুলি গড়ে উঠেছিল কলিকাতা ও হুগলীর আশেপাশে। পাট কলের মালিকগনের আশংকা ছিল যে বংগ ভংগের ফলে তাদের পাট কল গুলোতে পাটের সরবরাহ বিঘ্নিত হবে। তা ছাড়া বন্দর হিসাবে কলকাতার, গুরুত্ব হ্রাস পাবে। কারণ নূতন প্রদেশের আমদানী ও রফতানীর জন্যে চাটগাঁ বন্দর ব্যবহৃত হবে। তাই স্বার্থান্বেষী বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় কলকাতাকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। বংগ ভংগ দিবসে কলিকাতার টাউন হলে বর্ণ হিন্দুদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে লাল মোহন ঘোষ, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী প্রমুখ প্রভাবশালী হিন্দু নেতৃবৃন্দ যোগ দিয়ে ঘোষণা করেন যে বংগ ভংগ রদের জন্যে তাঁরা শেষ রক্ত বিন্দু উৎসর্গ করবেন (১৫৬)। কাশিম বাজারের মহারাজ মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী তাঁর সভাপতির ভাষনে বলেন "নূতন প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য স্থাপিত হলে বাংগালী হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হবে। নিজের দেশে আমাদেরকে আগন্তুকের

(১৫৬) Daniel Argov—The Moderats and Extermisis in the Indian National Congress

www.pathagar.com

মত থাকতে হবে। আমাদের জাতির ভাগ্যে ভবিষ্যতে যে কি হবে তা চিন্তা করলে আমি আতংকিত হয়ে পড়ি (১৫৭)।

এ আন্দোলনে ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার কংগ্রেস ও সক্রিয় অংশ গ্রহন করে। এতকাল যাবত কংগ্রেসের নীতি ছিল বৃটিশের তোয়াজ করা। কংগ্রেসের দাবী ছিল প্রশাসনে বৃটিশের সাথে বর্ণ হিন্দুদের অংশিদারিত্ব। কিন্তু এখন তারা "স্বরাজ" দাবী করে। অবশ্য স্বরাজের ব্যাখ্যা তখনও অস্পষ্ট ছিল। স্বরাজ দাবী ছাড়াও তারা বৃটিশ পণ্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করে। বৃটিশ পণ্য বর্জ এবং ম্যানচেষ্টারের তৈয়ারী কাপড় পোড়ানো কংগ্রেসের অন্যতম কর্ম সূচীতে পরিনত হয়। কংগ্রেসের ধারনা ছিল যে তাদের অনুসৃত নীতির ফলে ফলে ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রকল মালিকগন বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে ফলে বংগভংগ রদ হয়ে যাবে।

বর্ণ হিন্দুগন বংগ ভংগ রদের জন্য হিংসাত্মক কার্যক্রমের আশ্রয় গ্রহণ করে। যখন বংগভংগের বিষয়ে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয় তখন অরবিন্দ ঘোষের ভাই বারীন্দ্র নাথ ঘোষ অনুধাবন করেন যে রাজনৈতিক ধর্মের সংগে একাংগীভূত না করলে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে কাজ হবেনা। এ জন্যে তিনি গীতা পাঠের সংগে রাজনৈতিক পাঠ দেবার উদ্দেশ্যে অনুশীলন সমিতি গঠন করেন। এর পূর্বে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতায় যুগান্তর, সমিতি নামক একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছিলেন। এ দু'টি সমিতি হিন্দু যুবকদের লাঠি খেলা, ছোরা খেলা এবং আগ্নেয়াস্ত্র চালনা শিক্ষা দিত। আবদুল মওদুদ সাহেব বলেন "বাংলা বিভাগ কার্যকারী হলে বাংগালী হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। বংগ মাতার অংগচ্ছেদ বলে বিভাগটার ধর্মীয় রূপ দেওয়া হলো এবং সমগ্র হিন্দু বাংলা আন্দোলনে মেতে উঠলো (১৫৮)।

বংগভংগকে বানচাল করার জন্যে কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

---

(১৫৭) হাসান আবদুল কাইয়ুম দৈনিক ইনকিলাব ১লা জুলাই, ১৯৮৬।

(১৫৮) আবদুল মওদুদ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও সংস্কৃতির রূপান্তর

www.pathagar.com

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ... ..." গানটি রচনা। এই গানটিই এখন খণ্ডিত বাংলার জাতীয় সংগীত বংগভংগ রদের জন্যে বর্ণহিন্দু যুবকগণ সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নেয়। লর্ড মিন্টোকে হত্যার জন্যে চার বার চেষ্টা করা হয়। লর্ড মর্লের রাজনৈতিক সচীবকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা উৎসাহিত করার জন্যে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গানটি লিখেন তা হলো "উদয়ের পথে শুনি কার বানী ভয় নাই ওরে ভয় নাই। নিঃশেষে প্রাণ করিবে যে দান/ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"। শিবাজী উৎসবের দশম বার্ষিকী পালন উপলক্ষে ১৯০৬ সালে বাল গংগাধর তিলক তৎকালীন বংগ দেশে আগমন করেন। তার সম্বর্দ্ধনা সভায় ভাষন দানকালে তিনি বলেন "রত্নগিরিতে শিবাজীর মন্দিরে বন্দে মাতরম শব্দগুলি খোদিত হয়ে আছে। শিবাজী উৎসব রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস। তাই সমগ্র ভারত ব্যাপী শিবাজী উৎসবের প্রচলন করতে হবে। যে মাতা কালী বাংগালীদের ভাগ্য বিধাতা, তিনি ছিলেন শিবাজীরও রক্ষা কর্তা। ভবানী ব্যতীত শিবাজীকে কল্পনা করা যায়না। তাই 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি শিবাজী উৎসবের অংগীভূত হয়ে গিয়েছে।" অতঃপর তিলক বলেন "আমাদেরকে গৌরব এবং সমৃদ্ধির পথে চালিত করার জন্যে শিবাজীর আগমন অবশ্যম্ভাবী।" সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী কলকাতায় ঘোষনা করেন "তিলক দাক্ষিণাত্যের মুকুট বিহীন সম্রাট। পেশোয়ার দায়িত্ব পালনের জন্যে তার আগমন ঘটেছে।" বেলগামে গংগাধর রাও দেশপাণ্ডে তিলককে "রাজাধিরাজ ছত্রপতি তিলক মহারাজ" বলে ঘোষনা করেন এবং বলেন "তিলক লোকমান্যই আমাদের শিবাজী" (১৫৯)। হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে রবীন্দ্র নাথ শিবাজী উৎসবে যোগ দেন এবং শিবাজী" উৎসব নামে এক কবিতা লিখেন। "শুভ শংখনাদে জয়তু শিবাজী" উচ্চারণ করে এ ধ্যান মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

"ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীয় বসন -
দরিদ্রের বল।
এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে এ মহা বচন
করিব সম্বল।"

---

(১৫৯) Daniel Argov—The Moderats and Extermisis in the Indian National Congress.

www.pathagar.com

ভারতকে এক ধর্ম রাজ্যে পরিণত করার যে ইচ্ছা তিনি পোষন করতেন তা ছিল রাম রাজত্ব। বর্ণ হিন্দুদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুধু বৃটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি, মুসলমানেরাও এর শিকারে পরিনত হয়ে ছিল এবং এর লক্ষ্য ছিল হিন্দু ধর্মের পূণর্জাগরন। সন্ত্রাস বাদীদেরকে হিন্দুদের কালী মন্দির প্রবেশ করে শপথ নিতে হতো (১৬০)।

বংগ ভংগ বিরোধীদের শ্লোগান ছিল "বন্দে মাতরম" অর্থাৎ মাতাকে বন্দনা কর। এখানে মাতা বলতে কালী এবং দেশ উভয়কেই বুঝাত। "বন্দে মাতরম" বংকিম চন্দ্রের আনন্দ মঠের সন্তান সেনাদের যুদ্ধ ধ্বনি ছিল। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সন্তান সেনাদের সে সংগ্রাম ছিল এ দেশ থেকে মুসলিমদেরকে বিতাড়িত করে ইংরেজ শাসন কায়েম করার জন্যে।

বংগ ভংগকে কেন্দ্র করে সমকালীন পত্রিকাগুলোও উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে লিপ্ত হয়। পত্রিকাগুলো মুসলিম বিদ্বেষী ভূমিকা গ্রহন করে। নমুনা স্বরূপ ১৯০৮ সালের ৩০শে মে তারিখে যুগান্তর পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়ে ছিল তা এখানে তুলে ধরা হলো—"তৃষ্ণার্ত মাতা চান যে তার সন্তানেরা যেন এ তৃষ্ণা নিবারনের জন্যে সচেষ্ট হয়। নর শোনিত এবং নর মুন্ডেই কেবল তার তৃষ্ণা নিবারন করতে পারে। তাই সন্তানদের কর্তব্য নর শোনিত এবং নর মুন্ডের অর্ঘ সাজিয়ে তার পূজা করা। পূজার এ নৈবেদ্য জোগাড় করার জন্যে প্রয়োজন হলে তারা যেন প্রান বিসর্জন দিতে ও পিছপা না হন। যে দিন গ্রামে গ্রামে এ সমস্ত উপাচার দিয়ে পূজা করা হবে সেদিন ভারতবাসীরা স্বর্গ হতে প্রেরনা পাবে এবং স্বাধীনতার মুকুট তাদের হাতে আসবে।"

উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান মুসলমানদেরকে শংকিত করে তোলে এবং তারাও তাদের নিজস্ব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ সংকটকালে নবাব সলিমুল্লার আবির্ভাব ঘটে। তিনি

(১৬০) শ্রীমতি কুন্দপ্রভা সেনগুপ্তা—কারা স্মৃতি

www.pathagar.com

মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে এগিয়ে আসেন। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকায় "নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন" আহবান করেন। এ সম্মেলন উপলক্ষে সমগ্র ভারত এবং বিদেশ হতে মোট আট হাজার প্রতিনিধি শাহবাগের উদ্যানে সমবেত হন। নবাব ভিখারুল মুলকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ ঐতিহাসিক সমাবেশে নবাব খাজা সলিমুল্লাহ "নিখিল ভারত মুসলিম লীগ" নামে একটি মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করেন এবং দিল্লীর হেকিম আজমল খাঁ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। সে বিরাট সমাবেশে বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে প্রস্তাবটি সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হবার সংগে সংগেই সৈয়দ আমীর আলী লন্ডনে এর শাখা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

মুসলিম লীগ ছিল নিছক একটি আত্মরক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। অন্য কোন সম্প্রদায়ের বিরোধীতা করা বা কারো স্বার্থে আঘাত হানা এর উদ্দেশ্য ছিলনা। মুসলিম লীগ যে তিনটি নীতি গ্রহন করে তা হলো (১) মুসলমানদেরকে বৃটিশের প্রতি অনুগত রাখা। (২) ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ হেফাজত করা এবং (৩) মুসলিম এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হার্দ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা।' মুসলিম লীগের সদস্যদের কংগ্রেসের সদস্য পদ গ্রহণও কোন রকম বাধা ছিলনা। এখানে স্মরন রাখা দরকার যে মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য বৃটিশের প্রতি মুসলমানদেরকে অনুগত রাখার নীতি গৃহীত হলেও এটা কংগ্রেসের মত বৃটিশ রাজ কর্মচারীদের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান ছিলনা। লর্ড ডাফরিন বা এলেন অক্টোভিয়ান হিউমের মত কোন বৃটিশ রাজকর্মচারীর উদ্যোগে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি।

মুসলিম লীগ গঠিত হবার কয়েকমাস পূর্বে একই সালের ১লা অক্টোবর মহামান্য আগা খাঁ'র নেতৃত্বে একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল বড় লাট মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইতিহাসে এটা সিমলা ডেপুটেশন

www.pathagar.com

নামে খ্যাত। সমগ্র উপমহাদেশের মোট সত্তর জন বরেন্য নেতা এতে প্রতিনিধিত্ব করেন। চক্ষু অস্ত্রোপ্রাচারের কারনে নওয়াব সলিমুল্লা এতে অংশ গ্রহন করতে পারেন নি। সিমলা ডেপুটেশন বিভিন্ন প্রাদেশিক সংস্থা সমূহে এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষনের জন্য জোর দাবী জানায়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলির সিনেট ও সিন্ডিকেট সমূহে মুসলমানদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদের পাওনা অধিকার আদায়ে দাবী জানানো হয়। স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার প্রবর্তনই ছিল এ সকল দাবী দাওয়ার সার কথা। ডেপুটেশনের প্রতিনিধিরা মুসলমানদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী ও উত্থাপন করে। লর্ড মিন্টো মুসলমানদের দাবী গুলির যৌক্তিকতা সম্পর্কে একমত হন। ১৯০৯ সালে সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন ভারত সচীব লর্ড মর্লের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাৎকারে তারা লর্ড মিন্টোর সমীপে সিমলা ডেপুটেশনে যে দাবী পেশ করে ছিলেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচনের দাবী জানান। ফলে ১৯০৯ সালে মর্লে মিন্টো সংস্কার আইন মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। পৃথক নির্বাচনের দাবী আদায় ছিল মুসলমানদের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয়। ১৯১০ সাল নাগাদ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ভাটা পড়লেও বৃটিশ সরকার বঙ্গ হিন্দুদের দাবীর নিকট নতি স্বীকার করে এবং ১৯১১ সালের ১১ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী দিল্লীর দরবারে বংগ ভংগ রদ করেন। উগ্র বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় এতে উল্লাসিত হয়ে উঠে। কবি রবীন্দ্র নাথ পঞ্চম জর্জের প্রশংসায় যে গানটি রচনা করেন তা হলো "জনগন মন অধিনায়ক হে ভারত ভাগ্য বিধাতা... ....." উল্লেখ্য. গানটিতে সম্রাট পঞ্চম জর্জকে ভারতের ভাগ্য বিধাতা হিসাবে বরন করা হয়েছিল তা এখন স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত।

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলিম সহযোগীতা ঃ

বংগ ভংগ রদের ফলে মুসলমানেরা বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রতারিত হন। ফলে তাদের মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব দানা বাঁধতে থাকে। এ সময়ে মুসলমানদের ইংরেজদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করার আরো একটি কারণ ছিল। পূর্বে বলা হয়েছে যে রাশিয়ার জার তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে পর বৃটেন তুরস্কের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং এর ফলে তাদের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব অনেকটা নমনীয় হয়। ইতিমধ্যে ১৮৭৮ সালে বার্লিন চুক্তির মাধ্যমে বৃটিশ এবং রাশিয়া আপোষ রফায় পৌঁছে। ফলে বৃটিশ এবং রাশিয়া মিত্র ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। ১৯১১-১২ সালে বলকান যুদ্ধে বৃটিশ সরকার তুরস্কের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং এ যুদ্ধে তুরস্ক ইউরোপে তার সাম্রাজ্যের প্রায় সম্পূর্ণটাই হারায়। তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াতে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশের প্রতি অসন্তোষ পুনঃ বৃদ্ধি পায়। এর পর ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে বৃটিশ সরকার তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাই বংগ ভংগ রদের ক্ষত না শুকাতেই মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতার মনোভাব গড়ে উঠে এবং ১৯১২ সালে উভয়ই একই রকম কর্মসূচী গ্রহণ করে।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তার নাম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। তিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে করাচীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্যে লণ্ডনের লিংকনস-ইনে ভর্তি হন। ১৮৯৬ সালে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি বোম্বাই হাই কোর্টে ব্যারিষ্টার হিসাবে যোগদান করেন। বিলাতে থাকাকালীন সময়ে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের উদার নীতি তাঁকে প্রভাবান্বিত করে। একই সময়ে তিনি উদার মতাবলম্বী কংগ্রেস নেতা দাদা ভাই নওরোজীর সংস্পর্শে আসেন।

www.pathagar.com

দাদা ভাই নওরোজী ছিলেন পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৯০৬ সালে তিনি নওরোজীর ব্যক্তিগত সচীব নিযুক্ত হন এবং একই বৎসর কংগ্রেসে যোগ দেন। স্যার সৈয়দ আমীর আলী তখন লণ্ডনে অবস্থান করছিলেন। জিন্নাহ্ তাঁকে কংগ্রেসে যোগদানের জন্যে অনুরোধ জানান। কিন্তু স্যার সৈয়দ আমীর আলী উল্টা তাঁকে কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে মুসলিম লীগে যোগ দেয়ার জন্যে উপদেশ দেন। ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে অনুসরণ করে 'স্বরাজ্যের' দাবী তোলে। সে বৎসরই মিঃ জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগ দেন। যে দু' ব্যক্তি তাঁকে মুসলিম লীগে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের এ মর্মে শপথ নিতে হয়েছিল যে "তার মুসলিম লীগে যোগদান এবং মুসলিম স্বার্থ রক্ষার্থে ক্রিয়া কলাপ কোন সময়ে কোন প্রকারে যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রতি তিনি নিবেদিত প্রাণ তার উপর কোন প্রকার ছায়াপাত করতে পারবে না (১৬১)।" তাই দেখা যায় মুসলিম লীগ এবং মুসলিম স্বার্থ তার নিকট ছিল গৌণ। আর ভারতীয় জাতীয় স্বার্থ ছিল মুখ্য। মিঃ জিন্নাহর প্রচেষ্টায় ১৯১৫ সালে বোম্বেতে মুসলিম লীগের অধিবেশনে সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, এনি বেসান্ত, পণ্ডিত মালব্য, সরোজিনী নাইডু এবং মিঃ গান্ধীর মত জাঁদরেল কংগ্রেস নেতৃবর্গ অতিথি হিসাবে যোগ দেন।

"জিন্নাহ্ অবশ্য চাননি যে মুসলিম লীগ হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের মধ্যে ওলিয়ে যাক বা কংগ্রেস মুসলিম লীগের মত এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ুক। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের ঐক্যই ছিল তার কাম্য (১৬২)।"

---

(১৬১) সরোজিনি নাইডু—মুহম্মদ আলী জিন্নাহ—এমবেসেডর অব হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি

(১৬২) হেক্টার বলিথো—জিন্নাহ্

www.pathagar.com

জিন্নাহর পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লীগে উদার মতাবলম্বীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের অধিবেশনে বসে। মুসলিম লীগ অধিবেশনে মিঃ জিন্নাহ সভাপতিত্ব করেন। তিনি সভাপতির ভাষণে বলেন "আমরা কোন অনুগ্রহ চাই না। পক্ষপাতিত্ব মূলক আচরণের প্রত্যাশী আমরা নই। কারন তা জাতীর হীনমন্যতার পরিচায়ক এবং রাষ্ট্রের পক্ষেও ক্ষতিকারক। হিন্দুদের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছামূলক আচরণ এবং ভ্রাতৃত্বভাবাপন্ন হতে হবে। দু'টি সহোদর প্রতিম সম্প্রদায়ের সমঝোতার মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতি সম্ভব (১৬৩)।" লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস এ এবং মুসলিম লীগের মধ্যে যে চুক্তি হয়, তদনুযায়ী মুসলিম প্রধান বংগ দেশ এবং পাঞ্জাবের আইন সভায় মুসলমানেরা সখ্যানুপাতে যে আসন নিতে পারতো তার চাইতে কম সংখ্যক আসন নিতে রাজী হয়। আবার যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যায় লঘিষ্ট সে সমস্ত প্রদেশে তারা অনুপাতিক হারের চাইতে বেশী সংখ্যক আসন লাভের অধিকারী হয়। একে ওয়েটেজ সিস্টেম বলা হয়। কংগ্রেস স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা মেনে নেয়। কংগ্রেস এ প্রস্তাবে রাজী হয় যে কোন সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশের সদস্যের সম্মতি ব্যতীত আইন সভায় কোন বিল পাশ হবেনা। এ চুক্তি "লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট" নামে খ্যাত। যেহেতু মিঃ জিন্নাহর প্রচেষ্টার ফলে কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে মিলন ঘটে, সেহেতু তখন হতে তিনি 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' হিসাবে আখ্যায়িত হতে থাকেন। এ সময়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য তুংগে পৌঁছে এ চুক্তি ১৯১৯ সালের ইন্ডিয়া এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হবার পক্ষে সহায়ক হয়।

হিন্দু—মুসলিম ঐক্যে ফাটলঃ

মিঃ গান্ধী দক্ষিন আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে কিছুটা সফলতা অর্জনের পরে ভারতে ফিরে আসেন এবং কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন হিন্দু পুণর্জাগরণে বিশ্বাসী এবং

(১৬৩) হেক্টর বলিথো —জিন্নাহ্

www.pathagar.com

একজন গোড়া হিন্দু। তা ছাড়া নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে তাঁর পরিচয় ছিলনা। তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁর আগমনের দু'বৎসরের মধ্যে তিনি হিন্দু প্রধান কংগ্রেসে স্থান করে নেন। তিনি উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন বলেই কংগ্রেসে তাঁর প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি মহাত্মা গান্ধী নামে পরিচিত হন। অনেক মনে করেন যে যদি সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী বা চিত্তরঞ্জন দাসের মত উদার মতাবলম্বী বাংগালীদের হাতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থাকত তবে হয়তো বিভাগ পূর্ব বংগ দেশের ইতিহাস ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতো। কিন্তু ইতি-মধ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্ব বর্ণ হিন্দু প্রভূত্ব স্থাপনে অভিলাষী উগ্র অবাংগালী নেতাদের হাতে চলে যাবার ফলে তা সম্ভব হয়নি। মাদ্রাজে বাল গংগাধর তিলক যখন শিবাজী উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করছিলেন, তখন পুনাতে শিবাজী স্মরণে এক সমাবেশে সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী বলেছিলেন "শিবাজী মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়েছে অস্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু আমাদের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের লড়াই মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। আমরা জাতীয় স্বার্থে তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে চাই। আমাদের অস্ত্র তলোয়ার নয়, কলম। আমরা নিয়ম তান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী (১৬৪)।"

দেশ বন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাস কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক ভূমিকায় মর্মাহত হয়ে 'স্বরাজ পার্টি' গঠন করে ছিলেন। তিনি মুসলিম নেতাদের সাথে বেংগল প্যাক্ট নামে একটি চুক্তি করে ছিলেন। এ চুক্তি অনুযায়ী বংগ দেশের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় জন সংখ্যার ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সংখ্যা গুরু প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ছিল এবং চাকুরী ক্ষেত্রেও তাদের জন্যে শত করা ষাট ভাগ স্থান সংরক্ষিত থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে ছিল। তাই মুসলিম স্বার্থে বংগ দেশের মুসলমানগণ চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ পার্টিতে অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল।

---

(১৬৪) ডালিয়েল আরগভ—দি মডারেট্স্ এণ্ড দি এক্সট্রিমিট্স্ অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।

www.pathagar.com

গান্ধী নিয়মতন্ত্র বহির্ভূত আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। পক্ষান্তরে মিঃ জিন্নাহ্ ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষপাতী। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপ অনিয়মতান্ত্রিক পথ ধরে এগিয়ে চলে। তাই ১৯১৯ সালে বৃটিশ সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতা মূলক কার্যকলাপে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্যে জুরী ছাড়া বিচারের ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এ আইনটি রাউলাট এ্যাক্ট নামে পরিচিত। বিনা জুরীতে বিচারের ব্যবস্থা করা হলেও যাতে এর অপপ্রয়োগ না হয় তার জন্যে যথেষ্ট সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সর্বোপরি আইনটি কখনো প্রয়োগ করা হয়নি। মিঃ জিন্নাহ্ আইনটিকে একটি নিবর্তন মূলক ব্যবস্থা বলে ভাইসরয়ের নিকট প্রতিবাদ জানান এবং আইন সভায় হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন যে এর ফলে দেশে বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। মিঃ গান্ধী আইন পাশের দিনটিকে "অপমানজনক দিবস" হিসাবে পালন করেন এবং অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। মিঃ জিন্নাহ্ অভিমত পোষন করতেন যে দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত সে দেশে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন সহিংস হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। মিঃ গান্ধী ৬ই এপ্রিল থেকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। তিনি এ কর্মসূচী সফলের উদ্দেশ্যে দেশময় ভ্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকার ৭ই এপ্রিল তাঁর পাঞ্জাবে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং ১৪৪ ধারা জারী করে। এতে ক্রুদ্ধ জনতা তিন জন ইউরোপীয় ব্যাংক ম্যানেজারকে হত্যা করে। তারা ব্যাংকের টাকা পয়সা লুট করে এবং রেলওয়ে ষ্টেশনে আগুন ধরাবার চেষ্টা করে। সরকার সমস্ত জন সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষনা করে এবং বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ডায়ারকে বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব অর্পন করে। সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আইন অমান্যকারী কংগ্রেস কর্মীগণ জালানীওয়ালা বাগে সমবেত হলে জেনারেল ডায়ার কর্তব্যরত সেনা বাহিনীকে গুলি বর্ষনের নির্দেশ দেন। ফলে প্রায় ৪০০ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। মিঃ জিন্নাহ্ হিন্দুদের উপর মিঃ গান্ধীর ধ্বংসাত্মক কর্মসূচীর প্রভাব নীরবে দর্শন করেন। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মোজাফফর আহমদ তার রচিত

www.pathagar.com

"আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" বইতে লিখেছেন "পাঞ্জাবে যা যা ঘটছিল গান্ধীজি তাতে মনে দুঃখ পাননি এ কথা কেমন করে বলব? কিন্তু তিনি ঘোষনা করলেন যে সত্যাগ্রহের কথা বলে তিনি হিমালয় প্রমান ভুল করেছিলেন। তিনি বললেন তাঁর প্রস্তাবের ফলেই মন্দ লোকেরা স্থায়ী বিশৃংখলা ঘটাতে পেরেছে। তিনি তার সত্যাগ্রহের প্রস্তাব তুলে নিলেন। পাঞ্জাবে কি ঘটে গেল, আর গান্ধীজি কি বললেন। তিনি জনসাধারণকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলেন।" গান্ধী শুধু হিন্দুদের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাদের মহাত্মা। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক নেতা। গান্ধী এনি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত হোমরুল লীগের নাম পরিবর্তন করে এর নাম দেন "স্বরাজ সভা"। এরুপে এনি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত 'হোমরুল লীগ' হিন্দু বংগে রক্ষিত হয়।

প্রথম মহা যুদ্ধে তুরস্ক হেরে গেলে ভারতীয় মুসলমানগণ ওসমানিয়া খিলাফতের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংকিত হয়ে পড়ে এবং বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। খিলাফতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন নামে মুসলমানদের এক আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধী সুযোগ বুঝে মুসলিমদের নেতৃত্ব লাভের লোভে মাওলানা মুহাম্মদ আলীর সাথে একযোগে খেলাফত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। জালানী ওয়ালা বাগ হত্যাযজ্ঞের আর যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং ওসমানিয়া খিলাফতকে যাতে টিকিয়ে রাখা যায় তার জন্যে অহিংস ও অসহযোগের নীতির ভিত্তিতে ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২০ সালে কলিকাতাতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি নিম্নরুপ কর্মসূচী ঘোষনা করেন :— (১) বৃটিশ সরকারের প্রদত্ত সমস্ত উপাধি ও বিনা পারিশ্রমিকে সম্মানজনক পদ গুলো (অনারারী পোষ্ট) ত্যাগ করা, (২) সরকারী দরবার এবং অনুষ্ঠান বর্জন করা, (৩) পর্যায়ে ক্রমে সরকারী স্কুল কলেজ বা সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুল কলেজ হতে শিক্ষার্থীদেরকে বের করে আনা; (৪) আইনজীবি এবং বিচার প্রার্থীদের দ্বারা বৃটিশ কোর্ট বর্জন করা; (৫) কেরানী, শ্রমিক এবং সৈনিক

www.pathagar.com

হিসাবে মেসোপটিমিয়াতে যেতে অস্বীকৃতি জানানো; (৬) মন্টেগু চেমস্ ফোর্ড সংস্কার আইন অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করা। মিঃ জিন্নাহ্, বিপিন চন্দ্র পাল, দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পন্ডিত মদন মোহন মালব্য এ অবাস্তব কর্মসূচির বিরোধীতা করেন। গান্ধীর প্রস্তাবের পক্ষে ১৮০৬ ভোট এবং বিপক্ষে ৮৮৪ ভোট পড়ে। ডঃ বি, আর আম্বেদকার বলেন "প্রয়াত মিঃ ডায়ারস পরবর্তী কালে আমাকে একদিন বলেছিলেন কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানকারী অধিকাংশ প্রতিনিধিই ছিল কলকাতার ট্যাক্সি চালক এবং অর্থের বিনিময়ে তারা গান্ধীর কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল (১৬৫)।

এর পর ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে মিঃ জিন্নাহ্ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। পক্ষান্তরে মিঃ গান্ধী তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির ভিত্তিতে ঘোষনা করেন যে তাঁর অহিংস অসহযোগ কর্মসূচী গ্রহণ করলে ভারত ১৯২১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর স্বাধীনতা লাভ করবে (১৬৬)। তাঁর এ অহিংস আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠে। উন্মত্ত কংগ্রেস কর্মীগণ চৌরী চেরাতে ২০ জন পুলিশ কনেস্টেবলকে পুড়িয়ে মারে। গান্ধী ভীত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটান। ভারতের স্বাধীনতার পরিবর্তে তাঁকে জেলে পাঠানো হলো। কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের পর মিঃ জিন্নাহ্ কংগ্রেস হতে পদত্যাগ করেন। ইতিপূর্বে অমৃতসর অধিবেশনে তিনি মুসলিম লীগের স্থায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের নেতৃত্ব উগ্র পন্থীদের হাতে চলে যাওয়াতে সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীও কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে যোগদান করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং কংগ্রেস থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এভাবে কংগ্রেসে উগ্রপন্থীদের একাধিপত্য স্থাপিত হয়।

খেলাফত আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অভুতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। যদিও খিলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মাওলানা

(১৬৫) Khalid Bin Sayed—Pakistan in the formative stag
(১৬৬) Hector Bolitho—Jinnah

www.pathagar.com

মুহাম্মদ আলী ও মিঃ গান্ধীর মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়ে ছিল, তবুও তাঁদের লক্ষ্য ছিল ভিন্ন মুখী। ভারতের স্বাধীনতা অর্দায় করা খিলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিলনা। খিলাফত আন্দোলনকারীরা ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তাদের লক্ষ্য ছিল ওসমানিয়া খিলাফতকে টিকিয়ে রাখা। অন্য দিকে মিঃ গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে ভারতে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতি মুসলমানদের সমর্থন আদায় করা। খিলাফত আন্দোলনের নেতাগন ভারতবর্ষকে দারুল হরব বলে ঘোষনা করার ফলে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্দু প্রদেশের ১৮,০০০ মুসলমান পরিবার তাদের জায়গা জমি, বাড়ী ঘর সস্তায় বিক্রী করে দিয়ে জনৈক জান মুহাম্মদের নেতৃত্বে মুসলিম দেশ আফগানিস্তানের দিকে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এদিকে আফগান সরকার তাদের আগমনরোধকল্পে সীমান্ত বন্ধ করে দেয়। এ ঘটনা সম্পর্কে এ, বি. রাজপুত বলেন "এটা ছিল ঋষির দেশকে ম্লেচ্ছশূন্য করার জন্যে মিঃ গান্ধীর পাতা একটি ফাঁদ। গান্ধীর কাযক্রমের এটাই ছিল প্রকৃত লক্ষ্য। এতে নিঃসন্দেহে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। জেড, এ, সুলেরী বলেন "যা কিছু মুসলমানদের সর্বনাশের কারণ হতে পারত তার প্রতিই মহাত্মার মহৎ আশিবাদ বর্ষিত হতো (১৬৭)।"

কামাল আতাতুর্ক ১৯২৪ সালে ৩রা মার্চ খেলাফতের বিলুপ্তি ঘটান। ফলে খেলাফত আন্দোলনেরও অবসান ঘটে।

খিলাফত আন্দোলনে যোগদানের কারন সম্পর্কে গান্ধী নিজে বলেছেন "খিলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আমি ও মুহাম্মদ আলী ঘনিষ্ট হয়েছিলাম। মুহাম্মদ আলীর নিকট খিলাফত ছিল একটি ধর্মীয় ব্যাপার। আর গো মাতার নিরাপত্তা বিধানের জন্য আমি খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলাম, কারন মুসলমানদের ছুরির তলা থেকে গোমাতাকে রক্ষা করা আমার ধর্মীয় কর্তব্য। গান্ধীর উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে হলেও সফল হয়েছিল

(১৬৭) Khalid Bin Syed—Pakistan in the Formative Stage.

www.pathagar.com

কারন "১৯২১ সালে বকর-ই-ঈদে মুসলমানেরা কোন গরু কোরবানী করে নাই।" (১৬৮) কিন্তু মিঃ গান্ধী অচিরেই তাঁর ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন "আমাদের উভয়ের জীবনে একবার সুযোগ এসেছিল। আগামী শত বৎসরের মধ্যেও খিলাফত সমস্যার মত কোন সমস্যা উদ্ভব হবে না। হিন্দুরা যদি মুসলমানদের সাথে স্থায়ীভাবে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় তবে তাদেরকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে ইসলামের গৌরবের জন্যে মুসলমানদের সাথে একত্রে প্রাণ বিসর্জন দিতে (১৬৯)।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে লালা লাজপত রায়, বাল গংগাধর তিলক প্রমুখ বর্ণ হিন্দু আধিপত্যবাদী অবাংগালী কংগ্রেস নেতৃবর্গ কংগ্রেস হতে মুসলমানদের বিতাড়িত করে একে একটি একক হিন্দু প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু তা সম্ভবপর না হওয়াতে ১৯২১ খৃঃ কিছু সংখ্যক ধর্মোন্মাদ হিন্দু সদস্য নিজেরাই কংগ্রেস ত্যাগ করে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের নেতৃত্বে "হিন্দু মহাসভা" গঠন করে দেশে হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রকাশ্য প্রচারণা চালাতে থাকে।

পৃথক নির্বাচন হিন্দুদেরকে বিচলিত করে তোলে। ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেমস ফোর্ড সংস্কার আইনে এককেন্দ্রিক সরকারের কর্তৃত্ব শিথিল করে প্রদেশগুলোকে কিছু পরিমান স্বায়ত্ব শাসন দেয়া হয়। প্রদেশগুলোর স্বায়ত্ব শাসনের নীতির স্বীকৃতির ফলে বর্ণ হিন্দুদের আশংকা জন্মে যে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানগণ তাদের মুঠোর বাইরে চলে যাবে। তাই দয়ানন্দ সুরস্বতী প্রতিষ্ঠিত মৃত প্রায় আর্য সমাজকে আবার নূতন করে গঠন করে পাইকারীভাবে মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার জন্যে পুনর্বার শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করে। যুদ্ধাংদেহী হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে "সংগঠণ আন্দোলন" জোরদার হয়ে উঠে। কোহাট, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কলকাতা আরও বহু স্থানে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাংগা শুরু হয়। ১৯২৩ থেকে ১৯২৭

(১৬৮) Khalid Bin Sayid—Pakiatan in the Formative Stage
(১৬৯) ঐ

www.pathagar.com

পর্যন্ত এরকমের মারাত্মক দাংগার সংখ্যা ১১২। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে কোহাটের দাংগাকে কেন্দ্র করে মাওলানা মুহাম্মদ আলী এবং মিঃ গান্ধীর মধ্যে বিরোধ বাধে।

ভারতের শাসনতান্ত্রিক ব্যাপার পর্যালোচনার জন্যে বৃটিশ সরকার সাইমন কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন করে। এতে কোন ভারতীয় সদস্য ছিলনা। কমিশনে ভারতীয় সদস্য না থাকার কারন সম্মুখে লর্ড বার্কেন হেড মনে করতেন যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হবার কারনে তাদের পক্ষে সকলের গ্রহনযোগ্য সংবিধানের রূপ রেখা পেশ করা সম্ভব হবে না। কংগ্রেস সাইমন কমিশন বর্জন করার কথা ঘোষণা করে। মুসলিম লীগের রক্ষনশীল সদস্যগণ স্যার শফীর নেতৃত্বে কমিশনের সাথে সহযে গীতার জন্য প্রস্তাব পাশ করেন। মিঃ জিন্নাহ তখন পর্যন্ত হিন্দু মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের অনুসরণে সাইমন কমিশন বর্জনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মিঃ জিন্নাহর উদ্যোগে লর্ড বার্কেনহেডের মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে ভারতের সংবিধানের রূপরেখা প্রনয়নের জন্যে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতের জন্যে একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়। এ সাব কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। এ ছাড়া এর সদস্য ছিলেন স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, স্যার আলী ইমাম, সুভাষ চন্দ্র বসু, মাধাও রাও এ্যাণ্টা, এম, আর, জয়াকার এন, এম, যোশী, সরদার মংগল সিং।

জয়াকার এবং যোশী কমিটির কোন বৈঠকে যোগ দেননি। এক মাত্র মুসলিম সদস্য স্যার আলী ইমাম অসুস্থতার কারনে একটির বেশী বৈঠকে যোগদানে অসমর্থ হন। এ কমিটি যে রির্পোট পেশ করে তা নেহেরু রিপোর্ট নামে খ্যাত (১৭০)।

এ রিপোর্টে বলা হয় যে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যার হার ২৫%। তাই মুসলমানদের পক্ষে হিন্দু আধিপত্যের ভীতি অমূলক। রিপোর্টে স্বতন্ত্র

(১৭০) Dr Padma Shah—Indian National Congress and the Muslims Since 1928

www.pathagar.com

নির্বাচনের প্রথা বিলুপ্তির জন্যে মত প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে শক্তিশালী এক-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। বংগদেশ এবং পাঞ্জাবে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিল নগন্য। সংখ্যার ক্ষেত্রে মুসলমান এবং হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে বড় রকমের কোন পার্থক্য ছিলনা। এ ছাড়া বংগদেশ, পাঞ্জাব সিন্ধু প্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানেরা শিক্ষা দীক্ষায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় ছিল অত্যন্ত অনগ্রসর। তাই স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা বজায় না থাকলে এ সমস্ত প্রদেশ থেকেও সংখ্যানুপাতে মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচনের সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। সুতরাং মুসলমানদের ধারণা জন্মে যে পাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে শক্তিশালী এককেন্দ্রিক সরকার গঠনের মাধ্যমে তাদের উপর বর্ণহিন্দুদের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে মহামান্য আগা খাঁ একটি সাপ্লিমেন্টারী রিপোর্টে পেশ করেন। তাতে তিনি প্রত্যেক প্রদেশের স্বাধীনতার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে প্রস্তাবিত শাসন ব্যবস্থায় প্রদেশগুলির অবস্থা আমেরিকান ষ্টেট বা সুইস ক্যান্টনের মত না হয়ে জার্মান কন-ফেডারেশনের আওতায় ব্যাভিরিয়ার মত হওয়া উচিত।

নেহেরু রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসে লক্ষ্ণৌতে সর্বদলীয় সম্মেলনের এক অধিবেশন বসে। এ সম্মেলনে মাওলানা শওকত আলী মন্তব্য করেন যে, "যৌবনে তিনি শখ করে একটি গ্রে হাউণ্ড কুকুর পুষতেন। কিন্তু তিনি কখনও কুকুরটিকে খরগোশ তাড়া করতে দেখেননি। কিন্তু এ রিপোর্টে তাঁর মতে একটি গ্রে হাউণ্ড একটি খরগোশকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে (১৭১)।" রিপোর্টের সংশোধনী হিসাবে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর চৌদ্দ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। এর সার মর্ম হলো-(১) কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের জন্যে ৩৩⅓% আসন সংরক্ষিত থাকবে। (২) 'রেসেডুয়ারী পাওয়ার' (অবশিষ্ট ক্ষমতা) কেন্দ্রের হাতে না থেকে

(১৭১) J. Coatman—Years of Desting : India 1926-1932

www.pathagar.com

প্রদেশ গুলোর হতে থাকবে। (৩) পাঞ্জাব এবং বংগদেশের মুসলমানগণ দশ বৎসরের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভায় সংখ্যানুপাতে নির্বাচিত হবে। দশ বৎসর পরে এ নীতি পরিবর্তন করা যায় কিনা তা বিবেচনা করে দেখা যাবে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ নেহেরু রিপোর্টকে সংবিধান সম্পর্কে হিন্দু প্রস্তাব বলে অভিমত প্রকাশ করে। মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ্যে নেহেরু রিপোর্টের প্রশংসা করেন এবং এ রকমের রিপোর্ট প্রনয়নের জন্য পন্ডিত মতিলাল নেহেরুকে টেলিগ্রাম যোগে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান। মিঃ গান্ধীর এ রকমের প্রতিক্রিয়া দেখে মাওলানা মুহাম্মদ আলী হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং বলেন "আপোষ রফার জন্যে মুসলমানদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে গান্ধী ব্যর্থ করে দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতার প্রতি চোখ বন্ধ রেখে তিনি সাম্প্রদায়িকতার-উচ্ছেদ চান। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাম্প্রদায়িক নীতির পৃষ্ঠপোষক। নেহেরু রিপোর্ট সংখালঘুদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের জুলুমকে আইনানুগ করার প্রচেষ্টা মাত্র। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাকে এ রিপোর্ট জাতীয়তাবাদ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অপরদিকে সংখ্যাগুরুদের জুলুম হতে সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচের দাবীকে সাম্প্রদায়িকতা বলে আখ্যায়িত করেছে (১৭২)।"

আগাখাঁনের সাপ্লিমেন্টারী রির্পোট বা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র সংশোধনী প্রস্তাব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন বর্ণ হিন্দু প্রধান কংগ্রেস গ্রাহ্য করেনি। নেহেরু রির্পোট হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষকে আরো বাড়িয়ে তোলে। লর্ড বার্কেনহেডের অনুমানই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায় ঐক্যমত হয়ে ভারতের জন্যে সর্ব সম্মতিক্রমে একটি সংবিধানের রূপ রেখা পেশ করতে ব্যর্থ হয়।

মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলিম লীগের গোঁড়া মুসলিম সদস্যদের সাথে দ্বিমত পোষন করে সাইমন কমিশন বর্জন করেন এবং কংগ্রেসের সাথে ঐক্যমত পোষন করে সর্ব দলীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন এবং সে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মতিলাল নেহেরু রির্পোট

(১৭২) Dr. Padma Shah—The Indian National Congress the Muslims Since 1928.

www.pathagar.com

পেশ করেন। সে সময় যদি মিঃ জিন্নাহ্‌র ন্যায় সংগত ১৪ দফার আকারে সংশোধনী প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করা হতো তবে এ উপ-মহাদেশের মানচিত্রের হয়তো পরিবর্তন হতো না। মানচিত্র পরিবর্তনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ দিতে হতো না বা কয়েক কোটি লোক তাদের বাস্তু ভিটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হতো না। উগ্র আর্যত্বের দাবীদার কংগ্রেস সর্ব ভারতব্যাপী তাদের প্রভুত্ব কায়েমের স্বপ্নে বিভোর ছিল। কিন্তু তাদের স্বপ্ন সফল হয়নি। কংগ্রেসের অবিসম্বাদিত নেতা মিঃ গান্ধী পরবর্তীকালে তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট গান্ধী কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় বংগীয় প্রদেশিক মুসলিম লীগের প্রাক্তন সেক্রেটারী আবুল হাশিম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন "আমাদের কথা বার্তার শেষ পর্যায়ে আমি গান্ধীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম পাকিস্তানের বদলে আজ জিন্নাহ যদি তার ১৪ দফা প্রস্তাব দেন তাহলে তাঁর মনোভাব কি হবে।" তিনি বলেছিলেন "হাশিম, আমি খুব সাগ্রহে তা গ্রহণ করবো।" শ্রদ্ধার সাথে এবং বিনয়ের সুরে আমি মন্তব্য করলাম 'মহাত্মাজী আপনাকে তা হলে স্বীকার করতে হবে যে আপনি যখন জিন্নার ১৪ দফা অগ্রাহ্য করেছিলেন সে সময় ১৫ই আগষ্ট আপনার দৃষ্টি গোচর হয়নি (১৭৩)।"

গোলটেবিল বৈঠক

স্যার মোহাম্মদ শফীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একাংশ সাইমন কমিশনের সাথে সহযোগিতা করা সত্বেও মিঃ জিন্নাহ্‌ পরিচালিত মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের অসহযোগিতার ফলে সাইমন কমিশন ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে বৃটিশ সরকার আশ্বাস দেয় যে তারা ভারতের বিভিন্ন দলীয় নেতৃবৃন্দের, দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং বৃটিশ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি গোল টেবিলবৈঠক আহ্বান করবে। বড় লাট লর্ড আরউইন ১৯২৯ সালে আশ্বাস দেন যে বৃটিশ সরকারের বিবেচ্য বিষয় হলো ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন (Dominion Status) প্রদান। কংগ্রেস জেদ ধরে যে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকের কাজ হবে ঔপনিবেশক স্বায়ত্ব শাসনের লক্ষ্যে খসড়া শাসনতন্ত্র প্রনয়ন করা। বড় লাট লর্ড আরউইন এরকমের

(১৭৩) বদরুদ্দীন ওমর—সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঈদসংখ্যা—১৯৮৭

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকৃতি জানান, কারণ গোলটেবিল বৈঠকের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন দলের মধ্যে মত পার্থক্য দূর করা এবং তারা যদি কার্যকরী কোন সমঝোতায় পৌঁছতে পারে তবে তাকে ভিত্তি করে সংবিধানের খসড়া তৈয়ার করা। উক্তপ্রকারে প্রণীত খসড়া পার্লামেন্টে অনুমোদনের জন্যে পেশ করতে হবে। ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক যোগদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করে। তারা জনগণকে আইন অমান্য আন্দোলন এবং যাবতীয় সরকারী কর পরিশোধ না করার আহবান জানায়। কংগ্রেস ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। ১৯৩০ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত সর্ব ভারতীয় মুসলিম কনফারেন্সের অধিবেশনে মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুসলমান-দেরকে কংগ্রেস হতে দূরে থাকার আহবান জানান এবং বলেন "গান্ধী উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভার পক্ষে কাজ করছেন। তাঁর যাবতীয় কার্যক্রমের লক্ষ্য হল হিন্দু প্রভুত্ব স্থাপন এবং মুসলমানদের পদানত রাখা।" ১৯৩০ সালের ১২ই ডিসেম্বর প্রথম গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার জননেতা জনাব এ, কে, ফজলুল হক গোলটেবিল বৈঠকে বলেন "মুসলমানদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিস্কার। যে মুহূর্তে তারা বুঝাতে পারবে যে ভবিষ্যতে প্রণীত শাসন তন্ত্রে সংখ্যালঘু মুসলমান, ভারতীয় খৃষ্টান, শিখ, পার্শী এবং অচ্ছ্যুৎদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সহ বিভিন্ন স্বার্থের নিরাপত্তা রয়েছে সে মুহূর্তেই আমরা কংগ্রেসের চাইতে আরো অনেক দেশী দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানাবো (১৭৪)।" প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি বৃন্দ ঐকমতে পৌঁছতে ব্যর্থ হন।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বর্জন করে কংগ্রেস অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। ১৯৩১ সালে মিঃ গান্ধী বড় লাট আরউইনের সাথে এক চুক্তি করেন। ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুযায়ী গান্ধী তাঁর আইন অমান্য আন্দোলন এবং কর দেয়ার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

(১৭৪) Dr. Padma Shah—The Indian National Congres and the Muslims Since 1928

www.pathagar.com

করেন। বিলেতী জিনিষ বর্জনের নীতিও ত্যাগ করেন। গান্ধী এবং আরউইনসের বৈঠকে আরউইন কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেন। ডঃ পদ্ম শাহ বলেন "Lord Iruin recorded the Congress as the Hindu body (১৭৫)।" গান্ধী আরউইন বৈঠকে গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষে কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবী পরিত্যাগ করেন এবং একাই কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বৃটিশ সরকার দলীয় প্রতিনিধি ছাড়াও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মিঃ গান্ধী বৃটিশ সরকারের নিকট ডঃ আনসারীকে আমন্ত্রন জানানোর জন্যে অনুরোধ জানান; কিন্তু বৃটিশ সরকার সে অনুরোধ প্রত্যাখান করে।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে মিঃ গান্ধী সমগ্র ভারতের এক মাত্র নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর এ দাবীর পক্ষে প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায় অচ্ছুৎনেতা ডঃ আম্বেদকর। মিঃ গান্ধী অচ্ছুৎ-দেরকে হিন্দু বলে দাবী করেন। কিন্তু ডঃ আম্বেদকর নিজ সম্প্রদায়কে বর্ণ হিন্দুদের নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী তোলেন। তাই মিঃ গান্ধী ও আম্বেদকরের মধ্যে একটি চুক্তি হয় যা নাকি 'মাইনরিরটি প্যাক্ট' নামে খ্যাত। চক্রবর্তী রাজ গোপালাচারী বলেন এ প্যাক্ট হিন্দু বা শিখ কারো নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নি। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীর ভূমিকা সম্পর্কে ডঃ পদ্ম শাহ বলেন 'তিনি (গান্ধী) বিশ্বময় নিন্দা কুঁড়িয়ে বেড়ান। তিনি নিজের আরোপিত শর্তে শান্তি এবং সমঝোতা চেয়েছিলেন। তিনি অন্যান্য প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন এবং সমগ্র ভারতের পক্ষে কথা বলার একচ্ছত্র অধিকার দাবী করেন। তিনি তাঁর পুরানো কথা বৃটিশ রাজত্বকে সন্ত্রাস, দাসত্ব এবং জুলুমের রাজত্ব বলে আখ্যায়িত করেন এবং এ সমস্ত

(১৭৫) Dr. Padma Shah—The India National Congres and the Muslims since 1928

www.pathagar.com

হতে অব্যাহতি লাভের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী আওড়াতে থাকেন। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এক পর্যায়ে তাঁর উপর এমন বিরক্ত হন যে তাঁকে বলেন "ভন্ডামি ত্যাগ করে বাস্তবতার মোকাবেলা করুন।" এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে মিঃ গান্ধী প্রকৃত সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে যেতে চান। অধিকন্তু অনেক সমালোচক প্রচার করতে থাকেন যে গান্ধী হিন্দু মহাসভার হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন এবং গান্ধীর উপর পন্ডিত মদন মোহন মালব্যের অপ্রতিহত প্রভাব রয়েছে (১৭৬)।" মিঃ গান্ধীর হটকারীতার জন্য দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। তাই প্রধান মন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনালড মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ঘোষনা করেন। এতে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিধান পরিষদ গুলোতে আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ঃ

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় বটে কিন্তু এ বৈঠকের আলোকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন প্রণীত হয়। এ আইনে মোটা-মুটিভাবে মুসলিম দাবী দাওয়া সন্নিহিত হয়। কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়। অত্যন্ত সীমিত আকারে হলেও প্রদেশ গুলোতে স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বৃটিশ পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে শাসন ব্যবস্থাও চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। এর ফলে আইন পরিষদে অধিকাংশ সদস্যের নেতাকে মন্ত্রী সভা গঠনের জন্য আমন্ত্রন জানানো গভর্ণরের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ যথাসম্ভব রক্ষা করে চলার ব্যবস্থাও সন্নিবেশিত হয়। প্রস্তাবিত ফেডারেশনে রেসিডুয়ারী বা বিশেষ সংরক্ষিত ক্ষমতা প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর না দিয়ে ভাইসরয়ের হাতে অর্পিত হয়। বোম্বাই থেকে সিন্ধু এবং বিহার থেকে উড়িষ্যাকে পৃথক করে নূতন

(১৭৬) Dr. Padma Shah—The Indian National Congres and the Muslims Since 1928.

www.pathagar.com

দু'টি প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। ব্রহ্মদেশকে ভারত হতে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং এডেনও ভারত সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। সমগ্র উপমহাদেশ এগার জন গভর্ণর শাসিত প্রদেশে এবং ছয় জন চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে বিভক্ত হয়। স্বয়ত্ব শাসিত প্রদেশে দ্বৈত শাসন তুলে দেয়া হয়, কিন্তু কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়। পররাষ্ট্র এবং দেশরক্ষা মন্ত্রনালয় গভর্ণর জেনারেলের হাতে থাকে। কেন্দ্রের আওতাধীন অন্যান্য দফতরের দায়িত্ব দেশীয় মন্ত্রীদের দেয়া হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতে আলোড়নের সৃষ্টি করে। ভারতীয় কংগ্রেস ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে প্রত্যাখ্যান করে। নেহেরু একে দাসত্বের সনদ হিসাবে আখ্যায়িত করে। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি ঘোষনা করেন যে এ আইনের বলে ভারতের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে কিন্তু ক্ষমতা অর্পিত হয়নি। তাই এটা সর্বোতোভাবে বর্জনীয়। কিন্তু ক্ষমতালোভী কংগ্রেস সদস্যগণ ১৯৩৫ সালের বিধান অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ গ্রহনে আগ্রহী ছিলেন। তাই কংগ্রেসের ফয়জপুর অধিবেশনে প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশ গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহন করা হয়। তবে কংগ্রেস ঘোষনা করে যে পদের লোভে নয়, বরং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে বানচাল করার জন্যে তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহনে আগ্রহী।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান না করে এর প্রদেশ সম্পর্কিত অংশ পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহন করেন।

যাহোক ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে মিঃ জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের প্রতি আপোষমূলক মনোভাব গ্রহন করে। মিঃ জিন্নাহ তাঁর এক ভাষনে বলেন "কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে আদর্শগত কোন বিরোধ নেই। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা উভয়েরই কাম্য। কোন আত্মমর্যদা জ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসীর

www.pathagar.com

নিকটই বিদেশী শাসন পছন্দনীয় হতে পারে না। ত'দের মধ্যে এমন কেউ নেই যে নাকি তার দেশের জন্যে পূর্ণ স্বাধীনতা চায়না (১৭৭)।"

কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সমমর্যদার ভিত্তিতে কংগ্রেস মুসলিম লীগের সহযোগীতাই ছিল তাঁর কাম্য। বঙ্গদেশে মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারনা চালাবার সময়ে তিনি এক ভাষনে বলেন "আমি আমার হিন্দু বন্ধুদের এ কথা বলে সতর্ক করে দিতে চাই যে মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা বারংবার পরিস্কারভাবে ঘোষনা করেছি যে, যে সমস্ত স্বাধীন চেতা এবং প্রগতিবাদী দলের কর্মসূচী আমাদের কমসূচীর অনুরূপ তাদের সাথে সহযোগীতা করতে আমরা আগ্রহী। আমরা কোন দল বা প্রতিষ্ঠানের লেজুড় হতে চাইনা। পন্ডিত জহরলাল নেহেরু নাকি কলকাতায় বলেছেন যে ভারতে মাত্র দু'টি দলের অস্তিত্ব রয়েছে—একটি সরকার এবং অপরটি কংগ্রেস। অন্যদেরকে এ দু'টির একটির অনুসারী হতে হবে। আমি কংগ্রেসের অনুসারী হতে চাই না। এখানে তৃতীয় এক দলের অস্তিত রয়েছে—তারা মুসলমান। আমরা অন্যের ইচ্ছা মাফিক কাজ করতে নারাজ।' (১৭৮) যা হোক ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির অসম্মতির দরুন কেন্দ্রীয় অংশ কার্যকারী হয়নি। কংগ্রেস হিন্দু প্রধান ছ'টি প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন লাভ করে মন্ত্রী সভা গঠন করে। মুসলিম প্রধান বংগ দেশ, পাঞ্জাব এবং আসামে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সংখ্যালঘুদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। প্রাদেশিক গভর্ণর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে মন্ত্রী সভা গঠনের জন্যে আহ্বান জানাতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু এতে যেন অন্যান্য গুরুত্ব সম্পন্ন সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধিত্ব থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখাও তাঁর

---

(১৭৭) Khalid Bin Sayid—Pakistau in the farmative stage

(১৭৮) Dr. Padma Shah—the Indian National Congress. and the Mnslims Since 1928

www.pathagar.com

কর্তব্য ছিল। যুক্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস ঐক্য বদ্ধ হয়ে একই মঞ্চ থেকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং নির্বাচনের পর মুসলিম লীগের মন্ত্রী সভায় দু'টি আসন পাবার কথা। কিন্তু নির্বাচনের পরে কংগ্রেস মুসলিম লীগের বিলুপ্তি না ঘটালে এবং মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড ভেংগে না দিলে মুসলিম লীগের নির্বাচিত সদস্যদের মন্ত্রীত্বের পদ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। যে সমস্ত প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস সরকার গঠন করে ছিল সে সমস্ত প্রদেশে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলো সমান্তরাল সরকার (Parallel government) হিসাবে কাজ করতে থাকে। এমন কি কংগ্রেস সদস্যগণ নিজস্ব থানা স্থাপন করে এবং কংগ্রেস পুলিশ কর্মীগণ মামলার তদন্ত শুরু করে। স্থানীয় প্রশাসনকে তারা দখল করে নিতে চায়। ফলে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সাথে কংগ্রেস কর্মীদের কলহ বাঁধে। কংগ্রেস বিদ্যালয় গুলোর নাম দেয় বিদ্যামন্দির। মুসলিম ছাত্রদেরকে করজোড়ে "বন্দে মাতরম" গান গাইতে এবং গান্ধীর প্রতিকৃতিকে নমস্কার করতে বাধ্য করা হয়। এ সমস্ত প্রদেশের হিন্দু জনসাধারণের মনে ধারণা জন্মে যে হিন্দু রাজত্ব কায়েম হয়ে গিয়েছে। তারা মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাতে থাকে। তাদের ধর্মীয় কার্য কলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন চালানো হচ্ছিল তার বিস্তারিত একটি ফিরিস্তি দিয়ে তৎকালীন বংগদেশের প্রধান মন্ত্রী জনাব এ, কে, ফজলুল হক কংগ্রেস নেতা পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর নিকট এক সুদীঘ পত্র লিখেন এবং এ সমস্ত জোর জুলুমের অবসান ঘটানোর জন্যে অনুরোধ জানান। ফজলুল হক পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর নিকট যে সমস্ত অভিযোগ তোলেন তা হলো (১) হিন্দু মহাসভার নেতা এবং পান্ডারা ইচ্ছামত মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করছে কিন্তু মুসলিম নেতাদের উপর দন্ড বিধি আইনের ধারা মোতাবেক বিধি নিষেধ আরোপিত হয়েছে। হিন্দু পত্র পত্রিকায় বিশেষ করে মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকায় উস্কানি মূলক মুসলিম বিরোধী নিবন্ধ প্রকাশিত হতে কোন বাধা দেয়া হচ্ছে না কিন্তু নমনীয় ভাষায় প্রকাশিত সমালোচনা মূলক প্রবন্ধের জন্যে মুসলমানদের পত্রিকাবন্ধ করে দেয়া হয়েছে; (২) আকোলা, নাগপুর, ঘামগাও, মালকাপুর এবং খান্ডুয়াতে

www.pathagar.com

আর্য সমাজের পাণ্ডারা মুসলমানদের আপত্তি সত্ত্বেও প্রচণ্ড মুসলিম বিরোধী বক্তব্য রাখছে অথচ কর্তৃপক্ষ তাদের সম্মন্ধে নীরব। আর্য সমাজের মাত্র একজন কর্মীকে ভারতীয় দণ্ড বিধি আইনের ১৫৩ ধারা মোতাবেক গ্রেপ্তার করা হয়; কিন্তু সরকার অনতিবিলম্বে তার বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেয়। লোকটি অনশন ধর্মঘট করে। ফলে হিন্দুদের হরতাল এবং শোভা যাত্রার নিকট সরকার নতি স্বীকার করে। এর চাইতে লঘু অপরাধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম নেতাদেরকে দণ্ড দেয়া হয়েছে। (৩) প্রচলিত রীতি ভংগ করে হিন্দুদেরকে মসজিদের সামনে দিয়ে মিছিল করে যেতে দেয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মসজিদকে অপবিত্র এবং এর সম্পত্তি বিনষ্ট করা হয়েছে। (৪) অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু রমনীগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করে মুসলমান স্বামী গ্রহণ করে। কিন্তু হিন্দু মহাসভার সশস্ত্র পাণ্ডারা আইনের প্রতি তোয়াক্কা না করে তাদেরকে স্বামীর নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। নাগপুর এ বিষয়ে বিশেষ কুখ্যাতি অর্জন করেছে। (৫) খামগাঁওতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী জনৈক হিন্দু রমনীকে আশ্রয় দেওয়ার অযুহাতে আশ্রয়দানকারীর বাড়ীর লোক-দেরকে একদল সশস্ত্র হিন্দু বেদম মারধোর করে। কিন্তু তাদের অভিযোগ ছিল একেবারে মিথ্যা। রাখেদা তালুকে একজন নামজাদা হিন্দু নেতার নেতৃত্বে হিন্দুরা একই কাজ করে, বাড়ীর লোকজনকে প্রহার করে এবং তাদের বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করে। এ সমস্ত দুস্কৃতি-কারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। (৬) বেরারের বুলদানা জেলায় মিষ্টি পানির উৎস মাত্র একটি রয়েছে। তাও মুসলিম বাদশাহদের অবদান। কিন্তু সেখান হতে মুসলমানদেরকে পানি নিতে দেয়া হচ্ছে না। (৭) ১৯৩৫ সালে মুসলমানদের হত্যার অভিযোগে যাদেরকে দীর্ঘ মেয়াদী সাজা দেয়া হয়েছে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। (৮) ১৯৩৮ সালে জব্বলপুরে হিন্দু-মুসলমানে দাংগা বাধার ফলে চার জন মুসলমান নিহত হয়। কিন্তু আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেয়া হয়, যদিও হিন্দুদের অপরাধ ছিল গুরুতর। (৯) নিরপেক্ষ তদন্তে প্রকাশ পাবে যে অধিকাংশ দাংগাই

www.pathagar.com

হোলি উৎসব পালনের সময় সংগঠিত হয়েছে এবং মুসলমানেরাই এর ভুক্তভোগী ; তবুও যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় তাদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী। (১০) কাটনাতে একজন নির্দোষ মুসলিম বালককে হত্যার অভিযোগে কতিপয় প্রভাবশালী হিন্দু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর প্রতিবাদে শোভা যাত্রা এবং মিছিল করা হয় এবং পরে অপরাধীদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। (১১) কাতাংগীতে পত্র পত্রিকায়, বক্তৃতা-বিবৃতিতে মুসলমানের দোকান হতে কোন জিনিষ না কিনতে, মুসলমানদের পাওনা পরিশোধ না করতে উৎসাহিত করা হয়। মুসলমানদের দোকানের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ফলে একজন মুসলিম যুবক প্রাণ হারায়। গ্রাম থেকে মুসলিম ফকিরদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং ঈদগাহ্‌কে অপবিত্র করা হয়েছে। (১২) স্থানীয় সংস্থার কর্মচারীগন মুসলিম শ্রমিক নিয়োগ করাতে মুসলিম ঠিকাদারদেরকে তিরস্কার করে। (১৩) হিন্দুদের মিছিলের শ্লোগান হলো "হিন্দুস্তান হিন্দুকা হ্যায় না কিসিকে বাপকা," "নিজাম মুর্দাবাদ," "মুসলমান বেশরম," "ইসলাম মুর্দাবাদ" প্রভৃতি। পুলিশ এ সমস্ত অবৈধ কার্যকলাপে কোন বাধা দেয়নি। (১৪) মিঃ শরীফকে মন্ত্রী সভা হতে তাড়িয়ে দেয়া হয়, কারণ তিনি লঘু অপরাধে সাজা প্রাপ্ত জনৈক মুসলমানের সাজা কমিয়ে দিয়েছিলেন ; কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রী সভা জনৈক হিন্দুর মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে বলির উপাদান ছিল একজন মুসলিম মহিলা এবং অপরাধী ছিল একজন হিন্দু ইত্যাদি। মাওলানা আবুল কালাম আজাদের রচিত India Wins Freedom এর ভাষ্যকার জাফর আহমদ রইসী বলেন "ইউসুফ শরীফের ঘটনাটি কংগ্রেসের ইতিহাসে অন্যায় অবিচারের একটি চরম বেদনাদায়ক ঘটনা।'

"চৌদ্দ বছরের একটি বালিকাকে ধর্ষনে সহযোগীতার অপরাধে গংগু, ওয়াটু এবং আবদুর রজ্জাকের দুই বৎসর করে সাজা হয়। বিচার মন্ত্রী শরীফ তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে তাদের সাজা এক বৎসর কমিয়ে দেন। পরবর্তীকালে একই মামলায় সাজা প্রাপ্ত জাফর হোসনের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে তাদের

www.pathagar.com

সাজাও এক বৎসর কমিয়ে দেন। গংশুও ওয়াট্রু হিন্দু বিধায় তাদের শাস্তি লাঘব করার বেলায় কোনও প্রকারের কথা উঠেনি। কিন্তু জাফর হোসেনের শাস্তি কমিয়ে দেয়াতে হিন্দু মহাসভা হৈ চৈ শুরু করে। তার বিরুদ্ধে হাই কোর্টের জজ দ্বারা তদন্ত করান হয়। হিন্দু মহাসভাপন্থী তদন্ত কারী জজ স্যার মন্মথ নাথ মুখার্জী কর্তৃক তিনি নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়া সত্বেও তাকে কংগ্রেস হতে বিতাড়িত করা হয় এবং মন্ত্রী সভা থেকে বাদ দেয়া হয়।

জাফর আহমদ রইসী তার ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন কংগ্রেস নেতা মিঃ দ্বারকা প্রসাদ মিশ্র তার ড্রাইভার নানা নাইডুর সহায়তায় জব্বল পুরের এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম বালিকাকে অপহরণ করে। নাইডু এবং মিশ্র উভয়ই বালিকাটিকে ধর্ষন করে। কয়েক মাস যাবত মিশ্র তাকে লুকিয়ে রাখে এবং পরে তাকে বোম্বাই হতে উদ্ধার করা হয়। সেখানে সে মিশ্রের কবলেই আটকা ছিল। মিশ্রের নামে মামলা রুজু হয়। কিন্তু এর পর মিশ্র মন্ত্রী হয়ে মামলাটি চাপা দেয়। কংগ্রেসের কার্যক্রম মুসলমানদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। হডসন বলেন "মুসলমানদের ধারনা জন্মে যে কংগ্রেস তাদের উপর এক দেশ, এক দল এবং এক নেতা চাপিয়ে দিতে চাচেছ।"

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ তারিখে গ্রেট বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে। ভারতের বড় লাট ঘোষনা দেন যে ভারতও জার্মানীর সাথে যুদ্ধে রত। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ১৫ই সেপ্টেম্বর এ মর্মে এক প্রস্তাব পাশ করে যে ভারতের যুদ্ধ ঘোষনা বা শান্তি স্থাপনার সিদ্ধান্ত এক মাত্র ভারতবাসীরাই নিতে পারে। ভারত নিজে যতক্ষন পর্যন্ত স্বাধীন না হয় ততক্ষন পর্যন্ত সে অন্যের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করতে পারেনা। অর্থাৎ ভারতকে স্বাধীনতা না দেয়া পর্যন্ত ভারত জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে পারেনা। বড়লাট লিনলিথগোর সাথে মত বিরোধের কারন অক্টোবর মাসের শেষের দিকে সকল প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রী সভা পদত্যাগ করে। এমতাবস্থায় বৃটিশ সরকার যুদ্ধকালীন সহযোগীতা কামনা করলে মুসলিম লীগ এ শর্তে তাতে রাজী হয় যে তাদের অগোচরে কিংবা অমতে শাসনতান্ত্রিক কোন পরিবর্তন সাধন করা যাবেনা। কংগ্রেস মন্ত্রী সভা পদত্যাগ করলে পর মুসলিম লীগ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯

www.pathagar.com

তারিখে সারা ভারত ব্যাপী 'নাজাত দিবস' পালন করে। এ দিনে তারা ঘোষনা করে "আইন সভায় এবং প্রশাসনে দায়িত্ব পালন কালে কংগ্রেস মন্ত্রী সভা মুসলিম সংস্কৃতি এবং তাদের ধ্যান ধারনা ধ্বংস করার জন্যে প্রচেষ্টা চালায়, মুসলমানদের ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবনকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারকে পদদলিত করে। হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ বাধলে কংগ্রেস সরকার অবশ্যম্ভাবী ভাবে হিন্দুর পক্ষাবলম্বন আর মুসলমানদেরকে বিরোধীতা করে এবং মুসলিম স্বার্থ বিরোধী কাজ করে।

কংগ্রেসের জুলুম, নির্যাতন—পীড়ন এবং অবিচার হতে মুক্তির দিন হিসাবে মুসলমানরা 'নাজাত দিবস' পালন করে। এতে নেহেরু উষ্মা প্রকাশ করে ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মিঃ জিন্নাহ্‌কে লিখেন "মনে হয় আমাদের উদ্দেশ্য বিপরীত মুখী এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা বিভক্ত। আমাদের মধ্যে সমঝোতার জন্য আলোচনা অসম্ভব এবং বৃথা।"

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ উল্লখেযোগ্য সফলতা লাভ করেনি। কিন্তু ছয়টি এবং পরবর্তী সময়ে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের শাসনামলে মুসলমানেরা এত ক্ষুব্ধ হয়ে ছিল যে মিঃ জিন্নাহ্ যখন তাদের মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য আহবান জানান তখন তারা তাতে বিপুল ভাবে সাড়া দেয়। তারা যেন এর জন্যে তৈয়ার হয়ে রয়েছিল।

১৯৩৭ সালে অক্টোবর মাসে লক্ষ্ণৌতে যে মুসলিম লীগের অধিবেশন হয় তাতেই প্রমানিত হয় যে ভারতের মুসলমানেরা মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যে কি রকম উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। অধিবেশনে পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সিকান্দার হায়াত খাঁ, বংগ দেশের প্রধান মন্ত্রী এ, কে, ফজলুল হক এবং আসামের প্রধান মন্ত্রী স্যার মুহাম্মদ সাদুল্লা দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যে উদাত্ত আহবান জানান।

www.pathagar.com

দ্বিজাতী তত্ত্ব ও লাহোর প্রস্তাব ঃ

বৃটিশ ভারতের গোড়ার দিকে যারা মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই প্রথম হিন্দু -মুসলমান যুক্ত ভারতীয় জাতীয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মুসলিম মিল্লাতের প্রথম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ বলেছিলেন যে হিন্দু কোন ধর্ম বা জাতির নাম নয়। যারা হিন্দুস্তানে বসবাস করে তারাই হিন্দু। তিনি নিজেও হিন্দুস্তানে বসবাসকারীদের একজন অতএব তিনি ও একজন হিন্দু। তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে একটি সুন্দরী কনের দু'টি চোখের সাথে তুলনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেলে যেমন অপর চোখের উপর তার প্রভাব পড়ে তেমনি এক সম্প্রদায়ের ক্ষতিও অন্য সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করবে। অতঃপর বেনারসে উর্দু-হিন্দিকে কেন্দ্র করে যে দাংগার সূত্রপাত হয় তার ভিত্তিতে তিনি মন্তব্য করেন যে এদেশে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অসম্ভব এবং মুসলমানদের তিনি হিন্দু প্রধান কংগ্রেসে যোগদান হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেন। তিনি বলেছিলেন মুসলমানেরা যদি হিন্দুদের দাসত্ব কবুল করতে রাজী থাকে তবে যেন তারা কংগ্রেসে যোগ দেয়।

মাওলানা মুহাম্মদ আলীও অনুরূপ ভাবে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন এবং খিলাফত আন্দোলনে মিঃ গান্ধীর নেতৃত্ব বরন করে নিয়েছিলেন; পরবর্তী কালে কোহাটে সাম্প্রদায়িক দাংগার ফলে তার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয় এবং তিনি ঘোষনা করেন যে ভারতের স্বাধীনতা গান্ধীর কাম্য নয়। তাঁর বাসনা হচ্ছে মুসলমানদেরকে হিন্দুদের পদানত করা এবং মিঃ গান্ধী উৎকৃট সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভার একজন পৃষ্ঠপোষক। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও প্রথমে হিন্দু-মুসলমান যুক্তভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন। ১৯০৬ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। পরে ১৯১৩ সালে যখন তিনি মুসলিম লীগে যোগদেন তখন তিনি এ শপথ নেন যে তাঁর মুসলিম লীগে যোগদান কোন ক্রমেই কংগ্রেসের কর্মসূচীতে তাঁর ভূমিকা বাধাগ্রস্ত করবেনা। তিনি

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়াস চালান এবং জন সাধারনের নিকট হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত হিসাবে আখ্যায়িত হন। ১৯৩৭ সালে ও তিনি বলেছিলেন যে মুসলিম লীগের নেতা হলেও তাঁর পুরানো মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি (১৮০)। কিন্তু ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পর বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেস সরকারের আচরণে তাঁর মোহ ভংগ হয়, যা নাকি 'নাজাত দিবস উপলক্ষে গৃহীত প্রস্তাবাবলীতে প্রতিফলিত হয়েছে।

বৃটিশ ভারতে যিনি প্রথম হতেই এ উপলব্ধি নিয়ে কর্মসূচী গ্রহন করেন যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মনোভাব সৃষ্টি করা অসম্ভব এবং তা ইসলাম বিরোধী ধারনা, তিনি হলেন মাওলানা সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদুদীর পুত্র মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী। ১৯০৩ সালে হায়দ্রাবাদের আওরাংগাবাদ শহরে তিনি জন্ম গ্রহন করেন। সাইয়েদ হাসান মওদুদীর পেশা ছিল ওকালতী। পিতার অকাল মৃত্যুতে সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি ছিলেন অসাধারন মেধাবী এবং শক্তি সম্পন্ন। তিনি নিজ প্রচেষ্টায় আরবী সাহিত্য, হাদিস, তফসীর, দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ণ করে গভীর পান্ডিত্য লাভ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে "আলজমিয়ত পত্রিকা" সম্পাদনার ভার গ্রহন করেন। কিন্তু জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ দৃঢ়ভাবে হিন্দু-মুসলিম মিলনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিশ্বাস করত এবং তারা হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের লেজুড় বৃত্তির ভূমিকা গ্রহন করায় মাওলানা মওদুদী 'আল জমিয়তের' সাথে সংস্রব ত্যাগ করেন। আল্লামা ইকবালের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঞ্জাবের পাঠান কোট থেকে চার মাইল দূরে দারুল ইসলাম নামে একটি গবেষনা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। আল্লামা ইকবালের আহবানে সাড়া দিয়ে তিনি দারুল ইসলামে চলে আসেন এবং একে তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে গ্রহন করেন। তিনি তাঁর গভীর

(১৮০) Dr. Padma Shah—The Indian National Congress and Muslims Since 1928

www.pathagar.com

অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এবং কুরআন হাদীসের আলোকে বুঝতে পারেন যে হিন্দু-মুসলমান মিলে এক জাতিতে পরিণত হতে পারেনা। তারা দু'টি স্বতন্ত্র জাতি। জনাব আব্বাস আলী খান বলেন "..... দারুল ইসলামের গবেষণা কেন্দ্রেই সৃষ্টি লাভ করেছে পাকিস্তান সৃষ্টির মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ (Basic Chemicals) দ্বিজাতী তত্ত্বের মতবাদ (১৮১)।" তিনি আরো বলেন "দারুল ইসলাম ছিল একটি অর্ডণ্যান্সস ফ্যাক্টরী সেখান থেকে তৈয়ার হয়েছিল দুটি মজবুত ও শক্তি শালী যুদ্ধের আগ্নেয়াস্ত্র যা দিয়ে পাক ভারতের দশ কোটি মুসলমান কংগ্রেস ও তার সকল ষড়যন্ত্র জাল করেছিল ছিন্ন ভিন্ন। সে দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র হস্তে "মাসায়ালায়ে কওমিয়ত" এবং "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ (১৮২)।"

১৯৩৯ সাল থেকে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিন্দু-প্রধান কংগ্রেস ভারতে বস বাসকারী হিন্দু, মুসলমান বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি এক জাতি এ ধূয়া তুলে সমগ্র বৃটিশ ভারতে বর্ণ হিন্দুদের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য আপ্রান চেষ্টা চালাতে থাকে। মুসলমানরা দাবী করে যে হিন্দু এবং মুসলমান এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। জাতিগত ভাবে তারা ভিন্ন। মুসলমানদের এ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মিঃ গান্ধী যে মত প্রকাশ করলেন তা হলো "পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনও দৃষ্টান্ত আমি দেখিনা যেখানে মুষ্টিমেয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তি তাদের পিতৃগোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয় একটি পৃথক জাতি-ত্বের দাবী তুলতে পারে (১৮৩)।" এর প্রত্যুত্তর মিঃ জিন্নাহ্ একটি প্রবন্ধ লিখেন যা নাকি তাঁর জীবনের একমাত্র প্রবন্ধ। তিনি এতে বলেন জাতীয়তাবাদ নির্দ্ধারণে যে কোন সূত্রই প্রয়োগ করা হোকনা কেন হিন্দু এবং মুসলিম দু'টি জাতি। আমরা দশ কোটি লোকের এক জাতি আমাদের কৃষ্টি এবং সভ্যতা, ভাষা এবং সাহিত্য, শিল্প এবং স্থাপত্য নাম এবং নিশানা, মুল্যবোধ এবং এর পরিমাপ, আইন এবং নৈতিকতা, প্রথা এবং পঞ্জিকা, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য, মননশীলতা,

(১৮১) আববাস আলী খাঁ—মাওলানা মওদুদী
(১৮২) ঐ
(১৮৩) Hector Belitho— Jennah

www.pathagar.com

এবং অভিলাষ, সংক্ষেপে আমাদের জীবন বোধ এবং দৃষ্টি ভংগি স্বতন্ত্র। আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন বিধান অনুযায়ী আমরা একটি জাতি (১৮৪)।"

মুসলিম লীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হবার পর মুসলমানদের ভিতর স্বতন্ত্র আবাস-ভূমির দাবী দানা বাঁধতে শুরু করে। ইতিপূর্বে আল্লামা ইকবাল ১৯৩০ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষনে এর আভাষ দিয়েছিলেন। তিনি বলে ছিলেন "আমার মতে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্দু এবং বালুচিস্তানকে নিয়ে একটি রাষ্ট্র হলে ভাল হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত অথবা বৃটিশ সাম্রাজ্য হতে মুক্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি মুসলিম রাষ্ট্র অন্ততঃ পক্ষে উত্তর ভারতের মুসলমানদের জন্য কাম্য হওয়া উচিৎ। কামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত চৌধুরী রহমত আলী প্রথম পাকিস্তান শব্দটি উদ্ভাবন করেন। তিনি পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ইরান, সিন্ধু এবং বালুচিস্তান নিয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন দেখেন। পাঞ্জাবের 'P' আফগানিস্তানের 'A' কাশ্মীরের 'K' ইরানের 'I' সিন্ধুর 'S' এবং বালুচিস্তানের 'TAN' মিলিয়ে পাকিস্তান (PAKISTAN) শব্দ তৈয়ার করেন। পাকিস্তান উর্দু এবং ফারসী শব্দ। ইকবাল এবং চৌধুরী রহমত আলীর স্বতন্ত্র মুসলিম আবাসভূমির পরিকল্পনায় অবশ্য বংগদেশ এবং আসাম অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।

মুসলিম লীগ অনুভব করে যে বৃটিশ ভারতে বর্ণবাদী হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হিন্দু সমাজে এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর আধিপত্য স্বীকৃত। মুসলমানদের হয়তো যুক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা অচ্ছ্যুতে পরিণত করবে। তাই তাঁরা মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাস ভূমির দাবীতে ভারত বিভক্তির কথা চিন্তা করেন।

১৯৩৯ সালের ২৬শে মার্চ মীরাটে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রস্তাবাবলী পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্যে

(১৮৪) Khalid Bin Sayed - Pakistan in the Formative Stage

www.pathagar.com

একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। এ কমিটির সভাপতি ছিলেন মিঃ জিন্নাহ্ আর সদস্য ছিলেন স্যার সিকান্দার হায়াত খাঁ, নওয়াব মোহাম্মদ ইসমাইল খাঁ, সৈয়দ আবদুল আজিজ, স্যার আবদুল্লা হারুন, স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, আবদুল মতিন চৌধুরী, সর্দার আওরংগজেব খাঁ এবং নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খাঁ। লিয়াকত আলী খাঁ এই কমিটির আহবায়ক নিযুক্ত হন।

অতঃপর ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে বংগ দেশের প্রধান মন্ত্রী শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তা হলো" That it is the considered view of this session of the all India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principles, namely, the geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial re-adjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the North Western and Eastern regions of India should be grouped to constitute "independent states", in which the constituent units shall be autonomous and soverign. (১৮৫)

বিপুল করতালি এবং হর্ষ ধ্বনির দ্বারা প্রস্তাবটি অভিনন্দিত ও গৃহীত হয়। বদরুদ্দিন ওমর তাঁর "বংগ ভংগ ও সাম্প্রদায়িক" রাজনীতি নামক নিবন্ধে এর বাংলানুবাদ করেছেন "সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সুবিবেচিত অভিমত এই যে, এই দেশে কোন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষন পর্যন্ত নিম্নোক্ত মূল-

(১৮৫) Hector Be-itho — Jennah

www.pathagar.com

নীতির উপর সেটি পরিকল্পিত না হয় যেমন – ভৌগলিকভাবে সংলগ্ন ভূ-খণ্ডগুলিকে একেকটি অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করে সেগুলির এলাকা প্রয়োজন অনুযায়ী রদবদল করে এমনভাবে গঠন করতে হবে যে, যে সকল অঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত যেমন ভারতের উত্তর পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চল সেগুলিকে একত্রিত করে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ (ইনডিপেনডেণ্ট ষ্টেটস) পরিণত করতে হবে যেখানে গঠনকারী এককগুলি হবে স্বাধীন এবং সার্বভৌম।" (১৮৬) বদরুদ্দিন উমরের অনুবাদটি নিখুঁত নয় কারণ (অটোনোমাস এণ্ড সভ্রেন) এর অর্থ স্বাধীন এবং সার্বভৌম হয় না। অটোনোমাসের অর্থ স্বায়ত্বশাসিত। তাই এর অর্থ দাঁড়ায় স্বায়ত্বশাসিত এবং সার্বভৌম। স্বায়ত্বশাসন এবং স্বাধীন একার্থ-বোধক নয়। স্বায়ত্ব-শাসন এবং সার্বভৌমত্ব এক সংগে চলতে পারেনা। খালিদ বিন সাইয়েদ প্রশ্ন তুলেছেন "এরকম দ্ব্যর্থ বোধক প্রস্তাব কি প্রস্তাবের রচনাকারীদের অনভিজ্ঞতা নাকি এ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ প্রস্তাবের অর্থ এও হতে পারে যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাংশে দু'টি স্বাধীন এবং সার্বভৌম' ফেডারেল ষ্টেট' হবে এবং যুক্ত রাষ্ট্রদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলি স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে। সম্ভবতঃ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্টদ্বয় নিয়ে একটি 'কনফেডারেশন' গঠিত হবে যা নাকি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বিহীন হবে (১৮৭)।"

লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের কোন উল্লেখ ছিলনা। এ প্রস্তাব 'Lahore Resolution' বা লাহোর প্রস্তাব বলে আখ্যায়িত হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু প্রচার মাধ্যমগুলি একে পাকিস্তান প্রস্তাব নাম দেয়। তাই চৌধুরী রহমত আলীর উদ্ভাবিত 'পাকিস্তান' শব্দটির সাথে জনসাধারন পরিচিত হতে থাকে হিন্দু প্রচার মাধ্যম গুলোর কারনে। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠে, ১৯৪১ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তাকে পাকিস্তান আন্দোলন নামে আখ্যায়িত করেন। পাকিস্তান আন্দোলন অচিরেই অতিশয় জোরদার এবং অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

---

(১৮৬) বদিরুদ্দিন ওমর—সাপ্তাহিক বিচিত্রা—ঈদসংখ্যা, ১৯৮৭।

(১৮৭) Khalid Bin Syed—Pakistan in the Formative Stage.

www.pathagar.com

পাকিস্তান আন্দোলনের এত জনপ্রিয়তার কারন বিবিধ। এক শ্রেণীর লোক মনে করেছিল যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে পর ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে, যা নাকি শোষণ পীড়নের অবসান ঘটিয়ে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে, ধনী—দরিদ্রের বৈষম্য কমে আসবে এবং সকলে আল্লাহর খলিফা এবং দাস হিসাবে সম মর্যাদা ভোগ করবে। তারা কাউকে শোষন পীড়ন করতে চায়নি, তারা চেয়ে ছিল শোষণ পীড়নের অবসান। কাউকে বঞ্চিত করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক অভিলাষ চরিতার্থ করা এদের আকাঙ্খা ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে এরাই ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ। এরা পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করে ছিল কিন্তু আন্দোলনের নেতৃত্ব এদের হাতে ছিলনা।

অপর একদল লোক পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করে ছিল, অর্থনৈতিক দিকে দিয়ে লাভবান বা রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবশালী হবার জন্যে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা এদের কাম্য ছিলনা এবং ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারনাও সুস্পষ্ট ছিলনা। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল এ সমস্ত লোক।

এক কালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস্ মোর্শেদ মন্তব্য করেছিলেন যে সাধারন মানুষ ইসলামী বিধান কায়েমের জন্যে পাকিস্তান আন্দোলনকে জোর সমর্থন দিয়েছে। আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল যাদের হাতে তাদের ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন ধ্যান বা ধারনা ছিলনা। খালেদ বিন সায়েদ বলেন "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেও হিন্দু ডাল মিয়া, বিড়লার মত মুসলিম আদমজী, ইস্পাহানী ছিল। হিন্দু ও মুসলিম শিল্পপতিদের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতা ও সাম্প্রদায়িকতার রূপ পরিগ্রহ করে। মুসলিম পুঁজিপতি, ব্যাংক ব্যবসায়ী এবং বণিক শ্রেণী মনে করেছিল যে পাকিস্তান কায়েম হলে তারা হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা এড়াতে এবং অধিক পরিমানে মুনাফা লুটতে পারবে। মুসলিম মালিকানাধীন কারখানায় উৎপাদিত এবং মুসলিম বণিকদের নিকট থেকে জিনিষ

www.pathagar.com

পত্র খরিদের সুপারিশ করে নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগ প্রস্তাব গ্রহণ করে। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছিল তীব্রতম (১৮৮)।"

তাই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয় যে ইসলামের নামে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চায়। এ সম্পর্কে খালেদ বিন সায়েদ বলেন "জামায়াতে ইসলামীর নেতা মাওলানা মওদুদীর কংগ্রেসের প্রতি কোন সহানুভূতি ছিলনা। তবুও তিনি লিখেছিলেন মুসলিম লীগের কায়েদে আজম হতে ক্ষুদে নেতাটি পর্যন্ত এমন কেউ নেই যিনি নাকি ইসলামী মনোভাবাগন্ন এবং ইসলামী দৃষ্টি কোন থেকে কোন ও সমস্যার সমাধান বাতলাতে পারেন (১৮৯)।"

মাওলানা মওদুদী মুসলিম লীগকে সমর্থন করেন নি যে কারণে তা হলো মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ইসলামী বিধি বিধানের কায়েম ময়, হিন্দুদের ছোবল থেকে মুসলমানদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ হেফাজত করা। হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগীতার অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করতে পারলে পুণর্বার এ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসকারী মুসলমান বা বিভিন্ন মুসলিম দলের মধ্যে বিরোধ বাঁধবে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না করে নিজেরা কোন দলে জড়িয়ে পড়বে।

পাকিস্তানের স্থপতি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ নেতিবাচক কর্মসূচী হিসাবে পাকিস্তানের দাবী তুলে ছিলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা এবং তিনি "হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত" হিসাবেও আখ্যায়িত হয়ে ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমমর্যাদার ভিত্তিতে বসবাস করুক। কিন্তু হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা দেখে

(১৮৮) Khalid Bin Sayid—Pakiatan in the Formative Stage

(১৮৯)

www.pathagar.com

তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হন যে অখণ্ড ভারতে গান্ধীর রাম রাজত্ব কায়েম হলে মুসলমানেরা শুদ্রে পরিনত হবে। খালেদ বিন সায়েদ উল্লেখ করেছেন পাঠানদের এক সমাবেশে তিনি বলেন "আপনারা পাকিস্তান চান কিনা, (আল্লাহু আকবর) আচ্ছা যদি আপনারা পাকিস্তান চান তবে লীগ মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিবেন। যদি আজ আপনারা এ সুযোগ হারান তবে ভবিষ্যতে আপনারা শুদ্রে পরিনত হবেন এবং ভারত হতে ইসলাম মুছে যাবে। আমি কখনও মুসলমানদেরকে হিন্দুদের দাসে পরিণত হতে দেব না (১৯০)।"

তবে জিন্নাহ্ কোন দিন কপটতার আশ্রয় নেন নি। তাই যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একদল পাঠান "মৌলভী মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বলে ধ্বনি দিয়েছিল তখন তিনি তাদের নিকট গিয়ে বলে ছিলেন যে তিনি 'মৌলভী' নন। তিনি তাঁদের ধর্মীয় নেতা নন বরং রাজনৈতিক নেতা (১৯১)।"

কিন্তু ইসলামের প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ছিল এবং তিনি ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে যে তাঁর জ্ঞান সীমিত সে সম্পর্কও তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি গুরুতর রূপে অসুস্থ থাকা সত্বেও জেদ ধরেন যে স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তানের উদ্বোধন তিনি করবেন। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন "পাশ্চাত্যের বিধান যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার কোন সমাধান নেই এবং আমরা অনেকেই মনে করি অলৌকিক কিছু না ঘটলে পৃথিবী অনিবার্য ভাবে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। পাশ্চাত্যের অর্থ নীতি মানুষের মধ্যে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করতে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘর্ষ এড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে এ অর্থ নীতি দু দু'টি বিশ্ব যুদ্ধের জন্য দায়ী। শিল্প এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অগ্রগামিতা সত্বেও এখন তার অবস্থা পূর্বের চাইতে বহুগুনে করুন। পাশ্চাত্য

(১৯০) Khalid Bin Sayid—Pakistau in the formative Stage

(১৯১) Hector Belitho—Jinnah

www.pathagar.com

অর্থ নীতি আমাদেরকে একটি সুখী এবং তৃপ্ত সমাজ গঠন করতে সাহায্য করবেনা এবং আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবনা। আমাদের নিজস্ব পথ বের করতে হবে এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী মানুষে মানুষে সাম্য এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা করতে পারলে ইসলামের যে লক্ষ্য তাতে আমরা পৌঁছতে পারব এবং পৃথিবীতে শান্তি আসবে, যা নাকি মানবতাকে, সুখ এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে (১৯২)।"

পাকিস্তান আন্দোলন ও পাকিস্তানের প্রতিজ্ঞাঃ

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের পর মুসলিম লীগ অত্যন্ত জোরদার হয়ে উঠে এবং একই বৎসর আগষ্ট মাসে ভাইসরয় কংগ্রেসকে জানিয়ে দেন যে ক্ষমতা পেতে হলে তাদেরকে মুসলিম লীগের সাথে সমঝোতায় আসতে হবে। ১৯৪১ সালে প্রাচ্য রণক্ষেত্রে জাপানী-দের হাতে বৃটিশ সেনা বাহিনীর চরম ভাগ্য বিপর্যয় দেখা দেয়। ব্রহ্ম-দেশের পতন ঘটে। আসাম প্রচন্ড আক্রমনের সম্মুখীন হয়। বৃটিশ বাহিনী পিছু হটতে থাকে এবং অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে জাপানীরা যে কোন মুহূর্তে পূর্ব ভারত দখল করে নিতে পারে। কলকাতায় জাপানীরা ব্যাপকভাবে বোমা বর্ষন করে। এমন এক সংকটময় সময়ে "বৃটিশ সামরিক পরিষদ" স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপসকে একটি মিশন দিয়ে ভারতে পাঠান। যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতা দেয়া হবে বলে এ মিশন অংগীকার করে এবং সমস্ত মুখ্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দেয়। দেশ ফেডারেল শাসন-তান্ত্রিক ভিত্তিক ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন (ডোমেনিয়ন ষ্টেটাস) এর মর্যাদা পাবে বলে উল্লেখ করা হয়। এ মিশনের উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব ছিল যে, যে সমস্ত এলাকা ইউনিয়নের সাথে যোগদান করতে অনিচ্ছুক তারা নিজদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে পৃথক ফেডারেশন গঠন করতে পারবে। ক্রিপস মিশনের প্রস্তাবে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখা হয়ে ছিল।

---

(১৯২) Hector Belitho — Jennah

www.pathagar.com

কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ইউনিয়নের বাইরে থেকে স্বতন্ত্র ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেসকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এ ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ভারতকে বিভক্ত করে ফেলতে পারে বলে কংগ্রেস আশংকা প্রকাশ করে।

রাজনৈতিক কারণে মুসলিম লীগ ও ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মুসলিম লীগ চেয়েছিল বৃটিশ সরকার সোজাসুজি পাকিস্তান দাবী মেনে নিক।

বৃটিশ সরকারের নাজুক অবস্থা বুঝতে পেরে মিঃ গান্ধী অহিংস নীতি ত্যাগ করে আক্রমনাত্মক নীতি অবলম্বন করেন; জাতীয় সরকারের দাবী মেনে না নিলে তিনি সারা দেশব্যাপী বিক্ষোভের আগুন জ্বালাবেন বলে ও হুমকী দেন। দেশ বাসীর উদ্দেশ্যে হঠাৎ তাঁর এ বজ্রনিনাদ ধ্বনিত হয়, "কর না হয় মর" (ডু অর ডাই)। এমনকি তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে জাপানীদের আগ্রাসনকে স্বাগত জানান এবং জনসমক্ষে ঘোষনা করেন যে ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া মাত্রই জাপানীরা ফিরে যাবে।

১৯৪২ সালের ৭ই আগষ্ট কংগ্রেস "ভারত ছাড়" (কুইট্ ইন্ডিয়া) প্রস্তাব গ্রহণ করে। মিঃ গান্ধী কংগ্রেসের সেই অধিবেশনে এক যুদ্ধংদেহী ভাষণ দান করেন। এর ফলে সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়।

১৯৪৪ সালে মিঃ গান্ধী কারামুক্ত হবার পর মিঃ জিন্নাহর সাথে ভারত বিভাগ সমস্যা আলোচনায় সম্মত হন। একই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইতে পর পর কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাতে বাস্তব কোন ফলোদয় হয়নি। গান্ধী তাঁর অখন্ড ভারত নীতিতে অটল রইলেন। অপর দিকে মিঃ জিন্নাহ্‌রও আপোষহীন যুক্তি হল ভারত বিভাগই জাতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান।

www.pathagar.com

১৯৪৫ সালের শেষ দিকে যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এলে বড় লাট লর্ড ওয়াভেল সিমলাতে এক অধিবেশন আহবান করেন। তাঁর ধারণা ছিল বিভিন্ন দল নিয়ে সরকার গঠন করতে পারলে এবং তারা কিছু সময়ে একত্রে কাজ করলে তাদের মধ্যে একটি সমঝোতা সৃষ্টি হতে পারে। ফলে ভারতের অখণ্ডতা অটুট থাকতে পারে।

লর্ড ওয়াভেল ঠিক করেন যে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে পাঁচ জন মুসলিম এবং পাঁচ জন বর্ণ হিন্দু সদস্য থাকবেন। মিঃ জিন্নাহ দাবী করেন যে মুসলিম সদস্য মনোনীত করার অধিকার একমাত্র মুসলিম লীগের। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এর প্রতিবাদে বলেন যে কংগ্রেসে অনেক মুসলমান রয়েছে। তাই মুসলিম লীগ মুসলমানদের একক প্রতিনিধিত্বের দাবীদার হতে পারে না। কংগ্রেস মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে অস্বীকৃতি জানালে অধিবেশন ভেঙ্গে যায়। প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নিয়ে বাদ প্রতিবাদ হওয়াতে সমস্ত বিষয়টি একটি নির্বাচনী রায়ের উপর ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৯৪৬ সালে সেই অবিস্মরণীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। মুসলিম ভোটারদের সম্মুখে মাত্র দু'টি প্রশ্ন ছিল—তারা পাকিস্তান চায় কি না, সে বিষয়ে মনস্থির করতে হবে এবং ভোটের মাধ্যমে তা জানাতে হবে। বলাবাহুল্য এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির মোট ৬০৭টি আসনের মধ্যে ৪৭২টি মুসলিম লীগ অধিকার করে। আগের বছর কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলিম লীগ সবগুলি আসনই লাভ করবার গৌরব অর্জন করেছিল। মুসলিম লীগের এ বিজয়কে পাকিস্তানের বিজয় আখ্যায়িত করা যেতে পারে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ নির্বাচনকালে মিঃ জিন্নাহ্ ছিলেন পর্বত সম অচল অটল।

নির্বাচনের পর ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের এক সম্মেলন আহবান করা হয়। প্রত্যেক প্রদেশের নির্বাচিত সদস্যদের ১০% সদস্য

www.pathagar.com

নিয়ে একটি সাবজেক্ট কমিটি গঠন করা হয়। এতে অন্যান্যদের মধ্যে বংগদেশ হতে মনোনীত হন মিঃ এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী, মিঃ আবুল হাশিম, মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী, মিঃ ফজলুর রহমান মিঃ নুরুল আমীন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানী আসামের প্রতিনিধিত্ব করেন। যে প্রস্তাবটি সম্মেলনে পেশ করা হয় তা নিয়ে সাবজেক্ট কমিটি পাঁচ ঘন্টাব্যাপী আলোচনা করে। মিঃ আবুল হাশিম প্রশ্ন তোলেন যে লাহোর প্রস্তাবে "একাধিক রাষ্ট্রের" উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মিঃ জিন্নাহ্ তাঁর আপত্তি নাকচ করে দেন। ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল মুসলিম লীগ দ্ব্যর্থহীন ভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে পাকিস্তান একটি এক কেন্দ্রীক রাষ্ট্র হবে। উল্লেখ্য যে সম্মেলনে জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় যে ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে বংগ দেশ, আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকের পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্দু, বালুচিস্তান নিয়ে অর্থাৎ যে সমস্ত এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগুরু সে সমস্ত এলাকা নিয়ে একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং অবিলম্বে পাকিস্তান লাভের জন্য জোর আন্দোলন চালাতে হবে।

প্রস্তাব উত্থাপন কালে যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সে সমস্ত প্রদেশের মুসলমানদের উচ্ছসিত প্রশংসা করে সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, "মুসলমানদের স্বাধীনতা লাভের উত্তাল তরঙ্গ সমস্তপ্রদেশ হতে উত্থিত হয়েছে" তিনি আরো বলেন "বংগদেশের মুসলমানগণ পাকিস্তানের গৌরবের জন্য যে কোন রকমের ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত রয়েছে ((১৯৩) " ঠিক এমনি সময়ে বৃটেনে রক্ষনশীল দলের পরিবর্তে কংগ্রেসের দোসর শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসে।

শ্রমিক দল মেজর ক্লিমেন্ট এটলীর নেতৃত্বে মন্ত্রী সভা গঠন করে। কংগ্রেস জন্মলগ্ন থেকেই বৃটেনে শাখা প্রতিষ্ঠা করে তার প্রতি বৃটিশ জনগণের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল এবং এতে তারা বেশ কিছুটা সফলতাও লাভ করেছিল। শ্রমিক দল ছিল

(১৯৩) Syed Sharifuddin Pirzada—The Foudation of Pakistan,

www.pathagar.com

মুসলিম বিদ্বেষী এবং হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এ সময়ে বৃটিশ মন্ত্রী সভা ছিল কংগ্রেস ঘেষা এবং মুসলিম লীগ বিরোধী। এমন কি কংগ্রেসের কর্মসূচী প্রণয়নে অনেক সময় তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত থাকত। মিঃ এটলীর যোগ্যতা ছিল নিতান্তই নিম্নমানের এবং ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর কোন স্বচ্ছ ধারনা ছিলনা।

ক্লিমেন্ট এটলী ১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ কমন্স সভায় ঘোষনা করেন যে একদিকে বৃটেন ও ভারতীয়, অপর দিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার নিরসন কল্পে চুড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোর উদ্দেশ্যে শ্রমিক সরকার ভারতে শীঘ্রই একটি মন্ত্রী মিশন পাঠাচ্ছেন। মন্ত্রী মিশনের যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা হলেন স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস, ভারত সচীব লর্ড প্যাথিক লরেন্স এবং মিঃ এ, ভি, আলেকজাণ্ডার। এ সময়ে ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে যাঁরা নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন এখানে তাঁদের চারিত্রিক বিশ্লেষণের কিছু প্রয়োজন রয়েছে।

কংগ্রেসের অবিসম্বাদিত নেতা ছিলেন মিঃ গান্ধী। ভারতীয় জনগণ এমনকি ভারতের বাইরেও তাঁকে দেবতুল্য বলে মনে করা হতো। কিন্তু গান্ধী ছিলেন দুর্বোধ্য। তাঁর সম্বন্ধে ভারতের বড় লাট ওয়াভেল মন্তব্য করেছেন 'গান্ধী আধ ঘন্টা ধরে আমার সংগে আলাপ করেছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে কি বুঝাতে চেয়েছিলেন তা এখনো আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারিনা। তিনি আমাকে যা বলে ছিলেন তার প্রতিটি বাক্য অন্ততঃপক্ষে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আমি সুখী হতাম যদি আমি নিশ্চিত হতে পারতাম যে তিনি আমাকে যা বলে ছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর নিজেরই একটা স্পষ্ট ধারনা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারেও আমি সন্দেহ মুক্ত হতে পারিনি।'

আরও একবার গান্ধী যখন ওয়াভেলের সংগে দেখা করতে চেয়েছিলেন তখনও ওয়াভেলের মানসিক শান্তি এত ব্যহত হয়েছিল যে সাক্ষাৎকারের পূর্ব রাতে তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিলেন।

www.pathagar.com

এদের দু'জনের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ওয়াভেলের জনৈক সেক্রেটারী লিওনার্দ মোজলে কথা প্রসংগে এক সময়ে বলেছিলেন, "খর্বকায় লোকটি যখন অবিরাম অর্থহীন বাক্য বর্ষণ করে যেতেন, ওয়াভেল তখন চুপচাপ বসে বসে শুনতেন। এ সময়ে তাঁর চেহারায়—এক নিদারুন অসহায় অবস্থা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যেতো। হাতের মধ্যে একটি পেন্সিল নিয়ে শুধু নাড়া চাড়া করতেন এবং আমি পরিস্কার দেখতে পেতাম, তাঁর একটি চোখ ক্রমশঃ দীপ্ত হয়ে উঠছে। আলোচনা শেষে তিনি গান্ধীকে এই একটি মাত্র কথা বলে বিদায় সম্ভাষণ জানাতেন, 'ঠিক আছে, ধন্যবাদ' (১৯৪)।"

সর্ব ভারতীয় মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম সেক্রেটারী মুহাম্মদ নোমান উল্লেখ করেছেন "এক সকালে আমি জিন্নাহ্‌র সংগে দেখা করতে যাই। তিনি বিছানায় বসে গান্ধীর দেয়া একটি বিবৃতি পড়-ছিলেন। এটা ১৯৪০ সালের জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারীর ঘটনা। জিন্নাহ্‌ আমাকে বললেন "জানো, গত রাত্রে মুহূর্ত ও ঘুমোতে পারিনি। শুধু বক্তৃতাটি পড়েছি এবং গান্ধীর মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করেছি (১৯৫)।"

লিওনার্দ মোজলে তার বইতে উল্লেখ করেছেন যে 'একবার এক সংবাদিক গান্ধীকে তাঁর নীতি ব্যাখ্যা করতে বললে গান্ধী বলেন "আমি ঠিক পাঁচটি বাক্যে আমার নীতি ব্যাখ্যা করব।" সংবাদ দাতাটি গান্ধীর বাক্য কয়টি লিখে নিয়ে যান এবং পরে বাক্যগুলোর অর্থ উদঘাটন করতে গিয়ে দেখেন যে প্রতিটি বাক্য পরস্পর বিরোধী।'

---

(১৯৪) Leonard Mozley—The Last Days of Britich Raj
অনুবাদ মোয়াজ্জেম হোসেন।

(১৯৫) M.Noman—Author of Muslim India.

www.pathagar.com

নেহেরুর বাচন ভংগি এবং লেখার মধ্যে অকপটতার মেজাজ থাকলেও তাঁর মধ্যে সব সময় একটি ফাঁক থাকতো। জিন্নাহ সম্পর্কে এ, ভি, আলেকজাণ্ডারের মন্তব্য হলো "আমার পরিচিতদের মধ্যে এই একটি মাত্র লোককে দেখলাম যিনি সবসময় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়ান বলে মনে হয়। তাঁর প্রতি গভীর সদিচ্ছার হস্ত প্রসারিত করেও দেখা গেছে যে নিজের বক্তব্য থেকে তিনি এক চুলও নড়েন নি (১৯৬)।"

মন্ত্রী মিশন ১৯৪৬ সালের ২৪শে মার্চ নয়া দিল্লী আগমন করে। মন্ত্রী মিশন প্রথমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির প্রয়াস পাস। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন যে স্বাধীনতার প্রশ্নে কংগ্রেস মুসলিম লীগের মধ্যে কোন রূপ সমঝোতা স্থাপন অসম্ভব। তাই তাঁরা তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করেন।

মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনায় এক কেন্দ্র বিশিষ্ট ভারতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এ প্রস্তাব অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ার থাকবে দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাদ বাকী বিষয়কে তিনটি মুখ্য প্রশাসনিক গ্রুপের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে। হিন্দু প্রধান প্রদেশ গুলো নিয়ে গঠিত হবে 'ক' গ্রুপ এবং মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশ পাঞ্জাব, সিন্দু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বালুচিস্তান নিয়ে গঠিত হবে 'খ' গ্রুপ। অপেক্ষাকৃত কম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বংগদেশ ও আসামকে 'গ' গ্রুপ এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এভাবে মুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে তাদের আঞ্চলিক বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব লাভের এবং হিন্দু আধিপত্য থেকে আত্ম রক্ষার সুযোগ দেয়া হয়।

গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ গুলো আবার ঠিক করবে প্রদেশে গুলোর হাতে কোন কোন বিষয় ন্যাস্ত হবে আর গ্রুপটি কোন বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করবে। কেন্দ্র এবং গ্রুপের সংবিধানে এমন ধারা সংযোজিত থাকবে যে গ্রুপ অথবা প্রদেশ গুলো দশ বৎসর পরে

(১৯৬) Leonard Mozley—The Last Days of British Raj.

www.pathagar.com

অথবা প্রতি দশ বৎসর অন্তর তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে রদ বদল করতে পারবে যে কোন গ্রুপ কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে। এবং যে কোন প্রদেশ গ্রুপ হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে বা অন্য গ্রুপে যোগ দিতে পারবে বা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারবে। কেন্দ্রে মন্ত্রী সভায় বর্ণ হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য দেয়া হবে। মিশন যে কড়া শর্তটি আরোপ করে তা হলো পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ মেনে নিতে হবে। আংশিক মানলে চলবেনা। যে দল বা দল সমূহ এ পরিকল্পনা হুবহু মেনে নিবে তাদের কেন্দ্রে তত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হবে। আংশিক সম্মতি কে অসম্মতি বলে গন্য করা হবে এবং যে দল শুধু আংশিক ভাবে এ পরিকল্পনা মানতে চাইবে তাদেরকে সরকারী দায়িত্ব হতে বঞ্চিত করা হবে।

মাওলানা আজাদের আবেগময় বক্তৃতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রথমে কংগ্রেস মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনাটি গ্রহন করে। কংগ্রেস মনে করেছিল যে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী এতে পুরোপুরি সন্নিবেশিত না হবার কারনে মুসলিম লীগ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে এবং কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখলের পরিপূর্ণ সুযোগ পাবে। মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবকে মিঃ গান্ধী "এই দুঃখ দুর্গতির দেশে সুখের বীজ" বলে অভিহিত করেন এবং বলেন "মন্ত্রী মিশন এবং ভাইসরয় কর্তৃক প্রকাশিত সরকারী দলিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমার মনে এই ধারনা জন্মেছে যে এই পরিস্থিতিতে বৃটিশ সরকারের পক্ষে এটাই হলো সর্বোত্তম দলীল (১৯৭)।" কিন্তু মুসলিম লীগ মিশনের প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করে। মুসলিম লীগ যখন প্রস্তাবটি গ্রহন করে তখন কংগ্রেস এর প্রতি সন্দেহ পরায়ণ হয়ে পড়ে এবং এবং বিভিন্ন ধারার মন গড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে।

---

(১৯৭) Leonard Mozley—The Last Days of British Raj, অনুবাদ মোয়াজ্জেম হোসেন।

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় তারা বর্ণ হিন্দু এবং মুসলিম লীগের সংখ্যা সাম্যের প্রস্তাবেও অস্বীকৃতি জানায়। মন্ত্রী মিশন কংগ্রেসের প্রদত্ত ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে। তাই কংগ্রেসও প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করে। ফলে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলিম লীগকে মন্ত্রী সভা গঠনের আহবান জানানো উচিৎ ছিল। কিন্তু শ্রমিকদলীয় মন্ত্রী সভা কংগ্রেসকে তুষ্ট রাখার জন্যে উদগ্রীব ছিল। তাই ভাইসরয় নেহেরুর নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রী সভা গঠন করেন। মুসলিম লীগ শর্তভংগের অভিযোগ তুলে মন্ত্রী সভায় যোগদানে অস্বীকৃতি জানায়।

এমনি যুগ সন্ধিক্ষণে মাওলানা আজাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নেহেরু কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নিবাচিত হন। নেহেরুর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কে লিওনার্দ মোজলে "কাঁচের ঘরে ষাঁড়ের প্রবেশ" বলে অভিহিত করেন।

এ সময়ে নেহেরু এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতি দেন যা নাকি তাঁর জীবনীকার মাইকেল ব্রেচার তাঁর চল্লিশ বৎসরের রাজনৈতিক জীবনের সবচাইতে জ্বালাময়ী এবং উস্কানী মূলক বিবৃতি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর বিবৃতিতে বলেন "কোনো চুক্তির শর্ত মানা না মানা কংগ্রেসের এখতিয়ারে এবং ভবিষ্যতে উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা কংগ্রেসের আছে।" অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তাঁর এ বক্তব্য দ্বারা তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন যে চুক্তিটির রদবদল হতে পারে ?

এর জবাবে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন "কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনাটি রদবদলের পুরোপুরি ইচ্ছে আমার রয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যাবলীসমাধানে আমরা নিঃসন্দেহে কৃতকার্য হবো। তবে এ ব্যাপারে আমরা অন্য কারো এমনকি বৃটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবনা। ভারতকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করার মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন" যে কোন দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, কোন গ্রুপের অস্তিত্ব না থাকার সম্ভাবনাই বেশী। অবশ্য 'ক' গ্রুপ (হিন্দু জনগণ) এই গ্রুপ

www.pathagar.com

ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিবে। সিডনার্দ মোজলে তার "লাষ্ট ডেজ অফ বৃটিশ রাজ" নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন "এ অবস্থায় মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা সম্পর্কে নেহেরু যে মন্তব্য করেন তা রীতিমত অন্তর্ঘাত মূলক কাজের পর্যায়ে পড়ে। নেহেরু কি জিন্নাহর ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক ধারনা করতে না পেরে এই মন্তব্য করে ছিলেন, নাকি একজন বাচাল রাজনীতিক রূপে এসব মন্তব্য করেছিলেন, তা বলা মুশকিল। তাঁকে বাচাল বলা যায় এ জন্যে যে তিনি জানতেন না কখন মুখ বন্ধ রাখতে হবে।" বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হলো যে, কংগ্রেস আগের মতোই একটি চালবাজ ও বিপজ্জনক প্রতিষ্ঠান রয়ে গেছে। ফলে ১৯৪৬ সালের ২৭শে জুলাই মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে জিন্নাহ্‌র নির্দেশে প্রস্তাবটির প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করা হয়। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় আবার শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠে।

মুসলিম লীগ ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ কর্মসূচী দিবস (ডাইরেক্ট এ্যাকশন) পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বংগদেশ এবং সিন্ধু ঐ দিন সাধারণ ছুটির দিন বলে ঘোষণা করে। প্রত্যক্ষ কর্মসূচী দিবসের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের নিকট বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের পদক্ষেপ বুঝিয়ে বলা। মুসলিম লীগ হুঁশিয়ার করে দেয় যে কোন মূল্যে ঐ দিন মুসলমানেরা যেন কোন প্রকারের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকে। প্রত্যক্ষ কর্মসূচী দিবসের দু'দিন পূর্বে জিন্নাহ্‌ বলেন "আমি মুসলমানদেরকে বলছি প্রত্যক্ষ কর্মসূচী দিবস কোন সংঘর্ষ সৃষ্টির দিন নয়। তারা যেন মুসলিম লীগের নির্দেশ ঠিকমত মেনে চলে এবং শত্রুর পাতা ফাঁদে পা দিয়ে কোনও প্রকারের গোলযোগের সৃষ্টি না করে বা কোন প্রকারের উচ্ছৃংখল আচরণের আশ্রয় না নেয়, এবং দিনটি যেন শান্তিপূর্ণ ভাবে পালন করা হয় (১৯৮)।"

(১৯৮) Khalid Bin Syed—Pakistan in the Formative Stage.

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ কর্ম সূচী দিবসে আয়োজিত সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য যখন মুসলমানেরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে আসছিল তখন হিন্দু এবং শিখরা এর উপর হামলা চালায়। ফলে কলকাতায় নজীর বিহীন সাম্প্রদায়িক দাংগা সংগঠিত হয়। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কলকাতায় প্রায় চার হাজারের উপর লোক নিহত হয়। কলকাতার নর্দমাগুলো মানুষের লাশে ভর্তি হয়ে যায়। রাস্তার উপর শকুন বসে লাশগুলো ছিঁড়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত্তি করতে থাকে। মিঃ জিন্নাহ্ তাঁর বিবৃতিতে বলেন "আমি এই দাংগার তীব্র নিন্দা করছি এবং এই দাংগায় যারা ক্ষতিগ্রস্থ তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি এখনো জানিনা কারা এ হত্যা কাণ্ডের জন্যে দায়ী। তবে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারন এদের কার্যকলাপ মুসলিম লীগের নির্দেশের পরিপন্থী। প্রতিক্রিয়াশীল এবং উত্তেজনা সৃষ্টিকারীরাই হয়তো এই দাংগা সৃষ্টির জন্য দায়ী (১৯৯)।"

জিন্নাহ্ বা নেহের কেউ দাংগার সময়ে কলকাতায় আসেননি। একমাত্র লর্ড ওয়াভেলই এ দাংগায় ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতায় এসে তিনি বিভিন্ন নেতাদের সাথে আলোচনা করেন। স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন মিঃ জিন্নাহ্র একান্ত অনুগত। আলোচনা কালে তিনি ওয়াভেলকে জানান কংগ্রেস যদি ঘোষনা দেয় যে তারা মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনাটি মিশনের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় অনুযায়ী গ্রহণ করেছে, তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী নয় এবং সে সংগে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের সুযোগ দেয় তবে মুসলিম লীগ পরিকল্পনাটি গ্রহন করবে কিনা তা সুবিবেচনা করে দেখবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেবে।

লর্ড ওয়াভল ২৭শে আগষ্ট গান্ধি এবং নেহেরুকে ডেকে পাঠান। তিনি তাঁদের বলেন, হিন্দু এবং মুসলানেরা কলকাতায় মানবতার ও সভ্যতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ করেছে। এ বর্বরতার জন্যে তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে দায়ী করেন। পরে তিনি তাঁদের

(১৯৯) Leonerd Mozley—The Last Days of British Raj.
অনুবাদ—মোয়াজ্জেম হোসেন

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা করেন "মুসলিম লীগ যে নিশ্চয়তা পেতে চায় তা কি আপনারা দিতে রাজী আছেন ?" লিওনার্দ মোজলে বলেন "পরক্ষনেই গান্ধী তাঁকে সুক্ষ ও দুরূহ যুক্তিজালে আচ্ছন্ন করে ফেলেন। গান্ধী যেন সেদিনটি কুট তর্ক ও ছল চাতুরীর জন্য বেছে নিয়েছিলেন। যে ঋষি তাঁর আশ্রমে বসে মহৎ জ্ঞান, ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা বলে থাকেন, তাঁকেই সেদিন দেখা গেল পুরোদস্তর কংগ্রেস রাজনীতিকের ভূমিকায়।"

ওয়াভেল প্রশ্ন করেন "আপনারা কি আমাকে এইটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে আপনারা মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছেন ?"

জবাবে গান্ধী বলেন "মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনাটি যে আমরা গ্রহণ করেছি তা ইতিপূর্বেই আমরা আপনাকে জানিয়েছি। তবে মন্ত্রী মিশন যেভাবে এটি তৈরী করেছেন, ঠিক সে ভাবেই যে এটিকে আমরা গ্রহণ করব, এরূপ নিশ্চয়তা দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে।

ওয়াভেল : এমনওতো হতে পারে, আপনাদের ব্যাখ্যা আর মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্যে পার্থক্য ঘটতে পারে।

গান্ধী : অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু কথা হলো, মন্ত্রী মিশন যা ভাবছে তাঁদের পরিকল্পনায় তার সত্যিকার প্রতিফলন নাও ঘটতে পারে। অথচ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যা ভাবছে ঐকান্তিকভাবে তাঁরা তার বাস্তবায়নে আগ্রহী।

ওয়াভেল : যেহেতু মুসলিম সরকার অন্তর্বর্তী সরকার অংশ গ্রহণ করছেনা, কাজেই অন্তর্বর্তী সরকারের অনিবার্যভাবেই কংগ্রেসের পক্ষে যাবে। এ অবস্থায় কি করে এই সরকারের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা আশা করা যায় ?

গান্ধী : পক্ষপাতিত্বের ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইনা। আলোচনার আইন সংগত ভিত্তিটাই হলো আমাদের কাছে মুখ্য। কেননা নিয়মতান্ত্রিক দিক থেকে বলতে গেলে এ বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার অন্তবর্তী সরকারের। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায়

www.pathagar.com

এলেই কেবল মুসলিম লীগের আকাংখা এবং তাদের অমূলক উদ্বেগ প্রভৃতি প্রশ্নের সুরাহা করা সহজ হবে। কিন্তু এর আগে কিছুই করা যাবেনা।

গান্ধীর কথায় ওয়াভেল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেন। ক্রুদ্ধস্বরে তিনি বললেন "আপনিকি দেখতে পাচ্ছেন না এটা হবে স্রেফ একটা কংগ্রেস সরকার। তাঁদের মধ্যে নিরপেক্ষতা না থাকাটাই স্বাভাবিক।"

এ সময়ে পন্ডিত নেহেরু বাধা দিয়ে বললেন; "কংগ্রেসের গঠন কাঠামো সম্পর্কে আপনার সঠিক ধারণা নেই মাননীয় ভাইসরয়। কংগ্রেস হিন্দু সমর্থকও নয় এবং মুসলিম বিরোধীও নয়। এই সংগঠন ভারতের সব শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং কখনো তা মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন আইন প্রনয়ন করতে পারবেনা।"

ওয়াভেল ঃ কিন্তু পন্ডিত নেহেরু আপনি কোন মুসলমানদের কথা বলছেন? আপনি কি কংগ্রসী মুসলমান অর্থাৎ আপনাদের ক্রীড়নক-দের কথা বলছেন, না মুসলিম লীগ সমর্থক মুসলমানদের কথা বলছেন? আপনি কি বুঝতে পারছেন না এ মুহূর্তে সবচে' বড় প্রয়োজন আপনারা যে মুসলিম লীগের স্বার্থ নস্যাৎ করতে যাচ্ছেন না, মুসলিম লীগের মনে সে রকম একটি সংশয়হীন ধারণা সৃষ্টি করা। ভুলে যাবেন না মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি এটাই উপযুক্ত সময় এবং শেষ সুযোগ। সে যাহোক মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব গুলোর ব্যাপারে কংগ্রেসের কাছ থেকে আমি এমন একটা ঘোষনা চাই যে ঘোষণা মুসলিম লীগকেও সন্তুষ্ট করবে এবং একটা স্থিতিশীল অন্ত-র্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা দেবে। কিন্তু কংগ্রেস কি এতে রাজী হবে? একথাগুলো বলেই তিনি তাঁর টেবিলের দেরাজ খুলে একটা কাগজ টেনে বের করলেন এবং কথার জের টেনে বললেন, আমি যা বলতে চাই, এতে তা রয়েছে।"

প্রস্তাবিত ঘোষনাটি ওয়াভেল আগেই লিখে রেখেছিল। এতে বলা হয়েছিল, "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে কংগ্রেস ১৬ই মে'র বিবৃতির (মন্ত্রী মিশনের বিবৃতি) মূল বক্তব্য গ্রহন করতে প্রস্তুত রয়েছে। এ

www.pathagar.com

বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থার আওতায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গঠিত নতুন আইন সভা ১৬ই মে'র বিবৃতির ১৯ (৭) অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে হাত না দেয়া পর্যন্ত প্রদেশগুলো সম্ভাব্য কোন শাখা বা গ্রুপে যোগদানের জন্য অপশন দিতে পারবে না।"

ঘোষণা পত্রটি গান্ধী নেহেরুর হাতে দিলেন। এটি আদ্যোপান্ত পড়ে নেহেরু বললেন "এই ঘোষণা মেনে নেয়ার অর্থ কংগ্রেসকে তার নিজের পায়ে শৃংখল পরিয়ে দিতে বলা।"

ওয়াভেল ঃ কিন্তু মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা মেনে নিতে হলে আমি মনে করি এই ঘোষণাটি আপনারের মেনে নেয়া উচিত। একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিনে যে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনাটির তাৎপর্য না জেনেই কংগ্রেস প্রথমে এটা মেনে নিয়েছিল। যদি তাই হয়ে থাকে তবে তখন কেন আপনারা এটা গ্রহন করতে গেলেন? এই পরিকল্পনায় ভারতকে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করার কথাটি সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। কাজেই এখন আপনারা মোড় ঘুরিয়ে একথা বলতে পারেন না, মিশন—পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য আপনারা অনুধাবন করতে পারেন নি।

গান্ধী ঃ মন্ত্রী মিশনের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা যে এক হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

ওয়াভেল ঃ এটা হলো আইনজীবির কথা। আমি চাই আপনারা সাদা মাটা ইংরেজীতে আমার সাথে কথা বলুন। আমি একজন সৈনিক। সোজা সরল কথাই আমি বুঝি। আইনের যুক্তিতর্কের মার প্যাঁচে আমাকে আপনারা বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করবেন না।

নেহেরু ঃ আইনজীবি হয়ে নিশ্চয়ই আমরা কোন অপরাধ করিনি।

ওয়াভেল ঃ সেকথা নয়। আমি বলতে চাই, আপনারা আমার সংগে এমন সৎলোকের মত কথা বলুন যাঁরা ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ করতে চায়। বাদ দিন এ প্রসংগ। মন্ত্রী মিশনের প্রসংগে আসুন।

www.pathagar.com

মন্ত্রী মিশনের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় দিবালোকের মতই স্পষ্ট। সুতরাং এ ব্যাপারে আইনের ব্যাখ্যা চাওয়ার বা বিতর্কে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। একজন সরল সাদাসিধে লোক হিসাবে পরিস্থিতি আমার কাছে মোটেই জটিল মনে হচ্ছে না। কংগ্রেসের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নিশ্চয়তা পেলে আমি মনে করি মিঃ জিন্নাহ্ এবং মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে তাঁদের যোগদানের অস্বীকৃতির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে রাজী করাতে পারবো। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে তাঁদের প্রয়োজন আমরা বোধ করছি। ভারতেরও তাঁদের প্রয়োজন রয়েছে এবং আপনারা গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ পরিনামের কথাটি যদি চিন্তা করেন—এবং আমার মত আপনারাও জানেন এই বিপদের আশংকা পুরোপুরি বিদ্যমান—তাহলে আপনারাও তাঁদের প্রয়োজন বোধ করবেন। এ অবস্থায় কংগ্রেসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের অনুমতি দেয়া হলে সেটা আমার পক্ষে শুধু অবিবেচনার কাজই হবে না, একটা বিপজ্জনক ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াবে।

গান্ধী ঃ কিন্তু আপনি তো ইতিমধ্যেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। আপনি এখন আর আপনার কথার খেলাপ করতে পারেন না।

ওয়াভেল ঃ সে পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে। কলকাতার হত্যাকাণ্ডের ফলে গোটা ভারত এখন একটা গৃহ যুদ্ধের মুখে। এটাকে প্রতিহত করা আমার কর্তব্য। মুসলমানদের বাদ দিয়ে কংগ্রেসকে সরকার গঠন করতে দেয়া হলে গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধ করা যাবেনা। মুসলমানরা তখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে একমাত্র পথ হিসাবে বেছে নেবে। আর গোটা ভারতে শুরু হবে আবার বাংলার সেই ধ্বংসযজ্ঞের পুনরাবৃত্তি।

নেহেরু ঃ অর্থাৎ আপনি মুসলিম লীগের ব্ল্যাকমেইলের কাছে নতি স্বীকার করতে যাচ্ছেন।

ভাইসরয় হিসাবে লর্ড ওয়াভেলের সংগে এটাই ছিল গান্ধী এবং নেহেরুর শেষ আলোচনা। এই দিন রাতেই গান্ধী বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলীকে এক তার বার্তা পাঠান। এই তারবার্তায় তিনি ওয়াভেলের

www.pathagar.com

মানসিক অবস্থা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন "কলকাতার হত্যাকান্ড তাঁকে বেসামাল করে তুলেছে। এ অবস্থায় তাঁর জায়গায় একজন যোগ্যতাসম্পন্ন এবং আইনজ্ঞ লোকের প্রয়োজন (২০০)।"

লিওনার্দ মোজলে আরো বলেন "ভারতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে মিঃ এটলী এতই অনবহিত ছিলেন যে, গান্ধী যখন তাঁকে এই পরামর্শ দেন যে, ওয়াভেলের পরিবর্তে একজন আইনজ্ঞ এবং অধিকতর কর্মক্ষম ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন তখন তিনি এই বলে মন্তব্য করেন, 'নেহেরুর হয়েছে কি? তিনিইতো একজন আইনজীবি। তাই নয় কি? তখন তিনি জিন্নাহর নামও করতে পারতেন। জিন্নাহ নিজেও একজন আইনজীবি (২০১)।"

লক্ষনীয়, নেহেরু আইনের পরীক্ষায় পাশ করলেও আইনজীবি ছিলেন না। পক্ষান্তরে জিন্নাহ ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের একজন নামজাদা আইনজীবি। প্রীভি কাউন্সিলে আইন ব্যবসায়ে রত থাকার সময় তিনি ছিলেন একজন শীর্ষ স্থানীয় আইনজীবি। এটলী আরো মন্তব্য করেন "অপেক্ষাকৃত ভালো লোক পেলে আমি ওয়াভেলকে সরিয়ে আনতাম (২০২)।" কিন্তু বৃটিশ মন্ত্রী সভা লর্ড ওয়াভেলের সাথে একমত হন যে অন্তর্বর্তী তত্বাবধায়ক সরকারে মুসলিম লীগের অংশ গ্রহন ছাড়া ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব নয়। তাই ভাইসরয় মিঃ জিন্নাহ্‌কে অন্তবর্তী সরকারে পাঁচজন সদস্যের নাম দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানান। জিন্নাহ শুধু তাদের নামই পাঠান নি, কাকে কোন দফতর দেয়া হয়েছে তাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। তিনি নামের যে তালিকা পাঠান তাতে ছিল (১) লিয়াকত আলী খাঁ (অর্থ), (২) আই, আই, চুন্দ্রীগড় (বাণিজ্য). (৩) সর্দার এ, আর, নিশতার (ডাকও বিমান), (৪) গজনফর আলী খাঁ (স্বাস্থ্য) এবং (৫) যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল (বিধি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত)।

---

(২০০) Leonerd Mozley—The Last Days of British Raj.

(২০১) ঐ

(২০২) ঐ

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালের ২০শে জুন মিঃ এটলী কমন্স সভায় ঘোষনা করেন, ১৯৪৮ এর জুনের মধ্যেই ভারতের শাসন ক্ষমতা ভারতের দায়িত্বশীল সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। সে সংগে তিনি ভাইসরয়ের দায়িত্ব থেকে লর্ড ওয়াভেলের অপসারন এবং তাঁর জায়গায় এডমিরাল ভাইকাউন্ট মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগের কথাও ঘোষণা করেন। মাউন্ট-ব্যাটেন ছিলেন রাজ পরিবারের সাথে আত্মীয়তা সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

১৯৪৭ সালের ২২শে মার্চ ভাইকাউন্ট এবং ভাইকাউন্টেস লেডি মাউন্টব্যাটেন নয়া দিল্লী এসে পৌঁছান। তিনি অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁর প্রথম ভাষনে বলেন "ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্যে আমি এখানে আসিনি। ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বৃটিশ মন্ত্রী সভার প্রধান মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বের যে গুরুভার এটলীর উপর বর্তিয়েছিল তা বহন করার যোগ্যতা তাঁর ছিলনা। তিনি অত্যন্ত নিম্নমানের যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে আগমন করলে নেহেরুর বাচালতা তাঁকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি কংগ্রেসের হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হন। লিওনার্দ মোজলে তাঁর "লাস্ট ডেজ অফ বৃটিশ" রাজগ্রন্থে বলেন— "পরবর্তী কালে লেডি মাউন্টব্যাটেনের সংগে নেহেরুর আলাপ পরিচয়ের পর তাঁদের এ সম্পর্ক আরও গভীর হয়। দীর্ঘদিন থেকে নেহেরু ছিলেন বিপত্নীক। লেডি মাউন্টব্যাটেন তাঁর জীবনের এই শূন্যতার অনেকখানি পূরণ করে দিয়েছিলেন।" এ সম্পর্কে মাওলানা আজাদ মনে করেন যে সারা জীবন অখন্ড ভারতের ধ্বজাধারী নেহেরু লেডি মাউন্টব্যাটেনের কারণে ভারত বিভক্তিতে রাজী হয়েছিলেন (২০৩)। নেহেরুর বিশেষ সহকারী এম, ও, মাথাই তাঁর 'রেমিনেসেন্স অব্ নেহেরু এইজ্' বইতে বলেন, "লেডি মাউন্টব্যাটেন যখন নেহেরুর পাশে দাঁড়াতেন তখন নেহেরুর চেহারায় পৌরুষত্বের ভাব দীপ্ত হয়ে উঠত।" তিনি আরো বলেন, "যখনই লেডি মাউন্টব্যাটেন অবসর বিনোদনের জন্যে নেহেরুর পরিবারের সাথে অবস্থান করতেন নেহেরুর শয়ন কক্ষের সংলগ্ন কক্ষটি তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট থাকত" (২০৪)।

(২০৩) M.O. Mathai— Reminiscence of Nehru Age

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালনে অনুপযুক্ত এটলী এবং কংগ্রেস সমর্থক মুসলিম বিদ্বেষী মাউন্টব্যাটেনের কারণেই ভারত বিভাগের সময় প্রায় ৫০ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছিল এবং এর চাইতে আরো অনেক গুণ বেশী লোক বাড়ী ঘর এবং তাদের সবকিছু হারিয়েছিল। যদি সে সময়ে ক্লিমেন্ট এটলী বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় পদে সমাসীন না থাকতেন, তবে হয়তো ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে এত ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হত না।

এদিকে লিয়াকত আলীকে অর্থ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দিতে রাজী হয়ে কংগ্রেস নিদারুন বেকায়দায় পড়েছিল। লিয়াকত আলী অর্থ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কংগ্রেসের যে কোন প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রনালয় নাকচ করে দিত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেল তাঁর দফতরের জন্য একটি পিয়নের পদ সৃষ্টি করতে চাইলে ও অর্থ মন্ত্রবালয় হতে তা মঞ্জুর হত। তাছাড়া লিয়াকত আলী তাঁর বাজেটে কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষাক ক্রোড়পতিদের উপর বিপুল পরিমাণে কর ধার্য করে কংগ্রেসের সমাজতন্ত্র প্রীতির মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। সর্দার প্যাটেল পরে ভাইসরেয়ের সহায্যে লিয়াকতের বাজেট সংশোধন করে নেন।

মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারেন যে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান এক অসম্ভব ব্যাপার। তাঁকে বিকল্প পথ বেছে নিতে হবে। আর তা ছিল ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। কিন্তু কংগ্রেসকে কেমন করে এ প্রস্তাবে রাজী করানো যায়? তাঁর সামনে অকস্মাৎ এক সুযোগ এসে গেল। মার্চের প্রথম দিকে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি একটি প্রস্তাব পাশ করে। এ প্রস্তাবটির রচয়িতা ছিলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল। এ প্রস্তাবে ভারতের বিরাট শস্যাগার পাঞ্জাব প্রদেশকে হিন্দু-মুসলমান দু'টি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে বিভক্ত করার কথা বলা হয়। এতে আরো বলা হয় শিখরা ইচ্ছা করলে যে-কোন রাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবে। প্যাটেল কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির জনৈক সদস্যকে জানিয়েছিলেন মুসলিম লীগ যদি পাকিস্তানের জন্য জেদাজেদি করতে থাকে তবে পাঞ্জাব এবং ব

www.pathagar.com

দেশকে ভাগ করা ছাড়া উপায় নেই। পণ্ডিত নেহেরু জিন্নাহকে জব্দ করার জন্যে প্রস্তাবে সায় দিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল জিন্নাহকে বুঝিয়ে দেয়া যে পাকিস্তান দাবীর প্রতি অনড় থাকলে তাকে খণ্ডিত পাকিস্তান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে যা নাকি কখনো টিকে থাকতে পারবেনা। কংগ্রেস পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব করে প্রকারান্তরে ভারত বিভাগেরই দাবী তুলে ছিল। তাই মাউন্টব্যাটেন সংস্কার কমিশনের সদস্য ভি, পি, মেননকে নেহেরুর সাথে পরামর্শক্রমে পাঞ্জাব, বাংলা এবং আসামকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা তৈরীর নির্দেশ দেন। এ পরিকল্পনাটি তৈরী করতে সময় লেগে ছিল ৪ ঘন্টা, আর বৃটিশ মন্ত্রী সভা তা ৫ মিঃ সময়ে অনুমোদন করে। পরিকল্পনাটি ভারতের গভর্ণর শাসিত প্রদেশের ১১ জন গভর্ণরের নিকট বিলি করা হয়। তাঁদের এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অসুস্থতার কারণে বংগদেশের গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিকট থেকে আভাষ পাওয়া যায় যে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের জন্যে কলকাতায় এক আন্দোলন চলেছে। এই আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন রয়েছে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর পক্ষে এরকম বিভক্তির জন্য আপত্তি জানানো সংগত ছিল না। কারণ লাহোর প্রস্তাবে ছিল ... ... "ভৌগলিকভাবে সংলগ্ন ভুখণ্ডগুলিকে একেকটি অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলির এলাকা প্রয়োজন অনুযায়ী রদবদল করে এমনভাবে গঠন করতে হবে যে সকল অঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত যেমন উত্তর পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চল সেগুলিকে একত্র করে রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে যা হবে স্বাধীন সার্বভৌম এবং স্বায়ত্বশাসিত। "তাই পাঞ্জাব বংগদেশ এবং আসামের বিভক্তি লাহোর প্রস্তাবের পরিপন্থী নয়। কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম বংগদেশে জিন্নাহ সাহেবের কোন আপত্তি ছিলনা। স্বীয় বাসভবনে আবুল হাশিমকে তিনি বলে ছিলেন "এখন আপনি জনসাধারণের নিকট গিয়ে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করুন। বাংলার নিজস্ব একটি সংস্কৃতি রয়েছে (২০৫)।"

---

(২০৫) বদরুদ্দীন ওমর—ঈদ সংখ্যা বিচিত্রা—১৯৮৭

www.pathagar.com

বংগ দেশকে ঐক্যবদ্ধ রেখে স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের জন্যে মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে এক বৈঠক হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, খাজা নাজিম উদ্দিন এবং প্রাদেশিক রাজস্ব মন্ত্রী ফজলুর রহমান। নাজিমুদ্দিন এ বিষয়ে ষ্টেটসম্যান পত্রিকার প্রতিনিধির সংগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে যথা সম্ভব বিচার বিবেচনার পর তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনই বংগদেশের মুসলমান এবং অমুসলমান সকল সম্প্রদায় ভুক্ত জনগণের পক্ষে মংগলজনক হবে এবং তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে বংগদেশকে ভাগ করা হলে বাংগালীদের স্বার্থে চরম আঘাত হানা হবে। (২০৬)

নেহেরুর সাথে পরামর্শক্রমে ভি, পি, মেনন রচিত ভারত বিভাগের যে প্রস্তাব বৃটিশ মন্ত্রী সভা অনুমোদন করেন তাতে পাঞ্জাব এবং বংগদেশ হিন্দু ও মুসলমান জন সংখ্যার ভিত্তিতে বিভক্ত করার প্রস্তাব ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যা পরিষ্ঠ হলেও সেখানে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন ছিল। তাই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভারত কিংবা পাকিস্তানে যোগদান সম্পর্কে জনমত যাচাই করার জন্য সেখানে রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। এ সময় মিঃ জিন্নাহ স্বতন্ত্র বংগদেশ রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে সেখানে রেফারেন্ডামের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ভাইসরয় তাঁর এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। মিঃ জিন্নাহর ধারণা ছিল বংগদেশের অস্পৃশ্যরা হিন্দুদের ভোট না দিয়ে মুসলমানদের ভোট দিবে (২০৭)।

কংগ্রেসের নেতা, শরৎ চন্দ্র বোস স্বাধীন এবং সার্বভৌম বংগদেশ গঠনের জন্যে মুসলিম লীগ এর সংগে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে আলোচনাক্রমে একটি খসড়া প্রস্তাব ও তৈরী করেছিলেন। তিনি এ প্রস্তাবটি গান্ধীর নিকট পাঠালে গান্ধী তাঁকে এ বিষয়ে আর অগ্রসর না হতে নির্দেশ দেন। গান্ধী বলেন পন্ডিত নেহেরু এবং

---

(২০৬) বদরুদ্দীন ওমর—ঈদ সংখ্যা বিচিত্রা—১৯৮৭

(২০৭) Leonard Mozley—The Last Days of British Raj.

www.pathagar.com

সর্দার প্যাটেল উভয়ই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে অনড় এবং তাঁরা মনে করেন এটা কেবল তপসিলী সম্প্রদায়ের নেতাদেরকে হিন্দুদের থেকে বিভক্ত করার ফন্দী (২০৮)।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারতের ভাইসরয় ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ঘোষনা দেন। এতে বলা হয় প্রদেশ বিভক্ত হবে কিনা সে সম্বন্ধে উভয় প্রদেশের আইন পরিষদে পৃথকভাবে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিরা মতামত দিবেন। বিভক্ত ব্যবস্থায় পরিষদের কোন একটি অংশ ভোটাধিক্যে প্রদেশ বিভাগের অনুকূলে মত প্রকাশ করলে প্রদেশ বিভক্ত হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হবে। ২১শে জুন মুসলিম সদস্যগণ অখন্ড বংগদেশের পক্ষে রায় দেয় কিন্তু হিন্দু সদস্যগণ বংগদেশের বিভক্তি চায়। ফলে বংগদেশ বিভক্ত হয়।

সিলেট এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রেফারেন্ডামের ফল ও পাকিস্তানের অনুকূলে যায়। দেশ বিভাগের পরিকল্পনা গৃহীত হবার পর ভারত এবং পাকিস্তানের সীমানা নির্দ্ধারণের দায়িত্ব দেয়া হয় স্যার সিরিল রেডক্লিফের উপর। তিনি ১৯৪৭ সালের ৮ই জুলাই দিল্লী আসেন এবং তাঁকে দু'দেশের সীমানা নির্দ্ধারণের জন্য ৫ সপ্তাহের সময় দেয়া হয়। এ দুরূহ ব্যাপার সমাধা করতে বৎসরের পর বৎসরের লাগার কথা, কিন্তু স্যার সিরিল রেডক্লিফ নির্ধারিত ৫ সপ্তাহের পূর্বেই তাঁর রোয়েদাদ তৈরী করেন। তিনি রোয়েদাদ পেশ করেন ৯ই আগষ্ট। ৮ই আগষ্ট পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার ইভান জেংকিনস ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী জর্জ এবেলের নিকট থেকে সীমান্ত রোয়েদাদ তৈরী হয়েছে কিনা জানতে চান। জর্জ এবেল তাঁকে সীমান্ত রোয়েদাদ সম্পর্কে যা বলেন সে অনুযায়ী তিনি একটি মানচিত্র তৈরী করেন। এ মানচিত্র হতে প্রতীয়মান হয় যে ফিরোজপুর জিলা এবং গুরুদাসপুর জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মাউন্টব্যাটেনের নিকট রোয়েদাদ ৯ই আগষ্ট হস্তান্তর করা হলেও তিনি তা ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত চেপে রাখেন। অতঃপর তিনি যে রোয়েদাদ প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায় যে এ তিনটি

(২০৮) Leonard Mozley—The Last Days of British Raj.

www.pathagar.com

জেলা ভারতে পড়েছে। গুরুদাসপুর জেলায় মুসলমানেরা বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ। গুরুদাসপুর জেলা যদি পাকিস্তানে পড়ত তাহলে কাশ্মীরের সাথে ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থ বিচ্ছিন্ন থাকত। রেডক্লিফের রোয়েদাদ চেপে রাখার কারণ ছিল, নেহেরুকে খুশী করার জন্যে মাউন্টব্যাটেন রেডক্লিফকে তাঁর রোয়েদাদ পরিবর্তনে বাধ্য করেছিলেন এবং ফলে এ তিনটি জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তানের এ অভিযোগ মাউন্টব্যাটেন কখনো অস্বীকার করেন নি (২০৯)।

এ রোয়েদাদে পার্বত্য চটগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে ছিল। এ সম্পর্কে লিওনার্দ মোজলে বলেন "এ রোয়েদাদে ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের সংগে যুক্ত করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতারা স্যার রেডক্লিফের এ সিদ্ধান্ত কিছুতেই মেনে নেবেনা বলে জানায়"। তাই চাকমা সন্ত্রাস বাদীদেরকে যে ভারত সরকার মদদ যোগাচ্ছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

মাউন্টব্যাটেনের একান্ত ইচ্ছা ছিল ভারত এবং পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর তিনি উভয় রাষ্ট্রের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হবেন। তাঁর অভিপ্রায় তিনি জিন্নাহর নিকট ব্যক্ত করেছিলেন এবং লর্ড ইজমের মারফত তাঁর উপর চাপ ও সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু নেহেরুর হাতের পুতুল মাউন্টব্যাটেনকে জিন্নাহ কোন মতেই পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল বানাতে রাজী হননি। ফলে তিনি আরো বেশী পাকিস্তান এবং মুসলিম বিদ্বেষী হয়ে পড়েন। তিনি ছলে বলে কৌশলে দেশীয় রাজ্য গুলোকে ভারতে যোগদানে বাধ্য করেন। দেশীয় রাজ্যগুলোকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানে বাধ্য করানোর উদ্দেশ্যে মাউন্টব্যাটেনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে লিওনার্দ মোজলে বলেন "কখনো তিনি ধমকের সুরে গলা চড়িয়ে তাঁদের সংগে কথা বলছিলেন, আবার কখনো তরল হাস্য—পরিহাসে মনকে হালকা করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি স্কুল—বালকদের মত তাঁদেরকে চেম্বার

(২০৯) বদরুদ্দীন ওমর—ঈদ সংখ্যা বিচিত্রা—১৯৮৮

www.pathagar.com

থেকে বাইরে ডেকে নিয়ে জানতে চাইলেন তাঁরা দলিলে স্বাক্ষর করবেন কিনা। তাঁর একথার সবার এমনকি তাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে ধনী তার মুখেও একটা বিষাদের ছায়া নেমে আসে। তাঁরা ভাইসরয়ের কাছে এটা আশা করেননি। এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তাঁদের সবাই বৈঠকে এসে ছিলেন যে ভাইসরয় কংগ্রেসের গ্রাস থেকে তাঁদের সুযোগ সুবিধে গুলো রক্ষা করবেন।"

ভারত বিভাগের দু'মাস পরে ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ আইয়ান ষ্টিফেনস মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক নৈশ ভোজের জন্য আমন্ত্রিত হন। তখন কাশ্মীরের মহারাজা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ-দানের ষড়যন্ত্র করছিলেন। আইয়ান ষ্টিফেনস লক্ষ্য করেন লর্ড এবং লেডি মাউন্টব্যাটেন হিন্দুদের ধ্বজাধারীর ভূমিকা গ্রহন করেছেন। দিল্লীর লাট ভবনে যেন যুদ্ধের পায়তারা চলছে। এ যুদ্ধ পাকিস্তান, মুসলিম লীগ এবং মিঃ জিন্নাহর বিরুদ্ধে।

মিঃ জিন্নাহ ১১ই আগষ্ট কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেমব্লিতে ভাষণ দানকালে বলেন "তোমরা স্বাধীন। তোমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রে স্বাধীন ভাবে মন্দির বা মসজিদে যেতে পার। তোমরা যে কোন ধর্ম, বর্ণ বা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হওনা কেন তাতে কিছু আসে যায় না। পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে সকলই সম অধিকার ভোগ করার অধিকারী। রাজনৈতিক ভাবে হিন্দু আর হিন্দু থাকবেনা, মুসলমান আর মুসলমান থাকবেনা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকা সত্বেও সকলে হবে পাকিস্তানী। পাকিস্তানের নাগরিক।"

মিঃ হেক্টর বলিথো বলেন, "এ কথা গুলো মিঃ জিন্নাহর মুখ নিসৃত হলেও এ নীতি নির্ধারণ করেছিলেন তের শত বৎসর পূর্বে স্বয়ং রাছুলে খোদা। তিনি বলেছিলেন আল্লার দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। তোমাদের সকলের জীবন এবং সম্পদ পবিত্র আমানত। তোমরা একে অন্যের জান মালের ক্ষতি সাধন করবেনা। আজ আমি বর্ণ গোত্র এবং শ্রেণীর মধ্যে যত বিভেদ রয়েছে তা আমার পদ তলে নিষ্পেষিত করছি (২১০)।"

---

(২১০) Hector Bolitho– Jinnah

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব বাংলা নিয়ে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তন হয়, উত্তর-পশ্চিমাংশ পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্বাংশ পূর্ব পাকিস্তান নামে অভিহিত হতে থাকে।

১৯০৫ সালে বংগদেশকে বিভক্ত করে আসাম এবং পূর্ব বংগ নিয়ে একটি প্রদেশ পঠন করা হয়েছিল। এর ফলে পূর্ব বংগের মুসলমানদের শাসন এবং শোষনের সুযোগ সংকুচিত হয়েছিল বিধায় বর্ণ হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে এবং পরিনামে ১৯১১ সালে বংগ ভংগ রদ করে পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় বংগ একত্র করা হয়।

১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু এতে মুসলিম প্রভাব বৃদ্ধির আশংকায় কংগ্রেস বংগদেশকে বিভক্ত করে। মুসলমানদের অগ্রগতি এবং উন্নতিকে প্রতিহত করাই ছিল বর্ণ হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের এক মাত্র উদ্দেশ্য।

মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়ঃ

ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্বের সুত্রপাত হয় ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধের পর হতে। পলাশীর যুদ্ধে বংগদেশ, বিহার এবং উড়িষ্যা ইংরেজদের করতলগত হলো। কলকাতা হলো ইংরেজদের সদর দফতর। বাংগালী হিন্দুরা প্রথমেই ইংরেজদের সাথে সহযোগীতার হাত বাড়ায়। ইংরেজী শিখে ইংরেজদের আমলা শ্রেণী ভুক্ত হয়ে এবং তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে সহযোগীতা করে তারা ভারতের মধ্যে সবচাইতে প্রভাবশালী হয়ে উঠে। কিন্তু শীঘ্রই ইংরেজরা বর্ণ হিন্দুদের সহযোগীতার অসারতার কথা বুঝতে পারে। আবদুল মওদুদ সাহেব বলেন "লর্ড লরেন্স বাংগালী হিন্দু গ্রহণ নীতির ভীষণ বিরোধী ছিলেন। কারন বাংগালীরাই শিক্ষাংগনের সুযোগটা উদার ভাবে আত্মসাৎ করেছে। তিনি বাংগালীর বীরত্ব এবং আত্ম নির্ভরতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এবং বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন যে পাঞ্জাবী ও অন্যান্য বীর্যবান গোত্রসমূহ ইংরেজের চেয়ে বাংগালীর অধীন আর চাকুরী করতে ইচ্ছুক নয়।"

www.pathagar.com

প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা নীতি ব্যর্থ এবং বাংগালীদের বর্জন করার উদ্দেশ্য ভারত সচীব ১৮৬৯ সালে পার্লামেন্টে একটি বিল উপস্থাপন করেন এবং পর বছর সেটা আইনে পরিণত হয়। এই আইন বলে ভারত সচীবের সংগে পরামর্শ ক্রমে ভাইসরয় কভেনান্টেড চাকুরীতে কোন ভারতীয়কে মনোনয়ন দিতে পারতেন। তখন ভারত সচীব পরিস্কার ভাষায় বলেছিলেন প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষায় পাঠান বা শিখের চেয়ে বাংগালী বেশী সুযোগ পায়। কলিকাতার কলেজে পাশ করা একজন ছাত্রকে উত্তর ভারতে যুদ্ধ প্রিয় জাতি গুলির উপর কর্তৃত্ব করতে দেওয়া খুবই বিপজ্জনক নীতি হবে। ভারত সরকার উত্তর ভারতের তালুকদারদের মধ্যে থেকে প্রার্থী মনোনীত করবেন শিক্ষায় পাশের কথাটা যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা না করে (২১১)।" তাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে উত্তর ভারতের বাসিন্দারা বৃটিশের আনুকুল্যে সরকারী ও ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংগালী মুসলমানদের তখনো দৃশ্যপটে আবির্ভাব ঘটেনি। বাংগালী মুসলমানদের তুলনায় উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশের অভিজাত পরিবারের মুসলমানরা ছিল অগ্রগামী। তাদের মধ্যেই আদমজী, ইস্পাহানী, দাদা এবং বাওয়ানীর মত পুঁজিপতির সৃষ্টি হয়।

বাংগালীদের অসামরিক জাতি হিসাবে গন্য করে ইংরেজেরা সামরিক চাকুরী থেকে তাদের বঞ্চিত রেখেছিল। সামরিক চাকুরীতে পাঞ্জাবী মুসলমান এবং শিখদের নিয়োগ করা হতো।

পাকিস্তান সৃষ্টি হলে অবাংগালী মুসলমানরাই উচ্চ সরকারী পদে সমাসীন ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে অখণ্ড ভারতে হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগীতা এড়াবার উদ্দেশ্যে অবাংগালী পুঁজিপতি যেমন ইস্পাহানী, আদমজী পাকিস্তানে আগমন করে তাঁদের মূলধন বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পক ারখানা অবাংগালীদের

(২১১) আবদুল মওদুদ —মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও সংস্কৃতির রূপান্তর।

www.pathagar.com

মালিকানায় গড়ে উঠে। ব্যবসা বাণিজেও তারা অগ্রগামী থাকে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানীরা মনে করতে থাকে যে তারা অবাংগালীদের দ্বারা শাসিত এবং শোষিত হচ্ছে। পাকিস্তান সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগীতা এড়িয়ে অর্থ নৈতিক মুক্তি হাসিল করা। অখণ্ড ভারতে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে। পাকিস্তানের সে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা দেখা দেয় বাংগালী ও অবাংগালী মুসলমানদের মধ্যে। তারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ন হয়ে উঠে। অবাংগালীদেরকে ইংরেজেরা বাংগালীদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে আগত অবাংগালী মুসলমানরা বাংগালী মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠতর জাতি হিসাবে কর্তৃত্ব চালাত। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে হাল জামানার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে বাংলার অধিবাসীরা কখনো কারো প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব মেনে নেয়নি। তাদের উপর কেউ প্রভুত্ব করতে পারেনি বরং তারাই পালযুগে এবং গুপ্ত যুগে উত্তর ভারতের উপর প্রভুত্ব করেছিল। তাই বাংগালী এবং অবাংগালীদের মধ্যে বিদ্বেষর ভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৭১ সালে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুসলিম বাংলার অভ্যুদয় ঘটে।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় পাকিস্তানের চির দুষমন ভারত বাংলাদেশের পক্ষে অস্ত্র ধারন করে এবং ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের সেনাধ্যক্ষ লেঃ জেঃ আমীর আবদুল্লা খাঁ নিয়াজী ভারতীয় বাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ভারতের উদ্দেশ্য ছিল যে সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষনা করে পূর্ব পাকিস্তান জয় করে বাংলাদেশ নামে একটি তাবেদার রাষ্ট্রের সৃষ্টি করবে। The Legacy of Blood এর লেখক এন্টনি মাসকারনাস সাপ্তাহিক বিচিত্রার প্রতিনিধির সংগে এক সাক্ষাৎকার দান করেন। এ সাক্ষাৎকারে সাপ্তাহিত বিচিত্রার প্রতি নিধি তাঁকে প্রশ্ন করেন :—

আপনি লিখেছেন পাকিস্তানী সৈনিকরা ভারতীয় সেনা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে। আমরা জানি তারা যৌথ কম্যাণ্ডের কাছে আত্ম সমর্পন করে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি? উত্তরে মাসকারনাস বলেন "ননসেন্স। জেনারেল অরোরার আনুগত্য হলো ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রতি। কি করে তিনি অন্য কারও প্রতি আনুগত্য দেখাতে পারেন? জেনারেল অরোরা এ এলাকায় ভারতীয় সেনা বাহিনীর অপারেশনের দায়িত্বে ছিলেন। আত্মসমর্পনের পর আমি জেনারেল অরোরা এবং ফিল্ড মার্শাল মানেকশ এর সংগে আলাপ করি। আমি বলি ভারতীয়রা সাহায্য করেছ এ জন্যে বাংলাদেশীরা

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞ। ইন্দিরা গান্ধী এ ব্যাপারে অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আপনারা কেন বাংলাদেশীদের কাছে তাদের শত্রুদের আত্মসমর্পন করালেন না? তাদের একজন আমাকে বলেন কি করে আপনি আশা করতে পারেন ভারতীয় সেনা বাহিনী সহস্র বছরের মধ্যে তাদের প্রথম বিজয়ের ফল অন্যের হাতে তুলে দেবে। আমি তখন বললাম এর মাধ্যমে আপনারা হয়তো যুদ্ধ জয় নিশ্চিত করলেন কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক রাজনৈতিক ভুলটি করে বসলেন (২১২)।"

৭২২ খৃঃ মোহাম্মদ বিন কাশিমের নিকট রাজা দাহিরের পরাজয় বরনের পর বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারেনি। তাই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জেনারেল অরোরার নিকট পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পনকে মুসলমানদের উপর ভারতের বর্ণ বাদী হিন্দুদের প্রথম বিজয় বলে উল্লেখ করেছেন।

১৯৮৩ সালের ১৪ই অক্টোবর ডেট লাইনে কলিকাতা হতে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় সেনা বাহিনী ১৬ই ডিসেম্বরকে তাঁদের প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান দখল উপলক্ষে বিজয় দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল কুনোয়র চমন সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন ঐ দিন পাকিস্তানী সেনা বাহিনী তার পূর্ববর্তী সেনাধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল জগজিত সিং অরোরার নিকট বিনাশর্তে আত্মসমর্পন করে ছিল। তিনি আরও বলেন এই প্রথম বারের মত বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ভারতের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর এবং ভারতের এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ব্যাপারে অবদানের কথা স্বীকার করেছেস (২১৩)।

এন্টনি মাসকারানাস ঠিকই বুঝেছিলেন যে বাংলাদেশবাসীরা অতীতে প্রভুত্ব মানেনি। কেউ তাদের উপর প্রভুত্ব করতে পারেনি বরং বাংলার পাল এবং গুপ্ত সম্রাটগন সমগ্র আর্য ভারত জয় করে শতাব্দীর পর শতাব্দী নিজদের পদানত রেখে ছিল। ভবিষ্যতে বাংলা বাসীরা ইসলামাবাদের প্রভুত্ব হতে মুক্ত হবার উছিলায় দিল্লী বা কলিকাতার প্রভুত্ব মানবেনা। তাই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অন্য কোন বাংলা নয়, মুসলিম বাংলারই অভ্যুদয় ঘটেছে এবং ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়েছে।

---

(২১২) সাপ্তাহিক বিচিত্রা ৩৭ সংখ্যা, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬

(২১৩) Bangladesh Times, dated—15, 2, 83.

www.pathagar.com

মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়

ভ্রম সংশোধনী

পৃষ্ঠা নং	লাইন সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	মন্তব্য
১	১১	এক	বাদ দিতে হবে	
১	১৮, ১৯	বিষ্ণু	বিষ্ণু	
৩	৩	রাজধা	রাজধানী	
৪	৬	পয়ে	পরে	
৫	১৫	কৌদ্ধ	বৌদ্ধ	
৬	১৭	রাজত্বোর	রাজত্বের	
৮	১৩	মেগাস্থিনিসা	মেগাস্থিনিস	
৯	১৪	রাজগন্যক	রাজগনকে	
১০	২৪	রাজ্যের	রাজের	
১১	৩	frotiers	frontiers	
১২	৯	ahd	and	
১৫	১২	আয়ুথ	আয়ুধ	
১৬	২১	বঙ্গরজ	বঙ্গরাজ	
১৭	২০	অভিসাপ	অভিশাপ	
২০	৫	দ্বাবা	দ্বারা	
২১	৩	উপখ্যানের	উপাখ্যানের	
,,	৫	বলিষ্ট	বশিষ্ট	
,,	৭	আশ্রমবাণী	আশ্রমবাসী	
,,	১৭	ব্রাহ্মতেজ	ব্রহ্মতেজ	
,,	২৮	বৈশ্যপন	বৈশ্যগণ	
২২	২৪	নিহিত	নিহত	

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা নং	লাইন সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	মন্তব্য
২৩	১	শুদ্রেদের	শুদ্রদের	
,,	৯	পর্যন্ত	পর্যন্ত	
২৭	২	কনিষ্কর	কনিষ্কের	
২৯	২	ইতিহাসে	ইতিহাস	
২৯	৮	কুশলাস্ত্র	কুলশাস্ত্র	
৩২	৯	কনার	কন্যার	
৩৩	৫,৬	ব্রহ্মপুত্র	ব্রহ্মপুত্র	
৩৪	২৪	কনোজ	কণৌজ	
,,	২৫	ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মন	
৩৫	১০	ব্রহ্মনগণের	ব্রাহ্মনগণের	
৩৬	৫	রাজবশের	রাজবংশের	
৩৯	২৬	বারাগনা	বারাংগনা	
৪১	১	বাঁধে	বাধে	
৪২	১২	বিক্রমমাদিত্যের	বিক্রমাদিত্যের	
,,	১৯	ধর্মালম্বী	ধর্মাবলম্বী	
৪৩	৪	শ্রদ্র	শুদ্র	
,,	৮	সম্প্রদায়ে	সম্প্রদায়	
৪৪	২০	তরুরব	তরুবর	
৪৭	২০	জাজাপুরে	জাজপুরে	
৫১	২	বীর	ধীর	
,,	২০	পপিচালনা যা করেন	পরিচালনা করেন যার	
৫২	৫	মদানকে	মর্দানকে	
৫৬	৩	তুগলকদের	তুঘলকদের	

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা নং	লাইন সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	মন্তব্য
৫৭	৩	হলিয়াস	ইলিয়াস	
,,	১৫	জানন	জানান	
৫৮	১০	শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	
৬০	২	বমু	বসু	
৬৩	৫	হরে	হয়ে	
,,	৮	কেলে	কৈলে	
৬৬	২	সুমদ্ধশালী	সমৃদ্ধশালী	
৬৭	১৬	চাঁদা	চাঁদ	
৬৮	৩-৪	উপঢৌকন	উপঢৌকন	
,,	৮	পারিণত	পরিণত	
,,	,,	শিরাজীর	শিবাজীর	
,,	১১	পেশোয়ারকে	পেশোয়াকে	
৬৯	২৩	পদীচ্যুত	গদীচ্যুত	
৭১	১২	কস্রাবাজার	কক্সবাজার	
৭২	পাদটিকা	—	and →	Social
৭৩	১৪	কবল	কবুল	এর পর
৭৫	পাদটিকা	Vo IIX	Vol. IX	যোগ করতে
৭৬	১	এর	এবং	হবে।
,,	২৩	জনসাথারণের	জনসাধারণের	
৭৭	৮	মথাক্রমে	যথাক্রমে	
৭৮	২২	পৃষ্ঠার	পৃষ্ঠায়	
৮০	২৬	দস্তবেজ	দস্তাবেজ	
৮১	২৬	কায়স্থদেব	কায়স্থদের	
৮২	১৯	প্রয়াশ	প্রয়াস	

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা নং	লাইন সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	মন্তব্য
৮২	২৬	সন্ত্রী	মন্ত্রী	
৮৩	১৯	কায	কার্য	
,,	২১	লেজুড	লেজুড়	
৮৪	২১	গাঁদা	গাদা	
৮৫	২৩	সশস্র	সশস্ত্র	
৮৯	১	এবং	এসব	
,,	১০	পুনঃরুদ্ধার	পুনরুদ্ধার	
৯১	১৫	এক	এই	
৯৩	২৩	পরিরালিত	পরিচালিত	
৯৪	২৪	সর্বচ্চো	সর্বোচ্চ	
,,	২৫	মহাম্রনেরাই	মহাজনেরাই	
৯৫	১০	ভূম্পত্তির	ভূসম্পত্তির	
৯৬	৭	ম্যাকালে	ম্যাকলে	
,,	১২	India	Indian	
,,	২১	সরাকরী	সরকারী	
৯৭	৫	ক্রয়ার	করার	
৯৯	২১	মন্ত	মস্ত	
,,	২৬	দিতে	দিত	
১০২	২১	ক্ষত্রে	ক্ষেত্রে	
১০৫	,,	তাঁব	তাঁর	
১০৭	১	কিম্বেনদের	কিম্বেন দেব	
১০৮	১	মানেরাহ	-মানেরাই	
,,	২০	পৌঁছ	পৌঁছে	
১০৯	৯	এ	এবং	
,,	১০	নিহন	নিহত	

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা নং	লাইন সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	মন্তব্য
১০৯	১৪	অভিযোগোদায়	অভিযোগ ও দায়	
,,	২৭	হায়ছিলেন	হয়েছিলেন	
১১১	১	সম্বদ্ধনা	সম্বর্দ্ধনা	
১১৪	১৬	প্রতিষ্টিত	প্রতিষ্ঠিত	
,,	২১	বরদ	করদ	
১১৬	১৮	শ্রীহাট্টে	শ্রীহট্টে	
,,	১৯	বাইঙ্কে	বাইও	
১১৯	২১	অসযোগ	অসহযোগ	
,,	২৫	১২৯২১	১৯২১	
১২০	১০	হজার	হাজার	
,,	১২	গভর্ণরমেন্টের	গভর্ণমেন্টের	
১২০	১৩	(১৮৫৭)	১৮৫৭	
১২৩	২০	অথ্যাৎ	অর্থাৎ	
১২৫	৪	পূর্যক	পূর্বক	
,,	১৬	মূখাবেলোকন	মূখাবলোকন	
১২৮	৩	সম্পদকের	সম্পাদকের	
১২৯	২৩	পা	পত্র	
১৩১	৪	পরীক্ষায়	পরীক্ষা	
,,	৫	ইন্ডিয়া	ইন্ডিয়ান	
,,	১২	প্যাটিয়টে	প্যাট্রিয়টে	
১৩২	৪	অবমানার	অবমাননার	
,,	৭	একজন সমাবেশে	এক জনসমাবেশে	
,,	১৮	ম্যাগিষ্ট্রেট	ম্যাজিষ্ট্রেট	
১৩৪	৩	Safty	Safety	
,,	৪	পদী	গদী	

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা নং	লাইন সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	মন্তব্য
১৩৬	পাদটিকা (১ম লাইন)	Dainel Exfremists	Daniel Extremists	
১৪১	৩	অফাজাল	আফজাল	
,,	২৬	সিংসাত্মক	হিংসাত্মক	
১৪২	২৬	বিস্নবকে	বিপ্লবকে	
১৪৩	৪	ধর্মাভাব	ধর্মভাব	
,,	১২	উত্থানের	উত্থানের	
১৪৪,	২	সদবঘাটে	সদরঘাটে	
,,	১২	স্ত্রী নলিনী কিসোর	শ্রী-নলিনী কিশোর	
,,	২২	পূর্ণজাগরণ	পুনর্জাগরণ	
,,	২৩	হয়	→	বাদ দিতে হবে
,,	২৭	লউ	লর্ড	
১৪৬	১০	পন্ডিদের	পন্ডিতদের	
১৪৬	১৪	(০০০)	(১৩৮)	
,,	১৫	মুসলমারা	মুসলমানরা	
১৪৬	২৭	সংগঠত	সংগঠিত	
১৪৭	৮	মুসলমানদের	মুসলমানদের	
১৫০	৬	এ্যাংনো	এ্যাংলো	
,,	১৪	মোহোত্রা	মেহোত্রা	
১৫৪	৯	নির্দশ	নির্দেশ	
,,	১৩	সৌম্য	শৌর্য	
১৫৬	৭	পুব	পূর্ব	
১৫৭	৩	তোমরা	তোমরা	
১৬০	৯	হত	হতে	
১৬১	৮	বর্জ, ম্যানল্টোরের	বর্জন, ম্যানচেস্টারের	

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা নং	লাইন সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	মন্তব্য
১৬১	১১	ফলে ম্যানচেষ্টারের	ম্যানচেষ্টারের	'ফলে' বাদ দিতে হবে
,,	১৬	রাজনৈতিক	রাজনীতি	
,,	১৯	নেতায়	নেতারা	
,,	২২	কার্যকারী	কার্যকরী	
১৬২	২	—	করেন	'রচনা' শব্দের পর যোগ হবে
১৬৫	২	অস্ত্রাপ্রাচারের	অস্ত্রাপাচারের	
,,	৮	আদায়ে	আদায়ের	
,,	২০	বণ	বর্ণ	
,,	২৫	—	যে	'উল্লেখ্য' শব্দের পর যোগ হবে
১৬৬	১২	তুরঙ্কের	তুরস্কের	
১৬৮	৩	অধিবেশনে	অধিবেশন	
১৬৮	১০	এ		'কংগ্রেস' শব্দেরপর 'এ' বাদ দিতে হবে।
,,	১২	সখ্যানুপাতে	সংখ্যানুপাতে	
,,	১৪	লঘিষ্ট	লঘিষ্ঠ	
,,	২৪	ফাটন	ফাট্টল	
১৬৯	পাদটিকা (১ম লাইন)	ডালিয়েল	ডানিয়েল	
১৭০	১৩	কর্মমূচী	কর্মসূচী	
১৭১	১১	বংগে রক্রিত	রংগে রঞ্জিত	
,,	১৩	সংকিত	শংকিত	
,,	২৫	পর্যায়ে	পর্যায়	
১৭৩	১৩	স্লেচ্চশূন্য	স্লেচ্ছশূন্য	

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা নং	লাইন সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	মন্তব্য
১৭৩	১৬	আশিবাদ	আশির্বাদ	
,,	২২	ঘনিণ্ট	ঘনিষ্ঠ	
১৭৪	২১	সরস্বতী	স্বরস্বতী	
,,	২৪	যুদ্ধাংদেহী	যুদ্ধংদেহী	
১৭৫	১৫	প্রতুত্তরে	প্রত্যুত্তরে	
,,	৯৯	সাম্প্র	সাপ্র	
১৭৬	পাদটিকা	Desting	Destiny	
১৭৭	,, (২য়'লাইন)	—	and	the Muslims এর আগে যোগ হবে
১৮০	১৫	অচ্ছুৎনেতা	অচ্ছুৎ নেতা	
,,	১৯	মাইনররটি	মাইনরিটি	
,,	পাদটিকা	India,Congres	Indian, Congress	
১৮১	১৫	—	আইন	'প্রণীত' শব্দের আগে যোগ হবে
১৮২	১১	লক্ষৌতে	লক্ষ্ণৌতে	
১৮৩	১৪	অস্তিত	অস্তিত্ব	
,,	পাদটিকা (১ম লাইন)	Pakistau, farmative	Pakistan Formative	
১৮৫	১৯	নম্পত্তি	সম্পত্তি	
১৮৭	২৬	কারণ	কারণে	
১৯০	১	ঐকোর	ঐক্যের	
১৯১	১০	হস্তে	হচ্ছে	
১৯৩	২১	Soverign	Sovereign	

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা নং	লাইন সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	মন্তব্য
১৯৩	পাদটিকা	Betitho, Jennah	Bolitho, Jinnah	
১৯৪	১৭	রাষ্টদ্বয়	রাষ্ট্রদ্বয়	
১৯৬	১০	মনোভাগাপন্ন	মনোভাবাপন্ন	
,,	১৯	কোন দলে	কোন্দলে	
,,	১৩	ময়	হয়	
,,	পাদটিকা	Pakistan	Pakistan	
১৯৭	,,	Pakistau	Pakistan	
—		Belitho	Bolitho	
১৯৮	১৩	ব্রহ্মা	ব্রহ্ম	
,,	পাদটিকা	Betitho, Jenneh	Bolitho, Jinnah	
২০১	,,	Foudation	Foundation	
২০২	২৭	ব্যহত	ব্যাহত	
২০৩	পাদটিকা (১ম লাইন)	Britich	British	
২০৪	১০	পাস	পায়	
,,	১৫	পররাষ্ট	পররাষ্ট্র	
২০৫	২৪	এবং	—	২য় 'এবং' শব্দটি বাদ দিতে হবে
২০৭	১	সিডনার্দ	লিউনার্দ	
,,	৫	সম্পকে	সম্পর্কে	
২০৮	১২	নিদেশের	নির্দেশের	
,,	১৪	নেহের	নেহেরু	
,,	২৬	বিরুদ্ধ	বিরুদ্ধে	

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা নং	লাইন সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	মন্তব্য
২০৯	২১	—	সিদ্ধান্ত	'সরকারের' শব্দটির পর যোগ করতে হবে।
২১০	৪	ক্রুদ্ধস্বরে	ক্রুদ্ধস্বরে	
,,	১৩	কংগ্রসী	কংগ্রেসী	
,,	১৮	সৃষ্টি	সৃষ্টির	
,,	২০	ব্যাপারে	ব্যাপারে	
২১১	১০	আপনারের	আপনাদের	
২১৩	১১	লক্ষণীয়	লক্ষ্যণীয়	
২১৪	২	১৯৪৮	১৯৪৭	
,,	১০	ঘটয়ে	ঘটিয়ে	
,,	১৭	বৃটিশ রাজগ্রন্থে	বৃটিশরাজ'গ্রন্থে	
,,	পাদটিকা	—	(২০৪)—ঐ—	১ম লাইনের নিচে যোগ করতে হবে
২১৫	১৬	ভাইসরেয়ের	ভাইসরয়ের	
,,	১৯	বিকল্প	বিকল্প	
,,	২৮	বর্গ	বংগ	
২১৭	১৪	পরিষ্ঠ	গরিষ্ঠ	
২১৮	২৪	জিলা	জেলা	
,,	২৭	তিনটি	দুটি	
২২২	১১	বিচেবনা	বিবেচনা	
২২৪	৭	মারাত্তক	মারাত্মক	
,,	৮	মোহাম্মদ	মুহাম্মাদ	
,,	২৩	করেছেস	করেছেন	

www.pathagar.com